সূচীপত্র

প্রাতঃস্মরণীয়া

দেবী ভবানীর

পুণ্যচরিত্র চিত্রিত করিতে করিতে

যাঁহাকে অনেক সময় আমার মনে পড়িয়াছে ;

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"

এই মহামন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে

যাঁহার মধুরস্মৃতি আমার হৃদয় আলোকিত করিয়াছে ;

নব্যবঙ্গের সেই আশা ও আলোক,

আদর্শ-চরিত্র,

আমার সোদরোপম সুহৃদ্,

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,

এম্. এ., বি. এল্, মহোদয়কে,

এই ভবানী-চরিত,

ভক্তি ও ভালবাসার সহিত

অর্পণ করিলাম।

ভূমিকা।

বহু আয়াসে, অনেক দিনের পরিশ্রমে, রাণী ভবানীর পুণ্যচরিত্র চিত্রিত করিলাম। ভক্তি-মার্গাবলম্বী শাক্ত ও বৈষ্ণবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, পৌরাণিক আদর্শে, এ গ্রন্থ বিরচিত। লেখক সেকাল-ঘেঁসা একজন হিন্দু; সুতরাং সকল স্থলে এ-কালোপযোগী রুচি ও মতের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া, আপন সরল বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা-অনুসারে, একটু অভিনব পন্থায়, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দুকুললক্ষ্মীকে দর্শন ও অঙ্কন করিয়াছে। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া, যদি বঙ্গের একটি পরিবার—অন্ততঃ একজন গৃহলক্ষ্মীও ভবানীর মত হইতে পারেন, তাহা হইলে লেখকের জন্ম সফল হইবে। ইহার অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা লেখকের আর নাই।

রাণী ভবানীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় যে কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তক, ইংরেজী ও বাঙ্গালায় সঙ্কলিত ও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। সন তারিখ খুঁটীনাটী ছাড়িয়া দিয়াও, অনেক আসল ঘটনাতেই, ইতিহাস-লেখকগণের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ। আমি পারতপক্ষে, সে বিরোধের মধ্যে

বড় একটা যাই নাই। কাব্যের যাহা মুখ্য লক্ষ্য,—চিত্রের উৎকর্ষ সাধন,—আমি মূল ভবানী-চরিত্রে, সেই মহান্ আদর্শের অবতারণা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এ চেষ্টা যদি কোন অংশেও সার্থক হইয়া থাকে, তবে আর ঐ ঐতিহাসিক মত-বিরোধে, কিছু যাইবে-আসিবে না। কারণ আমার "বঙ্গের শেষবীর", "মন্ত্রের সাধন", অথবা "জ্যোতির্ম্ময়ী"র ন্যায়, এ গ্রন্থ আমি ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের ছাচে ঢালি নাই,—মূল অদৃষ্ট ও দৈবের প্রভাব দেখিতে দেখিতে, মুগ্ধ অন্তরে, মানবজীবনের দুই একটি মহারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। সুতরাং এই "রাণী ভবানী" যে হিসাবে দার্শনিক কাব্য বা ধর্ম্মমূলক উপন্যাস, সে হিসাবে প্রত্যক্ষ ঘটনামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে।

সকল কথাই সংক্ষেপে বলিলাম। এখন কৃপা করিয়া, একটু শ্রদ্ধাবুদ্ধি সহকারে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বাধিত হইব। যাঁহার সে প্রবৃত্তি হইবে না, তাঁহার এ গ্রন্থপাঠে কোন ফল নাই।—তিনি যেন এ গ্রন্থ পাঠ না করেন,—লেখকের এই অনুরোধ।

সেবক

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

প্রথম খণ্ড।

বালিকা—গৌরী।

রাণী ভবানী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভ শারদীয় উৎসব। সমগ্র বঙ্গ হাস্যময়। বঙ্গবাসী আনন্দে আত্মহারা। দেশ জুড়িয়া আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত। আনন্দ-গীতিতে দিক্-সমূহ মুখরিত।

এমনি আনন্দ-বাসরে, উত্তরবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে, আজ আনন্দের সহস্রধারা প্রবাহিত হইতেছে। সে প্রবাহে পল্লীবাসীগণ হাবুডুবু খাইতেছে। আনন্দময়ী প্রতিমার সম্মুখে, সহস্র সহস্র লোক, আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এইভাবে মহাসপ্তমীর মহা উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সমাধা

হইয়া গিয়াছে; আজ মহা অষ্টমী;—বড় পুণ্যময় মাহেন্দ্র-ক্ষণ। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, পরম পুণ্যময় মুহূর্ত্তে, ভাগ্যবান্ গৃহস্বামীর একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুতা, অপূর্ব্ব রাজশ্রী-চিহ্নিতা, পরম লাবণ্যবতী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল।

একে মহাষ্টমী, তায় বৃহস্পতিবার; হিন্দুর পক্ষে আজ বড় শুভদিন। সেই শুভদিনে, মহামঙ্গলময় মুহূর্ত্তে, যে ভাগ্যবানের এই কন্যারত্ন ভূমিষ্ট হইল,—তিনি একজন পরম ভাগবত হিন্দু ভূম্যধিকারী। তাঁহার নাম,—আত্মা-রাম চৌধুরী। তিনি একজন বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। আধুনিক রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি।

সেই ছাতিন গ্রামে, মুসলমান রাজত্বের শেষ-দশায়, যে প্রাতঃস্মরণীয়া, পুণ্যবতী, লোক-পালয়িত্রী রমণী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র-কাহিনী আলোচনা করিয়া, আজ আমরা ধন্য হইব।

মহাষ্টমীর পুণ্যময় মুহূর্ত্তে,—সেই শুভ বৃহস্পতিবারে, আনন্দবাসরে, ভাগ্যবান্ গৃহস্বামীর লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে,—এই শুভসংবাদ অল্পক্ষণ মধ্যে, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। বাড়ীতে মহা সমারোহে মায়ের মহাপূজা,—লোকে লোকারণ্য;—তাহার উপর এই শুভসংবাদ পাইয়া, দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ স্বতন্ত্র পথ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সেকালের ধনাঢ্য

হিন্দুগৃহস্থের বাড়ীর পূজা ; লোক-সমাগম ত আছেই ;—তদুপরি সেই প্রবীণ গৃহস্বামীর এইমাত্র প্রথমা কন্যা ;—মহাষ্টমীজাত, সুলক্ষণাক্রান্ত, পরম রূপবতী কন্যা ;—গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক দল, দলে দলে আসিতে লাগিল। উৎসবের হাটে, আর এক অভিনব উৎসবের জমাট বাঁধিয়া গেল।

নবপ্রসূতা কন্যাকে যে দেখিল, সেই শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল।—"আহা, কি রূপ! কি লক্ষণ! রূপে সূতিকা-গৃহ যেন আলোকিত হইয়াছে!" সকলের মুখেই এই কথা। আর এক দল বলিল,—"না হইবে কেন? আজ একে লক্ষ্মীবার, তায় মায়ের মহাষ্টমী পূজা ; এমন মণি-কাঞ্চন-যোগ কি, হয় বলিলেই হয়?" কেহ বলিল, "আহা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" কেহ বলিল, "যেন ভগবতী!" কেহ বলিল, "যেন মা-অন্নপূর্ণা!"—এইরূপ যাহার মনে যে ভাবের উদয় হইতে লাগিল, সে, সেই ভাবেই সেই সদ্যো-প্রসূতা কন্যার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। গৃহস্বামীর একজন নিকট-সম্পর্কীয়া প্রাচীনা কহিলেন,—"আহা, মা-গৌরী যেন গিরিরাজের ঘর হইতে পথ ভুলিয়া বউ-এর কোলে এসেছে!"

শিশু স্বাভাবিকই সুন্দর। স্থলবিশেষে সৌন্দর্য্যের আধিক্য করিয়া, লোকে শিশুকে, দেব-দেবীর রূপের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। পরন্তু এ ক্ষেত্রে সে তুলনা সার্থক হইয়াছে। আত্মারাম-দুহিতার,—এই নবপ্রসূতা কন্যার

মুখমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব করুণামিশ্রিত স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ নিহিত রহিয়াছে যে, তাহা দেখিলে সেই ত্রিলোক-জননী, সৃষ্টিরক্ষাকারিণী, সেই করুণাময়ী অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি মনে পড়ে। তাই, যে দেখিতেছে, সেই-ই প্রাণ খুলিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে শিশুর কল্যাণকামনা করিতেছে।

সহানুভূতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। করুণার কাঙাল মানুষ, করুণা দেখিলেই, সহজে আর্দ্র হয়। করুণার সহিত মাধুরীর চির-মিশ্রণ। মধুরতা জগৎকে বশ করে। তাই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, মাধুর্য্য-রসের প্রাধান্য দেন। আত্মারাম-দুহিতা—এই সদ্যোজাতা কন্যার মুখে, সেই করুণামিশ্রিত মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। ইহাকে স্বর্গীয় আভা বল, আর মহামায়ার মুখচ্ছবি বল,—এমনি কিছু একটা তাহাতে মিশ্রিত ছিল।

তারপর বার ক্ষণ, তিথি লগ্ন, নক্ষত্র কাল,—হিন্দুর জ্যোতিষ অনুসারে কন্যার জন্মকাল যতদূর শুভ হইতে হয়, হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ হিসাবে, লোকে যাহা দেখিল, তাহা চরম শুভ বলিয়াই বুঝিল। এইরূপ নানাকারণে, সেই কন্যারত্ন দর্শনে, সকলে মুগ্ধ হইল। আত্মারামকে দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

গৃহস্বামী আত্মারাম, দুর্গোৎসব উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করেন; কন্যার শুভ জন্ম-উপলক্ষেও বহু অর্থ ব্যয় করিলেন। সমাগত আহূত আহূত ন সহস্র সহস্র লোক, তাঁহার দানে

ও সমাদরে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। দেশ-দেশান্তর-আগত কাঙ্গালী-ভিখারী-দল, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুপেয় ও সুস্বাদু পানাহারে,—তদুপরি এক একখানি নববস্ত্র ও এক এক রজত-মুদ্রা লাভে, দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা আনন্দ-বিভোর প্রাণে হরিধ্বনি করিতে করিতে, মহামায়ার নামের সহিত কন্যার নাম লইতে লইতে, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আত্মারামের অন্তর আনন্দ-রসে আপ্লুত; কিন্তু বাহিরে তাহার বিশেষ বিকাশ নাই;—ধীর স্থির গম্ভীর এবং প্রশান্তভাবে তিনি সকলকে আদর-অভ্যর্থনা করিতেছেন।

সম্মুখে আনন্দময়ী প্রতিমা; আত্মারাম মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, কন্যাদর্শন করিতে, অন্তঃপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, যেন জন্ম-জন্ম চির-পরিচিত, চির-বাঞ্ছিত একটি আরাধ্যা দেবী-মূর্ত্তি,—তাঁহার শিশু কন্যারূপে, সেই সূতিকা-গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে! তাঁহার মনে হইল, বর্ষে বর্ষে, যে আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে, সমগ্র বঙ্গ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সেই করুণাময়ী লোক-পালয়িত্রী মূর্ত্তির সহিত, বুঝি এ মুখের কিছু সাদৃশ্য আছে!

দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের জন্য, আত্মারামের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—অতীতের অনেক স্মৃতি মনে জাগিল,—তাঁহার চোখে জল আসিল।—জল আসিল? হাঁ, জল আসিল। কেন আসিল, তাহা তিনিই জানেন।

আত্মারাম অনিমেষ নয়নে শিশুকে দেখিলেন। উহারই মধ্যে, একবার সকলের অলক্ষ্যে, চক্ষু মুদিত করিয়া, মনের মধ্যে যেন কি একটু দেখিয়া লইলেন। ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সহিত তাঁহার অপাঙ্গে ক্ষুদ্র এক ফোঁটা জল ঝরিল।—"তারা" "তারা" বলিতে বলিতে, ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে, সুকৌশলে, তিনি সেই জলটুকু মুছিয়া ফেলিলেন,—কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

সর্ব্বসুলক্ষণা, অপূর্ব্ব রূপশ্রীসম্পন্না, গৌরীরূপা আত্মজার প্রথম দর্শনে, আত্মারামের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল পড়িল কেন? মূর্ত্তিমতী মহামায়ার মুখ-জ্যোতিঃ, অথবা সেই ত্রিনয়নার করুণাদ্যুতি, কি সত্য সত্যই তিনি নবদুহিতার মুখকমলে নিরীক্ষণ করিলেন? দুয়ের সাদৃশ্য কি এক হইল? তাই কি সকলের অলক্ষ্যে, তাঁহার এই এক বিন্দু আনন্দাশ্রু পতিত হইল? অথবা, হায়! আর কোন্ অজ্ঞেয় কারণে তাঁহার চোখ দিয়া এই এক ফোঁটা জল পড়িল, তাহা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় এই কন্যার রূপ-শ্রী বাড়িতে লাগিল। হিন্দুর শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে, সূতিকাগারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। কন্যার ভূমিষ্ঠকাল হইতে গৃহস্বামীর সুখৈশ্বর্য্যের আর সীমা রহিল না। কোথা হইতে কি ভাবে যে, তাঁহার বিষয়-বিভব এবং জমীদারীর আয় বাড়িতে লাগিল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সকলই যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে, সাক্ষাৎ কমলার কৃপাদৃষ্টিফলে হইতে লাগিল,—সকলেই এইরূপ বুঝিল। সকলে কন্যার জননীকে 'রত্নগর্ভা' নামে অভিহিত করিল। এই ভাগ্যবতী জননীর নাম,—জয়-দুর্গা। জয়দুর্গা রূপে গুণে পতিগৃহ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আত্মারাম একজন নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু। সুতরাং হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রে, তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। তিনি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক কন্যার জন্মকাল,—তিথি বার, লগ্ন কাল, নক্ষত্র ক্ষণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মায়ের মহাপূজার মহাষ্টমী তিথি,—মহাশুভজনক হইলেও, জ্যোতিষের কড়াক্রান্তি হিসাবে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর গণনায়, কোথায় কোন্ গ্রহ কি ভাবে বিরাজ করিতেছিল এবং তাহার ভাবী ফল কি, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য, তিনি কন্যার এক খানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিলেন। কন্যা যতই সুলক্ষণাক্রান্ত অথবা 'পয়মন্ত' হউক,—তথাপি ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্ট-সূত্র আর একজনের সহিত গ্রথিত হইবে; আর একজনের জীবনের সুখদুঃখ, সম্পদ বিপদ, শুভ-অশুভের সহিত তাহার জীবন-বৃন্তের অস্তিত্ব নির্ভর করিবে; —ইহা তিনি বুঝিতেন। অপিচ, কন্যার জন্মকাল সর্ব্বপ্রকার শুভযোগ-সম্পন্ন হইলেও, তাঁহার মনরূপী নারায়ণ প্রখর অন্তর্দৃষ্টিবলে, সূচনাতেই যেন কি-একটু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কালে এই কন্যা রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষা যশস্বিনী হইতে পারিলেও,—ভাগ্যবতী হইতে পারিবে না।—স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়, সেই দুই মহাবস্তু হইতে সে বঞ্চিত হইবে।

মনের ধারণা বা সংস্কার, পরীক্ষা করিবার জন্য, আত্মারাম একজন শাস্ত্র-বিশারদ প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে আনয়ন করিলেন। সেই পণ্ডিত দ্বারা কন্যার একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইলেন। কোষ্ঠীর ফলাফল আদ্যোপান্ত গণনা করিয়া, জ্যোতিষী কিছু বিষণ্ণ হইলেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও, সেই একই ফল দাঁড়াইল। তিনি বুঝিলেন, বিধি-লিপি অন্যথা করিবার হাত,—মানুষের নাই।

তথাপি, তখনও তিনি কন্যার পিতাকে সে কথা বলিলেন না। ভাবিলেন,—"যখন সম্মুখে উপস্থিত আছি, তখন এই কন্যাকে একবার চাক্ষুস দেখিব। এমন অপূর্ব্ব রাশিচক্র আমি কখন দেখি নাই; এমন অলৌকিক গ্রহ-সম্মিলনও আমি কখন গণনা করি নাই। দৈবের বিশেষ কৃপা ভিন্ন, পিতামাতার জন্মার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতী ব্যতীত, এমন সন্তান লাভ হয় না। সকলই অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি।—কিন্তু হায়! এদিকেও যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রকাশ করিতেও বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়!—এমন সৌভাগ্যবতী কন্যারও এমন দুর্ভাগ্য! ধন্বন্তরীর পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ডে, কে রে এমন এক বিন্দু তীব্র হলাহল মিশ্রিত করিয়া রাখিল!—অহো ভাগ্য!"

জ্যোতিষী, মনের ভাব মনে রাখিয়া, আত্মারামকে কহিলেন, "মহাশয়, আপনার এ লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যাকে

একবার দেখিতে পাই ? আমি একবার সেই মহালক্ষ্মীকে চক্ষে দেখিয়া, আমার জ্যোতিষ-গণনা সার্থক করি।”

আত্মারাম, কন্যাকে অন্তঃপুর হইতে আনাইলেন। এক পরিচারিকা, সেই সোনার গৌরীকে ক্রোড়ে লইয়া আসিল। সেই শিশু দেবীমূর্ত্তি দর্শনে, ভাগ্য-গণনাকারী সেই ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে আশ্চর্য্যভাবে আত্মারামকে কহিলেন, “মহাত্মন! আপনি সামান্য নন,—আপনার এই শিশু-কন্যাও সামান্যা নন। এরূপ অপূর্ব্ব রূপশ্রী-মিশ্রিত শুভলক্ষণ, আমি জীবনে দেখি নাই। এমন অদ্ভুত কোষ্ঠীও আমি কখনও প্রস্তুত করি নাই। যেন সাক্ষাৎ মহামায়া, গৌরীরূপে আপনার গৃহে বিরাজিতা।—দেখি মা, তোমার হাত খানি ?”

দাসী, কন্যাকে জ্যোতিষীর সম্মুখে আনিল। জ্যোতিষী সেই ক্ষুদ্র কনক কর-পদ্মের রেখাগুলি দেখিলেন। আবার নূতন করিয়া অঙ্ক কষিলেন; কষিয়া পূর্ব্ব-গণনার সহিত মিলাইলেন। আবার দেখিলেন, আবার মিলাইলেন।—একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ছল-ছল চক্ষে কন্যার মুখের দিকে একবার চাহিলেন।—দাসীকে কহিলেন, “যাও, মাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও।”

ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্তকাল বিমর্ষভাবে থাকিয়া, জন্মপত্রিকার বাকী এক ঘর পূরণ করিয়া, কালি-কলম দূরে রাখিলেন।

পুনরায় একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, কোষ্ঠী খানি তুলটের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

আত্মারাম, জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইয়াও, আপন মন দিয়া, কন্যার ভাবী অদৃষ্ট-ফল কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছেন;—এক্ষণে জ্যোতিষীর মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বুঝি তাহা ঠিক মিলিয়া গেল। মনে মনে তিনি একটু হাসিলেন। বিধাতার অব্যর্থ বিধান দেখিয়া হাসিলেন। প্রকাশ্যে জ্যোতিষীকে কহিলেন,—"কি দেখিলেন, ঠাকুর?"

জ্যোতিষী।—যাহা দেখিলাম, এমনটি আর কখন দেখি নাই!

আত্মারাম।—যাহা দেখেন নাই, তাহা দেখিতে পাইয়াই কি এরূপ বিস্ময়-ভাব প্রকাশ করিতেছেন? কিন্তু ইহার ফল ত ভাল-মন্দ দুই-ই হইতে পারে?

জ্যোতিষী।—তাহা পারে। কিন্তু প্রকৃত ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি আমাদের কৈ?

আত্মারাম।—লৌকিক হিসাবে যাহা ভাল ও মন্দ, আমি তাহাই জানিতে চাই।

জ্যোতিষী।—আপনার এই কন্যা অশেষ ভাগ্যবতী। কালে লোকসমাজে ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া, পুণ্যশ্লোকস্বরূপা অভিহিত হইবেন। ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেশবিদেশে

প্রচারিত হইবে। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে, মহামাতৃভাবে ইনি লোকের হৃদয়োপরি আসন লইবেন।—আর কি শুনিতে চান? যাহা বলিলাম, ইহার এক বর্ণও অন্যথা হইবার নয়।

আত্মারাম মনে মনে বলিলেন,—"তাহা জানি। মার আমার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলে ও করুণাপূর্ণ নয়ন পল্লবে, সে মহামাতৃভাব, উজ্জ্বলরূপেই অঙ্কিত আছে। সে কথা জানিবার জন্য জন্মপত্রিকার প্রয়োজন হয় নাই।"

আত্মারামকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, জ্যোতিষী পুনরায় বলিলেন,—"মহাশয়, আমি গণনা করিয়া আরও যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা শুনুন। আপনার কন্যার জন্মস্থানে—সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল "রাজযোগ" আছে। কেন না ইহাঁর জন্মস্থানে বুধ তুঙ্গী হইয়া বিলগ্ন গত হইয়াছেন; এবং ইহাঁর আয় স্থানে বৃহস্পতি, ধনে শুক্র, দশমে চন্দ্র আছেন। * আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি,—কালে এই কন্যা নিশ্চয়ই রাজকুললক্ষ্মী—রাজেন্দ্রাণী হইবেন। বিশেষ এই কন্যার ধর্ম্মভাব আরও উচ্চ, আরও মহৎ; সর্ব্বজীবে ইহাঁর দয়া থাকিবে।—করুণায় ও মমতায় ইনি জগৎ-

---

* "যস্যা বুধ তুঙ্গগতো বিলগ্নে লাভস্থলে দেবপুরোহিতশ্চ ধনেস্থি শুক্রো দশমে শশাঙ্কঃ সা সার্ব্বভৌমস্য বধূর্ভবিত্রী।"

সংসার কিনিয়া লইবেন।—লক্ষ লক্ষ লোক ইহাঁকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিতে পূজা করিবে।"

আত্মারাম একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—

"লৌকিক হিসাবে, ইহা সৌভাগ্যের চরম সোপান, সন্দেহ নাই।—কিন্তু ঠাকুর, দুর্ভাগ্যের দিকে, ইহার বিপরীত কোন ফল দেখিলেন?—আপনি সঙ্কুচিত হইবেন না;—যাহা বিধি-লিপি, তাহা প্রকাশ করুন।"

জ্যোতিষী।—ইহার পর যাহা দেখিয়াছি, তাহা আর আপনার শুনিয়া কাজ নাই;—তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না।

জ্যোতিষীর স্বর আর্দ্র,—চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

আত্মারাম মুখ উন্নত করিয়া, বক্ষঃ একটু দৃঢ় ও স্ফাত করিয়া, রুদ্ধশ্বাসে, গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "বলিতে পারিবেন না,—কেন ঠাকুর?—বলুন। যত কঠোর অমঙ্গল কাহিনী হয়, আপনি বলুন। বিধি-লিপি,—মানুষের ত কোন হাত নাই,—আপনি বলুন।"

গদ-গদ স্বরে জ্যোতিষী বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করিবেন,—আমি তাহা বলিতে পারিব না। তরুণ অরুণ-রাগ-রঞ্জিত মায়ের গৌরীমূর্ত্তি,—কোন্ মূর্খ ধূসর ধূমাবতী মূর্ত্তিতে দেখিতে চায়? সাধ করিয়া, কে দুর্ম্মুখ নাম লইতে অভিলাষী হয়?"

এবার আত্মারাম জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, অর্দ্ধ-স্ফুটস্বরে কহিলেন, "এঁ্যা! তবে আমি যা ভাবিয়াছি, গণনারও তাই মিলিয়া গেল?—মন, সত্যই তুমি নারায়ণ!"

জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ, মস্তক অবনত করিয়া, অকারণে সম্মুখস্থ পুঁথির পাতা উল্টাইতেছেন,—আত্মারাম গম্ভীর-ভাবে কন্যার জন্মপত্রিকা খানি দেখিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ কম্পিত-হস্তে পত্রিকাখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। আত্মা-রামের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।—সেই মহাষ্টমী, সেই মায়ের মহা-পূজা, সেই বাড়ীতে সহস্র সহস্র লোক-সমাগম, সেই মহা আনন্দ-বাসর,—সেই সর্ব্বসুলক্ষণযুতা গৌরীরূপা কন্যার জন্মগ্রহণ,—সেই উৎসবের হাটে অভিনব উৎসবের সমা-বেশ,——ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে আত্মারাম, সম্মুখেই যেন মহামায়ার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু হায়! সেই ছবির সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাতে দেখিলেন——

কি দেখিলেন? পিতার প্রাণ, কন্যার সে বিষাদ-মলিন-মূর্ত্তি দেখিতে পারিল না;—সর্ব্বশরীর মথিত করিয়া, তাঁহার সেই বিশাল বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া, এক ফোঁটা গরম জল, জন্মপত্রিকার উপর পড়িল। যে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি লক্ষ্য করিবার জন্য, তাঁহার মনশ্চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠিতে-

ছিল,—তপ্ত অশ্রুবিন্দু, যেন ঠিক সেই স্থান লক্ষ্য করিয়াই নিপতিত হইল!

এতক্ষণে যেন অন্তর্জগৎ-নিমগ্ন আত্মারামের চমক ভাঙ্গিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া "তারা" "তারা" বলিতে বলিতে, তিনি চক্ষু মুছিলেন। চক্ষু মুছিয়া পত্রিকাপানে চাহিয়া দেখিলেন,—কন্যার "রাজযোগের" পার্শ্বেই যেন উজ্জ্বল বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—"বৈধব্য-যোগ।"

কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, সে স্থানের লেখা কিছু অস্পষ্ট ছিল। যাহা ছিল, তাহাও আবার সদ্যোনিঃসৃত তপ্ত অশ্রুবিন্দুতে একটু মুছিয়াও গিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও, আত্মারাম যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, উজ্জ্বল বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"বৈধব্য-যোগ"। তখন সেই জন্মপত্রিকা খানির চারিপার্শ্বেই যেন তিনি ঐ প্রাণঘাতিনী বাণীর প্রতিলিপি দেখিতে পাইলেন।—সর্ব্বত্রই যেন অবান্তর পাঁচ-কথার সহিত উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—"বৈধব্য-যোগ"।

আত্মারাম আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই, —অথচ ধীরভাবে—সেই পত্রিকাখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। অদূরে ভৃত্য চকমকি ঠুকিয়া তামাকুর বন্দোবস্ত করিতেছিল;—ইঙ্গিতে গম্ভীরভাবে তাহাকে চকমকিটি নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। পরে

স্বহস্তে সেই চক্‌মকি জ্বালিয়া, তাহাতে কন্যার সেই সদ্য-প্রস্তুত জন্মপত্রিকাখানি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিলেন।

জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া আত্মারামকে দেখিতেছিলেন;—মুখে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কোষ্ঠীটি নষ্ট হইল দেখিয়া, এবার মনে মনে বলিলেন,—"নষ্ট কোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার করিবার সৌভাগ্য আমার আছে। আমি ভাবী রাজরাজেশ্বরীর জন্মকালাদি সমস্তই ছকে আঁকিয়া লইয়াছি;—যখনই ইচ্ছা, কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারিব। কিন্তু পরমজ্ঞানী আত্মারাম চৌধুরী,—এ করিলেন কি?—কোষ্ঠীর লেখা আগুনে পোড়াইয়া ছাই করিলেন বটে; কিন্তু কপালের লিখন হায়! কোন্ আগুনে তিনি পোড়াইবেন?"

আত্মারাম ভাবিলেন,—"দূর হোক্। যাহা হইবার, তাহা ত হইবেই,—তবে কেন পূর্ব্ব হইতে মন খারাপ করি? বিশেষ অশুভ বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখার ফল এই,—প্রতিক্ষণ সেই অশুভ ঘটনায় আপনাকে ডুবিয়া থাকিতে হয়।—বাড়ার ভাগে, শুভসংবাদের যেটুকু নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ, তাহাও সেই অশুভ-দুশ্চিন্তায় ডুবিয়া যায়। তবে সাধ করিয়া কন্যার নামাঙ্কিত এই অশুভ ছবি,—গৃহে রাখিয়া ফল কি? আর কন্যার জন্মকালীন

শুভফল?—তাহাত আমি মায়ের মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি? সেজন্য আর জ্যোতির্ব্বিদের এ গণনার কি আবশ্যক ছিল?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিশু-কন্যার ভূমিষ্টের সঙ্গে সঙ্গেই, আত্মারামের পরিবারস্থ সকলেই, শিশুর ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখিল। নাম গুলি অবশ্য, সমস্তই পৌরাণিক। অতঃপর যথাকালে, মহা সমারোহে, কন্যার অন্নপ্রাশন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। অন্নপ্রাশনে রাশিচক্র অনুসারে, কুল-পুরোহিত কন্যার নামকরণ করিলেন,—"গৌরী"। গৌরী-নাম সকলেরই মনে ধরিল। কাঁচা সোনার সে তরল চল্‌চলে রং, সে সোহাগ-সংমিশ্রিতা, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুতা, অপূর্ব্ব রূপ-শ্রী,—সর্ব্বোপরি কমলার কৃপাদৃষ্টির সহিত লোকের ঐকান্তিক আদর ও স্নেহমিশ্রিত এই নাম,—সকলেই ভাল বাসিল। ভালবাসার সহিত, পরিপূর্ণ সোহাগে, সকলে এই নামে কন্যাকে ডাকিল, আদর করিল,

প্রাণের আশীর্ব্বাদের সহিত স্নেহাশ্রুপূর্ণ চক্ষে, পিতা-মাতার সমক্ষে কন্যার ভাবী উচ্চ ভাগ্যফল আলোচনা করিতে লাগিল।—কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি আত্মারাম ইহাতে স্পৃষ্ট বা পুলকিত না হইয়া, মনে কি ভাবিয়া, কন্যার নাম রাখিলেন,--"ভবানী।"

'ভবানী'—এই ধ্বনিই স্বাভাবিক কিছু গম্ভীর। ইহার উচ্চারণেও গাম্ভীর্য্য, ইহার সম্বোধনেও গাম্ভীর্য্য। পরন্তু ইহাতে পবিত্রতা ও পৌরাণিকতা,—পূর্ণরূপে বিদ্যমান্। অপিচ, 'গৌরী' নামে বা উক্ত সম্বোধনে,—যে সরসতা, যে মধুরতা, যে কবিতা এবং গাথা কর্ণমূলে ধ্বনিত হয়, 'ভবানী' নামে যেন তাহা নাই—ইহা যেন স্বভাবতই কিছু শ্রুতিগম্ভীর। পরন্তু এ দুই-ই মহামহিমা-ব্যঞ্জক; দুই-ই সেই জগন্মাতা জগদম্বার দুইটি পৌরাণিক নাম। নামের উচ্চারণে বা সম্বোধনে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, এবং তাহা গিয়া কর্ণমূলে ও তথা হইতে হৃদয়-তলে গিয়া যে ভাবে বাজে,—সেই বাদ্যের সামঞ্জস্যের সহিত আত্মারামের প্রাণের যে, কি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা তিনিই জানিতেন। তাই তিনি সকলের ঐ সোহাগ-আদর-স্নেহ সংবলিত, গীতি-ঝঙ্কার-মুখরিত, সরসমধুর কবিত্বপূর্ণ নামের পরিবর্ত্তে, কন্যাকে অপেক্ষাকৃত ধীর-গম্ভীর-ভক্তিপূর্ণ প্রবীণ নামে অভিহিত করিলেন। বুঝি সেই নামের সঙ্গে সঙ্গে,

প্রফুল্ল উষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিত দিব্যবালিকামূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, সুকুমারী কন্যাকে তিনি অন্তরের অন্তরে বর্ষীয়সী প্রৌঢ়ার বেশেই দেখিতে লাগিলেন। এবং তাহার সহিত একটু অস্পষ্ট কষ্ট, একটু ব্যথা, একটু কাতরতা, একুটু যাতনা-জড়িত দয়া মিশ্রিত হইয়া, স্বাভাবিক সরস বাৎসল্য-স্নেহ হইতে, শিশুকে কিছু দূরে রাখিয়া দিল।—এ সকলেরই মূল,—সেই জ্যোতির্ব্বিদের গণনা,—অথবা আত্মারামের হৃদয়ের বদ্ধমূল সংস্কার। সত্যই আত্মারাম, কন্যার ভাবী ভাগ্য-ফল পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিয়া, বহু পূর্ব্ব হইতে অস্বথী। কোষ্ঠী ছিঁড়িয়া [illegible], কোষ্ঠীর ফলাফল
[illegible] শিশু-কন্যার [illegible]
ভুলিয়া যাইতে তিনি সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু সেই চেষ্টাটিই তাঁহার স্মৃতিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া রাখিল। তাই তিনি পরিবারস্থ সকলের স্নেহ-সম্বোধন-সোহাগে যেন একটু বঞ্চিত করিয়া, পরিণাম অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, কন্যার নাম রাখিলেন,—'ভবানী।' কেন যে তিনি এরূপ জিদ্ দেখাইয়া, স্নেহ-পুত্তলি শিশুকন্যার এ নাম পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহা তিনি কাহাকেও বলিলেন না। এরূপ স্থলে মনের ভাব প্রকাশ করিবার লোকও তিনি নন।

তা আত্মারাম ত, কন্যাকে 'ভবানী' নামে অভিহিত করুন, আর কালে সেই নামেই সেই কন্যা প্রখ্যাতনামা

হউন,—কিন্তু উপস্থিত আমরা,—এই তপ্তকাঞ্চনপ্রভা স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী গৌরী-প্রতিমাকে, তাহার মাতা ও অন্যান্য পরিজনের সহিত 'গৌরী' নামেই অভিহিত করিব। অভিহিত করিব, শুধু নামের গৌরবে নহে,—ঘটনার পারম্পর্য্য এবং এই অদৃষ্ট-বালিকার বাল্য-জীবনও সেই সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

গৌরীকে সোহাগভরে সকলেই কোলে লয়; কোলে লইয়া তাপিত বক্ষঃ শীতল করে;—গৌরীও সকলের কোলে উঠিয়া, উচ্চ মধুর হাসির লহরী তুলিয়া, চক্ষে স্বাভাবিক স্নেহার্দ্র করুণা-জ্যোতিঃ খেলাইয়া, ভুবন আলোকিত করে। সে স্নিগ্ধ-মধুর আলোকে, যে কোলে লয়, সেও কৃতার্থ হয়; আর যে একটু আপনা ভুলিয়া শিশুকে নিরীক্ষণ করে, সেও যেন ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যায়। সেই স্নিগ্ধ নবনীত দেহ, সেই সাক্ষাৎ সরলতা ও পবিত্রতার আধার স্বচ্ছ হৃদয়, সেই স্বর্গীয় আভাবিশিষ্ট মুখ-কমল, সেই সৌন্দর্য্যের সারভূত অনির্ব্বচনীয় কোমল-করুণ দৃষ্টি,—সত্যই সকলকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। এই আকৃষ্টতার ফলে, স্ত্রী পুরুষ সকলেই,—গৌরীকে ভাব-চক্ষে,—যেন সেই জগদারাধ্যা, জগন্মাতা-জ্ঞানে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এমনই স্নেহ-সমাদরে এবং উচ্চ সম্মান-ভক্তি ও অনুরাগ-ভালবাসার ক্রোড়ে,

পরম পুণ্যের সংসারে, শিশু গৌরী পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

প্রাতঃকালীন আরণ্য পক্ষীর মধুর কণ্ঠস্বরের ন্যায় যখন গৌরীর সুধাকণ্ঠে অস্ফুট স্বর-সঙ্গীত ঝঙ্কারিত হইল, তখন পিতা মাতা ও পোষ্য-পরিজনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কণ্ঠে অস্ফুট মধুর ভাষ ও চক্ষে অতীতের স্মৃতি বা স্মৃতি-বিজড়িত সোনার স্বপ্ন,—শিশুর এ নৈসর্গিক শোভা, যে উপভোগ করিতে না জানিয়াছে, তাহার মনুষ্য-জন্মই বৃথা। স্মিতবদনী সোনার গৌরী আধভাষে কথা কহিতে শিখিল, আর তাহার সেই তপ্তকাঞ্চননিভ সুকো-মল মুখপদ্মে অজস্র চুম্বন-বৃষ্টি হইতে লাগিল। বিধাতার বিধানে সুস্নিগ্ধ পানীয় গঙ্গাজলের যেমন কেহ মালিক নাই—অথবা থাকিয়াও নাই, অমৃতাধার শিশু-মুখে চুম্বন করিতেও তেমনি কোন নিষেধ-বিধি নাই। শিশুকে দেখিয়া স্নেহার্দ্র হৃদয়ে শিশুর মুখচুম্বন করিতে, শিশুর পিতামাতা, বা অন্য অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক হয় না। অবস্থার হীনতায় বা অন্য কোন কারণে যে, আন্ত-রিক ইচ্ছাসত্ত্বেও শিশুর মুখচুম্বনে বঞ্চিত হয়, সে প্রকৃতই বড় অভাগ্য। আর যে প্রস্তর-কঠিন-হৃদয় নরপিশাচ, মোহে বা দম্ভে অথবা এমনি কোন একটা কারণে, তাহার আপনার বা আপনসম্পর্কীয় কিংবা তাহার ক্ষমতাধীন-

কোন শিশুকে,—অন্যের আকাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক নিঃস্বার্থ আদর ও অনাবিল স্নেহ-চুম্বন হইতে বঞ্চিত রাখে এবং তৎসঙ্গে সেই আদরাকাঙ্ক্ষীর মনে, কোনও প্রকারে এতটুকুও ক্লেশ বা ব্যথা দেয়, তার বাড়া মহাপাপী, বুঝি এ সংসারে আর নাই।

গৌরী আধভাষে কথা কহিতে শিখিল, আর তাহার মুখ-কমলে অজস্র চুম্বন-বৃষ্টি হইতে লাগিল। আবার কখন কখন, কাহাকে কাহাকে, সে চুম্বনের প্রতিচুম্বন দিয়া, উচ্চ হাসির লহরী তুলিয়া, বালিকা পিতার পুণ্যের সংসার সজীব করিয়া রাখিল। সে দৃশ্য দেখিয়া পরমজ্ঞানী আত্মারামও, এক একবার আত্মবিস্মৃত হইতেন,—বিধাতার বিধান ভুলিয়া যাইতেন,—কন্যার ভাবী অশুভ ভাগ্যফলও মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেন। ভাবিতেন,—"না, না, এ রত্ন বৃথায় হইবে না। কিন্তু হায় রে! এ অমূল্য নিধিও পরের হইবে? আমার এ নির্ম্মল ছবি, আর একজনের সুখদুঃখময় অদৃষ্ট-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে? ইহার এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকুও স্বাধীনতা থাকিবে না? বিধাতা, তোমার বিধান তুমিই ভাল বুঝ! ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমরা,—তোমার লীলা, কি বুঝিব লীলাময়!"

আত্মারাম-পত্নী জয়দুর্গা ভাবিতেন,—"মা আমার! বড় সাধে তোমার 'গৌরী' নাম রেখেছি। অষ্টমবর্ষেই

তোমার বিবাহ দিব। দিয়া, আমরা গৌরীদানের ফল পাব। হে মা বিশ্বরূপিণী গৌরী! যেন আমার গৌরীর যোগ্য শিব-জামাতা পাই!—মা যেন আমার, রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে শোভা পায়।"

সূচনাতেই জনক-জননীর এইরূপ আশা ও প্রার্থনা!—এইরূপ আত্মনিমগন ও দৈবে নির্ভর!—এমন সন্তানও অকৃতজ্ঞ হয়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌরী কথা কহিতে শিখিল, ত তাহার কথা আর ফুরায় না। এক কথা, শত রকমে, শতবার সে কহিতে থাকে। শ্রোতা ও বক্তা, দুইজনেই যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তবে এ ক্লান্তি বড় আরামের, বড় সুখের। শিশুকে যে, কথা শিখায় এবং শিশুর কথা যে শুনে, তাহাকেও তৎসময় শিশু হইতে হয়। নচেৎ শিশুর মাধুর্য্য, তাহার কথার তাৎপর্য্য, সে উপলব্ধি করিতে পারে না। গৌরী আধস্বরে, সুধাবচনে কহিল,—"ঠাকুল"; শ্রোতা উত্তর দিল,—"ঠাকুল কৈ?" গৌরী পুনশ্চ বলিল, "ঠাকুল"; উত্তর—"ঠাকুল কৈ?" এইরূপ পুনঃ পুনঃ একই কথা, একই উত্তর।—বেজার হইলে চলিবে না; কিংবা "ঠাকুলের" 'ল' উঠাইয়া, শুদ্ধ করিয়া

'র' বসাইয়া, 'ঠাকুর' উচ্চারণ করিলে, শিশুর প্রকৃতি বুঝা যাইবে না। এইরূপ গৌরী রাঙাকে বলে—'আঙা'; 'ঘর'কে বলে 'ঘল'; 'গরু'কে বলে 'গ-উ'। বাটীর কেহ যদি কাহাকে ডাকিল,—'ও ভাই, এসো না'; সুধামুখী গৌরী সুধাস্বরে অমনি তাহার অনুকরণ করিল,—'ও বাই, এচ না।' যদি কেহ বলিল,—"ও কেষ্ট, ভাত খাবি আয়;" —গৌরীর কাণ অমনি সেই দিকে গেল,—আধভাষে বলিল, "ও কেত্তো, ভাত আয়।"—সবটা আর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল না;—"খাবি" কথাটা এককালে লোপ পাইল। এইরূপ কেহ হয়ত কাহাকে স্নান করিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—"নেয়ো না, অসুখ করিবে"; সোনামুখী গৌরী অমনি তাহাকে সাবধান করিল,—"না, অসুল বেব।" —"অসুখের" 'খ' স্থানে 'ল', "করিবে" স্থানে শুধু 'বেব'; আর "নেয়ো" কথাটা এক-দমে ছাড়্!—এত শব্দহীন, ছন্দঃহীন, যতিঃহীন অস্পষ্ট ভাষা,—তবুও তাহা কত মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী;—কত কবিত্বপূর্ণ ও ভাবময়!—বঙ্গভাষার আধুনিক বৈয়াকরণ ও ভাষা-সমালোচকগণ যদি দিন কত বৃথা 'শাদার পিঠে কালি' দেওয়া বন্ধ রাখিয়া, একটু মুরুব্বিয়ানা কমাইয়া, বিনামূল্যে উপদেশদানের ব্যবস্থাটা উঠাইয়া দিয়া—এইরূপ শিশু-প্রকৃতি লাভ করেন,—শিশুর মত সরল পবিত্র ও দ্বেষ-হিংসা বর্জ্জিত হন, তবে

তাঁহার ভাষা, শিশুর মত অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাঁহাকে পূজা করিতেও প্রস্তুত আছি। দেখ, শিশুর ভাষার ব্যাকরণ নাই, বিভক্তি নাই, বিশেষ্য-বিশেষণ লিঙ্গ-সমাজের দ্বন্দ্ব নাই,—কোনরূপ ঝগড়া কচ্‌কচি কিংবা 'জুজুর ভয়' দেখানো নাই,—তথাপি তাহা কত সরল, কত সুন্দর, কত পরিষ্কার।*

তা এইরূপ ব্যাকরণ-ব্যাখ্যা অথবা ভাষা-সমালোচনা যাঁর কাজ, তিনিই করিতে থাকুন,—আমরা গৌরীর কথা বলিতেছিলাম, গৌরীর কথাই বলি।

একে খাইতে আহ্বান করা হইতেছে, ওকে হয়ত 'অসুখ করিবে' বলিয়া ভয়-দেখানো হইতেছে, কিন্তু সেই সময় যদি কেউ গৌরীকে দুধ খাইতে ডাকে, বা দুধের সরঞ্জমাদি লইয়া বসে,—তবে গৌরী যেন আর সে অঞ্চলেও নাই।—কচি-পায়ে তুড়্ তুড়্ দৌড়িয়া, মুখখানা ভার-ভার পরে ঈষৎ কাঁদ-কাঁদ করিয়া, খুব বিরক্তি দেখাইয়া, এক একবার পশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে বলে,— "না, দুধ না।" আবার যদি কেউ সেই সময় দুধ-খাবার কথা

* ঐ গো! শিশুর কথায় লেখকের নিজের ভাষাই ব্যাকরণ-দোষ দুষ্ট হইতেছে! বিশেষণ "পরিষ্কৃতের" 'ষ্কৃত' উঠাইয়া, লেখক ঐস্থানে স্পষ্টরূপে বিশেষ্য "পরিষ্কার" শব্দ লিখিয়া বসিলেন!—ইতি ছাপাখানার ভূত।

ভুলাইয়া, গৌরীকে কোলে লইয়া, আদর করিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইতে খাইতে বলে,—"বলো দেখি, আমি কে?"—গৌরী অমনি সেই দুধ-খাওয়া-রূপ জুজুর ভয় ভুলিয়া গিয়া, স্নেহভাবে উত্তর দেয়,—"আমি।" প্রশ্নকারী—"আমি কে?" উত্তর—"আমি"।—"কে"—এ কথার উত্তর আর মিলিতেছে না। তার পর প্রশ্নকারী যদি বলে—"আমি পিশেমশাই।" উত্তর—"পিচে নানা।" প্রশ্নকারী (হাসিয়া) "বল দেখি—চণ্ডীমণ্ডপ?" উত্তর—'চণ্ডী মা।'—অমনি বুঝি মাকে মনে পড়ে—উদ্দেশে বলে,—"মা, আমি চন্দী যাব।"———"মা",-নাম কাহাকেও শিখাইতে হয় না।—শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝি তাহা শিখে, এবং হাসি বা কান্নার প্রথম উচ্ছ্বাসেই শিশু-কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়—"মা"!——এই অমৃতময়ী বাণীই বোধ হয় জীব-জগতের আদি এবং শেষ।

বালিকা যেন 'কয়া' পাখী।—কল্ কল্ বকিতেছে, খল্ খল্ হাসিতেছে, আপন মনে খেলিতেছে। শিশুর কলকণ্ঠ, সমধুর হাস্য এবং আপন মনে খেলা, যে সংসারে নাই, সে সংসারে সব থাকিয়াও যেন কিছু নাই—সে সংসার যেন মৃত।

এইরূপ গৌরী যা শুনে, তাই বলে।—এক কথা শতবার আবৃত্তি করিতে থাকে।

এ দৃশ্যে, পিতামাতার আর আনন্দের সীমা থাকে না। আত্মারাম অতি ধীমান্ হইলেও, স্বাভাবিক বাৎসল্য-স্নেহ অথবা মোহের অধীন।—কতকটা সাধ করিয়াই তিনি এ মোহে জড়িত। মোহ বা মায়া, সাংসারিক জীবের পক্ষে অপরিহার্য্য। অল্পই হউক আর অধিকই হউক,—কেহ এককালে ইহার হাত এড়াইতে পারে না। পান-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে, ইহা জীব-হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া যায়। তাই, আত্মারাম অন্তর্দৃষ্টিবলে সকলই দেখিয়া এবং কন্যার জন্মকোষ্ঠীর ফল সমস্ত জানিতে পারিয়াও, বিশ্ব-বিজয়িনী মায়ার অব্যর্থ আকর্ষণবলে,—মমতার মধুর কল্প-নায়,—আশার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, কন্যার ভাবী বৈধব্য-যোগের কথা এক একবার ভুলিয়া যাইতেন এবং তাহার স্থানে, অতি উজ্জ্বলরূপে কন্যার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, মনপ্রাণ সুশীতল করিতেন। তখন আর কন্যাকে গম্ভীর 'ভবানী' নামে সম্বোধন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না;—পরিবারস্থ সকলের সহিত তখন তিনিও মনে মনে কন্যাকে 'গৌরী' নামেই অভিহিত করিতেন।——কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—'সকলেই মরিতেছে,—মরণ অবশ্যম্ভাবী,—অতএব আমাকেও এক-দিন মরিতে হইবে,'—ইহা জানিয়াও যখন আমরা জীবনের অধিকাংশ কাল আপনাদিগকে 'অজর' ও 'অমর'

স্থির করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকি, তখন প্রাণাধিকা তনয়ার ভাবী বৈধব্য-চিন্তাও যে, আত্মারাম মোহবশে এক একবার বিস্মৃত হইবেন, ইহা আর অধিক কথা কি? ফলে, বালিকা গৌরী যখন আপন তপ্তকাঞ্চনপ্রভা বিস্তার করিয়া, স্নেহময়ী জননীর স্নিগ্ধকোল আলোকিত করিত এবং তৎসঙ্গে স্বভাবসুন্দর মধুর হাসির লহরী তুলিয়া ক্ষণকালের জন্য ধরায় অমরার সৃষ্টি করিতে থাকিত,—তারপর সেই হাস্যযুক্ত মুখ যখন জননীর মুখে সম্মিলিত হইত,—স্মিতবদনী মাতা ও কন্যায় যখন চুম্বনের বিনিময় চলিত,—তখন, সেই মহামুহূর্ত্তে, স্বর্গের সেই মোহন দৃশ্য দেখিয়া, আত্মারামের চক্ষু আনন্দাশ্রুপূর্ণ ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত;—হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে, আত্মবিস্মৃতভাবে, অনিমেষ নয়নে, তখন তিনি ইহা দেখিতে থাকিতেন। সে সময় তাঁহার মনে হইত, স্বপ্ন ও সত্য এবং নিদ্রা ও জাগরণ,—ভিন্ন বস্তু নহে। মনে হইত,—"মনুষ্য-জীবন এত সুন্দর!—কে বলে, সংসার দুঃখময়?"——অদূরে জনককে দেখিয়া, বালিকা গৌরী আর একবার উচ্চ হাসির লহরী তুলিয়া, সোনার কচি হাত দু'খানি উত্তোলিত করিয়া, মধুমাখা আধস্বরে—"ঐ বাবা, আমি যাবো"—বলিয়া, পিতার ক্রোড়ে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত। আত্মারামের তখন চক্ষে জল ও

অধরে ঈষৎ হাস্যের আবির্ভাব হইত।—অমনি তিনি প্রগাঢ় বাৎসল্য-স্নেহে অভিভূত হইয়া সস্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিতেন,—কন্যাও সুস্মিতবদনে পিতাকে প্রতি-চুম্বন দিত;—তার পর মায়ের কোল ছাড়িয়া পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। এইবার তিনজনের মধ্যে চুম্বন-বৃষ্টি হইতে থাকিত। সেই চুম্বনবৃষ্টির সহিত পিতা-মাতার ধীর-স্থির-নির্ব্বাক্ হাস্য; কিন্তু গৌরীর হাস্য লহরে লহরে উঠিয়া, পঞ্চমে—সপ্তমে চড়িতে থাকিত। তাহাতে অপত্যপ্রাণ জনক-জননীর প্রাণে যে কি সুখ, তাহা তাঁহারাই বুঝিতেন।

এমনই অবস্থায় আত্মারাম, গৌরীর মুখচুম্বন করিয়া, গৌরীকে সহধর্ম্মিণীর ক্রোড়ে দিতেন। বলিতেন,—"মাকে তুমিই কোলে লও। তোমার ঐ লাবণ্যময় কোলে, তোমার আর-আধখানি মূর্ত্তি, আমি দেখিতে বড় ভালবাসি। সংসারের অনেক সৌন্দর্য্য—অনেক পবিত্রতা জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি; কিন্তু তোমার কোলে, তোমার এই সজীব ছায়ামূর্ত্তি,—এই জীবনসর্ব্বস্ব মায়ার পুত্তলি, বুঝি অতুলনীয়। এই নৈসর্গিক শোভা, প্রাণ ভরিয়া দেখিতে সাধ যায়। গৌরী—ভবানীকে তুমিই কোলে লও,—আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাদের দুইজনকে দেখি!"

প্রেমিকপ্রবর! তাহাই দেখ! এই স্বর্গীয় শোভা দেখিবার জন্য, সমগ্র সংসার লালায়িত। এ স্থানে আর বর্ণভেদ; সমাজভেদ ও ধর্ম্মভেদ থাকে না। এ শোভা দেখিলে কবির কবিত্ব, দার্শনিকের দর্শন, ভগবদ্ভক্তের ভক্তি,—স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হয়। তাই না হিন্দুর পুরাণকার— জগন্মাতা জগদম্বার ক্রোড়ে এই ভাবে হেরম্বকে রাখিয়া, ত্রিভুবনের শোভা একত্র করিয়াছিলেন ?

এই অবস্থায় আত্মারাম-পত্নী—সাধ্বী জয়দুর্গা, স্বামীর পদরেণু মাথায় লইয়া, ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে কহিতেন,—"প্রভু, আমি এমনি ভাগ্যবতী!—তোমার কৃপায় আমি সাক্ষাৎ গৌরীকে গর্ভে ধারণ করিতে পারিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করিও নাথ, গৌরী যেন আমার চিরায়ুষ্মতী হয়।"

এই ভাবেই ধর্ম্মপ্রাণ প্রৌঢ়-দম্পতী, সন্তানকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই, পুণ্যময় প্রেম-ধর্ম্মের কক্ষ-পুটে বালিকা গৌরী পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহার ফল যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপই হইবে।

ক্রমে গৌরী আরও একটু বড় হইল;—পাঁচে পা দিল। বালিকার স্বাভাবিক রূপরাশি, ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশসঞ্জাত ক্ষুদ্র অলকা-গুচ্ছ,—সুন্দর শ্বেত মুখপদ্মে শোভা পাইতেছে। মুক্তা-পাঁতির ন্যায় ক্ষুদ্র দন্তশ্রেণী,—ঈষদ্ হাস্যময় লাল টুক্‌টুকে

পাত্‌লা ঠোঁট দু'খানি ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র মুখবিবরে দেখা দিতেছে। সদ্যোপ্রস্ফুটিত গোলাপতুল্য কোমল গণ্ডস্থল,—পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষের স্নেহ-চুম্বনে সদাই আমোদিত ও সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে। আত্মার সাক্ষীস্বরূপ অমল প্রকৃতি-দর্পণে,—সেই ঈষৎ-সজল নয়ন-কোণে, স্নিগ্ধ-পবিত্র-কোমল কটাক্ষ ও করুণা-জ্যোতি,—অতি অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তার করিতেছে। তিলফুলের ন্যায় সুন্দর নাসা,—কম্বুকণ্ঠ,—হস্তপদগ্রীবা প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর ও সুলক্ষণাক্রান্ত। বুঝি অন্তর্প্রকৃতি এতদপেক্ষাও সুন্দর বলিয়া, বালিকার বাহ্যপ্রকৃতিও এত সুন্দর পরিলক্ষিত হইতেছে। কেন না, অন্তর্প্রকৃতির আংশিক ছাপ্, বাহ্যপ্রকৃতিতেও পড়িয়া থাকে। সুতরাং গৌরীর ভিতর-বাহির সুন্দর,—ভিতর-বাহির পবিত্রতার আধার।

পাঁচে পা দিয়াই, বালিকা যেন জীবের সহিত জগতের এবং জগতের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ, কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল যেন,—"জীবে দয়া, স্বার্থ-ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—ইহাই মানবের সারধর্ম্ম,—এবং এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই—মানব-জন্ম। বালিকা যেন জাতিস্মরার ন্যায়, আপন পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তসহ, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি বলে, অতি অল্পেই বুঝিয়া লইল,—জগতের সর্ব্বত্রই ব্যথা,—সর্ব্বত্রই হাহাকার,—সর্ব্বত্রই পরপীড়ন।—অতএব

পরোপকার রূপ মহান্ ধর্ম্ম দ্বারাই,—এই ব্যথা, এই হাহা-কার, এই পরপীড়ন রোধ করিতে হইবে।—পঞ্চম বর্ষেই দুঃখের শিশু বালিকার প্রাণে করুণার ছবি অঙ্কিত হইল। সেই করুণা হইতেই,—ধীরে, অতি ধীরে, অজ্ঞাতসারে ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইবে। এবং কালে সেই করুণা ও ভগবদ্ভক্তি—দু'য়ে মিলিয়া সংসার নন্দন-কানন করিয়া ফেলিবে।

হায়, স্বর্গভ্রষ্ট শিশু! চিরদিন তুমি শিশুই থাকো;—তোমায় আর সংসারে মিশিয়া কাজ নাই! এই বিপ্লব-বিবর্ত্তনময় জীবনের বিনিময়ে,—হে শৈশব! তোমায় কি আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

করুণা যার প্রাণে আসিল, সে-ই জগৎ জয় করিল। করুণায় যেমন আপনাকে কোমল করা যায়, অপরকেও তদ্রূপ কোমল করা যাইতে পারে। তবে ইহা সাধনা-সাপেক্ষ,—একদিনের কাজ নয়। অনেক সংযম, অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক আত্মত্যাগ, অনেক অহমিকা-বর্জ্জন অভ্যাস করিতে করিতে, এ অমূল্যনিধি আয়ত্ত হয়। করুণা আয়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মনে এক অতি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। সে ভাবটি,—মাধুর্য্যরসের আস্বাদন। এ আস্বাদনে, জগৎ আপনার বোধ হয়। তখন আর শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিত, উত্তম অধম,—এসব বড় একটা জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান থাকিলেও, তাহার ক্রিয়াশক্তিতে, অভিমানের দাবানল জ্বলিতে থাকে

না। ক্রমেই তাহা সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া যায়।

এই অপার্থিব করুণা,—ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের একটি সহজ উপায়। করুণার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মন কাদার মত কোমল হয় এবং সেই কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে মনে ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। সেই অঙ্কুর,—ক্রমেই পল্লবিত, মুকুলিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া ধরিত্রীর প্রাণ শীতল করে। তখন প্রাণ প্রেমে পুলকিত হয়,—সকলকে আত্মবৎ দেখিতে ও সকলকে ভালবাসিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়,—মনে হয়, যে যথায় পাপী তাপী, দীন দুঃখী, অনাথ আতুর আছে,—সে সকলই আমি। এ প্রগাঢ় সহানুভূতি,—এ গভীর আমিত্ব-বোধ,—সাধারণতঃ দুঃখদৈন্যের মধ্যেই সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেননা, দীনতার সহিত করুণার মাখা-মাখিটা কিছু অধিক।—তখন শুধু মানব-মানবীর মধ্যেই এ প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না,—বিধি-সৃষ্ট সর্ব্বভূতে—পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গেও সেই প্রেম পরিপ্লু হইয়া যায়;—মনে হয়, এ সকলই সেই চিদ্‌ঘন সচ্চিদা-নন্দের পূর্ণবিকাশ। সেই সচ্চিদানন্দ যেমন আমাতে আছেন, তেমনি অন্যেতেও আছেন;—সুতরাং কাহাকেও ত আত্মপর ভাবিলে চলিবে না? সবটা জড়াইয়া তিনি—

সুতরাং সর্ব্বত্রই আনন্দ, সর্ব্বত্রই মাধুর্য্য,—সর্ব্বত্রই মঙ্গলময় ভাব,—সর্ব্বত্রই আমি।—এই মহাজ্ঞানই পরমপ্রেমিকের লক্ষণ। এই পরম প্রেমিকই, ধরার ভার লাঘব করিতে পারেন। সম্বল,—তাঁহার এই অপরাজিতা করুণা,—এবং এই করুণা-সমুদ্ভূত ভগবৎ-প্রেম।—তাই বলিয়াছি, করুণা যার প্রাণে আসিল, সে-ই জগৎ জয় করিল!

পাঁচ বৎসরের দুগ্ধের শিশু গৌরীর প্রাণে করুণার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। সে করুণা কেমন, এখন সেই কথাই বলিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আত্মারাম চৌধুরী একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ও পরম ভগবদ্ভক্ত। ভক্ত হিন্দুর গৃহে, সর্ব্ব-কার্য্যের মধ্যেই ভগবদ্ভক্তির বিমল ছবি পরিলক্ষিত হয়। নিত্য ক্রিয়ায় ও নৈমিত্তিক কার্য্যে, পর্ব্বে ও পৌরাণিক উৎসবে,—দেবপূজায় ও অতিথি-সেবায়, অন্নদানে ও পর-দুঃখ মোচনে,—এমন কি, বিলাসে ও ব্যসনে,—সর্ব্বকার্য্যেই একটু-না-একটু ভক্তির ভাব জড়িত থাকে। জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে, সেই ভাব, যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে-ই ধন্য হয়। শিশু গৌরীর স্বভাবসুন্দর স্বচ্ছ হৃদয়ে, পুণ্যময় পিতৃগৃহের এই ভক্তির ভাব,—অতি সহজেই বিজড়িত হইতে লাগিল। যেখানে পিতামাতা দু'য়েই পুণ্যপ্রাণ,—যে গৃহে পুণ্য-কথা প্রতিনিয়তই পরিকীর্ত্তিত,—যে সংসারে

পুণ্যের আদর্শ পোষ্য-পরিজনের মধ্যেও অল্পাধিক পরিলক্ষিত, সেখানে স্বভাবসরল শিশুর প্রাণে পুণ্যের মঙ্গল-আরতি উদ্ভব না হইবে কেন? যখন শঙ্খ-ঘণ্টা-দামমার গভীর রোলে দেবতার আরতি হয়; যখন ধূপে দীপে ফুলে—চারিদিক্ আলোকিত ও সুরভিত হয়; যখন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ-নিঃসৃত বিশুদ্ধ বৈদিক-মন্ত্র গম্ভীর রবে ধ্বনিত হয়;—তখন, সেই পুণ্যময় মুহূর্ত্তে, বালিকা গৌরী চিত্রার্পিত স্থিরনেত্রে, নিশ্চল প্রতিমার ন্যায়, দেবতার পানে চাহিয়া থাকে। বহুক্ষণ ধরিয়া এই পূজার্চ্চনা চলিতে থাকে; সেই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরী স্থিরভাবে বসিয়া একদৃষ্টে তাহা দেখিতে থাকে—সে বহুক্ষণের মধ্যে সে চোখের পলক বুঝি একবার পড়ে না।

আবার সে দেখিবার ভঙ্গিই বা কেমন? পরিচারিকা বালিকাকে কোল হইতে নামাইয়া, সুশীতল শ্বেত-প্রস্তর হর্ম্ম্যতলে বসাইয়া দেয়, দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকে,—বালিকা স্বভাবসুন্দর করুণাপূর্ণ চক্ষে, ঈষৎ সজলনয়নে, অনিমেষে দেবতাপানে চাহিয়া থাকে। কচি-মুখে সেই করুণা-জ্যোতিঃ, আর চোখে এই সজল করুণা-দ্যুতি,—দুই করুণা তখন এক হইয়া দেবতার প্রতিই ন্যস্ত হয়।

আর সেই দেবতাই বা কে?—ত্রিলোকপালিনী—সৃষ্টি-রক্ষাকারিণী—জননী অন্নপূর্ণা। তিনি কেমন?—শান্ত,

শীতলা, প্রসন্নবদনা, ত্রিনয়নী—তিনটি চক্ষেই যেন তিনটি স্নিগ্ধ করুণা-জ্যোতি উদ্ভাসিত। যেন মূর্ত্তিমতী করুণা, জননীরূপে, অভুক্ত সন্তানকে স্বহস্তে অন্নদান করিতেছেন। মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার,—ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতেই তিনি অবতীর্ণা। স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর সদাশিবও প্রীতি-প্রসন্নবদনে, অঞ্জলি পূরিয়া, সে অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। মায়ের বাম হস্তে স্বর্ণ-থাল, দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বী;—অকাতরে অক্লিষ্ট মনে—সর্ব্বজীবে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্যই তাঁহার মর্ত্ত্যে আগমন। মা আমার লক্ষ্মীস্বরূপিণী,—তাই কমলাসনা। জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন,—"যে যতটুকু পার,—অভুক্তকে অন্ন দাও,—জীবে দয়া কর,—জননীর হৃদয় লইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন কর;—তবেই তোমার মানবজন্ম সার্থক হইবে,—তবেই তুমি আমার কাছে আসিবে।" — এ হেন দেবতার দর্শনে বালিকা অনিমেষ-নয়না,—বুঝি একরূপ বাহ্যজ্ঞান-শূন্যা!—কে বলিবে, পাঁচ বৎসরের শিশুর প্রাণে এই মহামাতৃরূপিণী অন্নপূর্ণামূর্ত্তি দর্শনে, কি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে? তবে সমাগত দর্শকবৃন্দ এক একদিন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিত, মায়ের স্নিগ্ধ করুণদৃষ্টি,—আত্মারাম-দুহিতার সেই স্থির-নিশ্চল-অনিমেষ দৃষ্টির সহিত, ঠিক যেন এক হইয়া গিয়াছে;—সেই দুই মুখের স্বর্গীয় লাবণ্যমিশ্রিত করুণাও

যেন মিলিয়া-মিশিয়া সমতুল্য হইয়াছে ;—কোন্‌টি প্রতিমা, কোন্‌টি গৌরী,—সহসা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আরতিশেষে, পরিচারিকাও এক একদিন, প্রতিমাকে প্রণাম করিতে, গিয়া, গৌরীকে প্রণাম করিয়া ফেলিত।

স্বয়ং আত্মারামেরও এক একদিন এমনি ভ্রম হইত। তখন তিনি যুক্তকরে, অশ্রুসিক্ত গদ্গদকণ্ঠে, অন্যের অগোচরে, জননী-অন্নপূর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন,—"মা, আমার মোহ-চক্ষু খুলে দাও,—আমার ভুল ভেঙ্গে দাও,—আমি বুঝিতে পারিতেছি না,—তুমি কে, আর আমার ভবানী কে ?"

এমন পুণ্যের সংসারে, এমন পবিত্রতার আধারে, এবং এমন পারিপার্শ্বিক সংযোগস্থলে, যে পুণ্যপ্রাণ শিশুর—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতী ও উচ্চ সংস্কার লইয়া জন্ম, পরিবর্দ্ধন এবং শিক্ষা ও দীক্ষা,—তাহার মধ্যে যে করুণা ও ভগবৎপ্রেম আসিবে,—পঞ্চমবর্ষেই যে তাহার এরূপ আত্মবোধ ও আত্ম-সংস্কার দীপ্যমান্ হইয়া উঠিবে,—তাহার আর বিচিত্র কি ?

তাই বলিতেছিলাম, গৌরীর করুণাই একদিন জগৎ বশ করিবে,—এবং কালে সেই করুণাই একদিন জগৎকে শিক্ষা দিবে,—"জীবে দয়া, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—ইহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

এখন এই করুণার দুই একটি সজীব ছায়া-চিত্র দেখাইতে পারিলে, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। করুণা-ময়ী জননীই সে আশা পূর্ণ করুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম চৌধুরী—শাক্ত। শক্তি-উপাসনা,—তাঁহার কুল-ধর্ম্ম। কিন্তু তাঁহাতে গোঁড়ামী ছিল না। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার ও প্রশস্ত ছিল। 'যে কালী, সে-ই কৃষ্ণ'—এবং 'সে-ই কৃষ্ণ, সেই কালী'—ইহাই তিনি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেই জন্যই তিনি প্রতি-অমাবস্যা রাত্রিতে কালীপূজা করিতেন; ষোড়শোপচারে মায়ের ভোগ ও বলি দিতেন;—আবার বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর যুগল মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন;—প্রতিদিন যথানিয়মে তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা হইত,—দোলে ও রাসে সমারোহে তাঁহার পর্ব্বাহ সম্পন্ন হইত। আত্মারামের বাড়ীতে, কোন দিন হৃদয়োন্মত্ত-কারী হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইত;—খোল-করতালের গভীর

রোলে দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ হইত;—আবার কোন দিন বা শ্যামা-সঙ্গীতে, সুমধুর চণ্ডীর গানে, সুধামাখা 'মা-মা'-নামে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইত। শাক্ত ও বৈষ্ণব, সমান আদরে, সমান সম্মানে, তাঁহার গৃহে অভ্যর্থিত ও সম্পূজিত হইতেন।

ইহা ব্যতীত আত্মারাম ঐকান্তিক অনুরাগে, প্রচুর অর্থব্যয়ে, বাটীর সন্নিহিত এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, অন্নপূর্ণার এক প্রকাণ্ড বাড়ী ও সুরম্য মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এবং সেই শ্বেত-প্রস্তর সুরম্য মন্দিরে, অষ্টধাতু-নির্ম্মিত মায়ের সুন্দর সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া দিয়া, আপন ধর্ম্ম-পিপাসার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিমার গঠন ও কারুকার্য্য এমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে, তাহা দেখিয়া অতি-বড় পাষণ্ডও ক্ষণকালের জন্য আর্দ্র হইয়া যায়।

এই অন্নপূর্ণার সেবা ও ভোগের আয়োজন বড় পারিপাটী ছিল। দেশের জনপ্রাণী কেহই কোন দিন অভুক্ত না থাকে,—দেশ-দেশান্তর-আগত অতিথি-অভ্যাগত, সাধু-সন্ন্যাসী, কাঙ্গালী-ভিখারী, দীন-দুঃখী-ভিক্ষুক—কেহই না ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জলে বঞ্চিত হয়,—প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই আত্মারাম, স্বর্গীয়া জননীর নামে, জননী-অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং সুপ্রচুর পরিমাণে,

তাহার নিত্য-সেবা ও ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিস্তৃত মন্দির-প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অতিথিশালা, অন্য-প্রান্তে বিদেশী বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দের জন্য টোল বা চতুষ্পাঠী। চতুষ্পাঠীতে চারিজন সংস্কৃত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। ইহা ব্যতীত দেশস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই বৃত্তির কল্যাণে, তাঁহারা সচ্ছলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেশস্থ বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেন।

এইরূপ সদাব্রত,—অন্নদান, বস্ত্রদান, জলদান, ব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তি,—পুষ্করিণী ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা,—লোকের পিতৃ-দায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়ে সাহায্য,—দেব ও গো-ব্রাহ্মণ-সেবা,—প্রভৃতি বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠানে আত্মারাম চৌধুরী দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যময় নামে সকলে জয়-জয়কার করিত এবং দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত।—এ হেন হিন্দু ভূম্যধিকারীর গৃহে, কুল পবিত্র ও গৃহ আলোকিত করিয়া, একমাত্র নয়নানন্দ-রূপিণী স্নেহময়ী গৌরী-প্রতিমার আবির্ভাব হইয়াছে। সে সজীব প্রতিমা,—দিনে দিনে সৌন্দর্য্য, শোভা ও সুষমা ছড়াইয়া,—সদ্‌গুণের সৌরভে সকলকে আমোদিত করিয়া, ধীরে ধীরে লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন।

আত্মারামের বাটীতে পুরাণ-পাঠ ও কথকতা হয়, বালিকা গৌরী একাগ্রমনে তাহা শুনে, শুনিয়া কণ্ঠস্থ করে, কখন বা তাহা সুর করিয়া আবৃত্তিও করিতে থাকে। সেই মধুমাখা কণ্ঠে, মধুময়ী পুরাণকথা ও ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত-গাথা, মধুর হইতে মধুরতর বোধ হয়। পোষ্য-পরিজন বালিকাকে কোলে লইয়া, আদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিতে থাকে,—"ওমা গৌরী, আজ কি গান শিখেছ, আমাদের শোনাও দেখি?"

বালিকা উৎসাহে কোল হইতে নামিয়া, হাসি-হাসি মুখে আধ-আধ ভাবে বলিতে থাকে,—"শুনাইব;—কি দিবে?"

একজন প্রবীণা বলিলেন,—"কি দিব মা, বল?"

হাসিতে মুক্তার মালা ছড়াইয়া গৌরী উত্তর দিল,—"আমি বলিব কেন?—তুমি বল, কি দিবে?"

প্রবীণা।—তোমায় মা কি দিব,—কি দিতে পারি?

গৌরী।—মনে করিলে সব দিতে পার।

প্রবীণা।—সব দিব,—কি মা?

একজন নবীনা বলিলেন,—"পিসীমা আর সব কি দিবেন, বোন্? উনি বিধবা মানুষ;—কোথায় কি পাবেন?"

গৌরী।—বিধবা? বিধবা কাকে বলে দিদি?

দিদী উত্তর দিলেন,—"আগে বড় হও বোন্, তারপর সব বুঝিতে পারিবে।"

গৌরী।—কেন, ছোট ব'লে কি 'বিধবা' বুঝিতে পারিব না?—পিসীমা, তুমি বল, বিধবা কাকে বলে?

পিসি-মা একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। গৌরী তাহা লক্ষ্য করিল। বুঝিল, কথাটা পিসীমার লাগিয়াছে। পিসীমার লাগিয়াছে, সুতরাং তাহারও লাগিল। পরের ব্যথা, সে আপনার করিয়া লইতে জানে বলিয়া, লাগিল। এবার ঈষৎ কাতরভাবে বলিল,—

"পিসীমা, তুমি নিশ্বাস ফেলিলে কেন? ও কথায় কি তোমার কষ্ট হইল?—বিধবা কি তবে কষ্টের কথা?"

পিসীমা অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিলেন। গৌরী তাহা বুঝিল। অন্য কথায় মনও দিল;—কিন্তু 'বিধবা' কথা ভুলিল না। কোনরূপ ব্যথার কথা সে ভুলে না। পরের ব্যথা, সে, আপন ব্যথার ন্যায়, অন্তরের অন্তরে জাগাইয়া রাখিতে জানে।

পিসিমা অন্যকথা পাড়িলেন, বালিকা সে কথার জবাব দিল। পিসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য জবাব দিল। কিন্তু তাহার মনে রহিল,—'বিধবা।'

তারপর পিসীকে বলিল,—"পিসীমা, যে গান শিখেছি, কৈ, তাহা শুনিলে না?"

পিসী।—বলিবে?—বল মা, শুনি।

সেই দিদি বলিল,—"বল ত বোন্ গৌরী, আমি ঐ খাঁচাশুদ্ধ পাখীটা তোমায় দিব।"

গৌরী।—খাঁচা-শুদ্ধ পাখী?—আমি ও পাখী উড়িয়ে দিব।"

দিদী।—কেন, উড়িয়ে দিবে কেন?

গৌরী।—বনের পাখী বনে থাক্,—আকাশের পাখী আকাশে উড়ুক,—ওতেই ওদের সুখ। আর তাতে আমারও সুখ।

আর একজন বলিলেন, "আমি একটি ফুল দিব,—তুমি গাও ত সোনামণি?"

আবার হাসির লহরী ছুটিল। হাসিতে হাসিতে সেই কচি-মুখে বালিকা বলিল,—

"না বাপু, ফুলটা-ফলটায় আমার গান শুনিতে পাবে না;—আরো কিছু উঠিতে হবে। ফুল আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু গাছ থেকে তাহা তুলিতে ইচ্ছা হয় না। ফুল, গাছে ফুটে থাকে, তাই দেখিতে ভাল। আর যদি তোলাই হয়, ত দেবতার পূজায় তা দাও—ছ'য়ে মানাবে ভাল।—আর কে কি দিতে পার, বল?"

নিকটে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল,—"তোমার ছ'হাতে ছুটি সন্দেশ দিব,—গাওত মা?"

গৌরী।—না ঝি, তোমার এ লোভ-দেখানয় আমি ভুলিতে পারিলাম না। সন্দেশ আমি ভালবাসি না। আর ভালবাসিলেও, অন্যে খেলে যেমন সুখ হয়, নিজে খেলে তেমন হয় না।—তুমি সন্দেশ খাবে?

পরিচারিকা অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরীর মন পড়িয়া রহিয়াছে,—সেই পিসীর উপর। পিসী প্রথম প্রস্তাব করিয়াছেন, আর 'বিধবা' কথায় তিনি ব্যথিত হইয়াছেন, সুতরাং গান গাহিতে হয়, ত তাঁহার কথাই রাখিতে হইবে।

গৌরী এবার অতিমাত্র মধুবর্ষিণী কণ্ঠে, তাহার সেই স্বাভাবিক করুণামাখা ঈষৎ সজল চক্ষু, পিসীর মুখোপরি স্থাপিত করিয়া বলিল,—"পিসীমা, এবার তুমি বলিলেই, আমি গান গাই।"

পিসি সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"তবে মা, পিসীর কথাই রাখিবে? মা আমার দয়াময়ী!—এত দয়া তোমার প্রাণে? পরের মন তুমি এমনি করিয়া বুঝিতে জান?"

মনে মনে বলিলেন,—"কে এ বালিকা? এ কচি-বয়সে কিরূপে এমন পরের ব্যথা বুঝিতে শিখিল? সত্যই কি জগদ্ধাত্রী-গৌরী শাপ-ভ্রষ্টা হ'য়ে এসেছে?"

গৌরী ভাবিল,—"পিসিমা বিধবা; বিধবার তবে

বড় কষ্ট! কি করিলে এ কষ্ট দূর হয়?—এমন বিধবা তবে আরো অনেক আছে? আচ্ছা, এখন ত গান গেয়ে সকলকে ভুলিয়ে রাখি,—এর পর 'বিধবা' কি বুঝিব।"

পিসী বলিলেন, "তবে মা গানটি গাও,—নেচে নেচে হাতে তালি দিয়ে গাও।—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার শত-বর্ষ পরমায়ু হোক্।"

গৌরী।—তবে নাকি পিসীমা তোমার কিছু নেই?—হাঁ দিদি, তুমিও না বলিতেছিলে,—পিসীমা—কি মানুষ,—কোথায় কি পাবেন,—কি দিবেন? হুঁ, এমন জিনিস থাকিতে, আবার কি দিবেন? প্রাণের আশীর্ব্বাদের বাড়া আর কোন্ জিনিস বড়? সকলে এমন আশীর্ব্বাদ করিতে পারে কি?

এমন সময় গৌরী-জননী গৃহকর্ত্রী জয়দুর্গা তথায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। ধীরা, প্রশান্তগমনা, গম্ভীরা তিনি;—ধীর পদে আসিয়া, স্মিতমুখে অথচ গম্ভীরভাবে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"সকলে, কি আশীর্ব্বাদ করিতে পারে না, গৌরী?"

গৌরী।—এই মা, প্রাণের আশীর্ব্বাদ।—হাঁ মা, সত্য নয়?

মাতা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"সত্য। প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলে, নারায়ণ তার কথা শুনেন।"

গৌরী।—মা, এ কথাটি তোমার কাছে এই নূতন শুনিলাম। এমন কথা আমি আর কখন শুনি নাই;—"প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলে, নারায়ণ তার কথা শুনেন।" আমিও মা তবে বড় হ'লে, লোককে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিব।

জয়দুর্গা, সেই বর্ষীয়সী বিধবা—'পিসির' পানে চাহিয়া কহিলেন,—"কথাটা কি হইতেছিল দিদি?"

বিধবা, গৌরীর গানের কথা বলিলেন। তার মুখে গান শুনিতে সকলের ইচ্ছা হইয়াছে, সেই কথা বলিলেন। এবং সেই জন্যই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে,—তাহাও বলিলেন;—কেবল সেই অবান্তর কথাটি—তাঁহার বৈধব্যদশার কথাটি বলিলেন না।

শুনিয়া জয়দুর্গা বলিলেন,—"তা বেশ ত, গৌরী নূতন গান কি শিখেছ, তোমার পিসীমাকে শুনাও না?"

গৌরী।—শুনাই মা।—তবে পিসীমা, তুমি সেই রকম হাতে হাতে তালি দাও।

পিসী।—দিই মা,—তুমি গাও।

গৌরী গান ধরিল। ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে, আধ-আধ

ভাষে, গান ধরিল। গানের বর্ণে বর্ণে ভাবের লহরী ছুটিতে লাগিল। সেই করুণামাখা মুখমণ্ডল সহ, সেই স্বাভাবিক ঈষৎ সজল চক্ষু,—সমভাবেই করুণা বিস্তার করিতে লাগিল। সে চক্ষু, অধিকাংশ সময় পিসীর পানে, এক একবার সমবেত স্ত্রীলোকগণের পানে ন্যস্ত হইতে লাগিল। পিসী দুই একবার হাতে হাতে তালি দিয়াই, তাল দেওয়া বন্ধ করিলেন, অথবা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন,—তাঁহার হাত যেন আপনা হইতে অবশ হইয়া গেল।—তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধা হইয়া পড়িলেন। গৌরী গায়িতে লাগিল,—

(গৌরী—একতালা।)

হে ব্যথা-দমন, শ্রীমধুসূদন,
ভব-ব্যথা হ'বে কবে হে লয়।
জীবে ব্যথা পায়, তুমি দয়াময়,
কেমনে তা দেখ, হইয়ে নিদয়॥

কোটী কল্প ধ'রে, যুগ যুগান্তরে,
পেয়ে আসে ব্যথা, দেবাসুর নরে.
তোমারি সৃজিত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে,
কেবা বলো হরি, ব্যথা না সয়॥

(আর) ব্যথা ব'লে ব্যথা, বিলাপের গাথা,
ধরা-বক্ষ ভেদি' উঠে যথা তথা,
কি করুণ স্বর, টলেও ভূধর,
(কেবল) তোমারি আসন, অটল রয়॥

তবুও তোমার নামটি 'দয়াল',
আছে হে বিদিত জীবে সর্ব্বকাল,
(তুমি) রাখ আর মার, তবুও কাঙাল,—
'কাঙালের হরি', ব'লে গাবে জয়॥

তবে কেন হরি, 'ব্যথাহারী'-নামে,
কলঙ্ক রটাও সাধ করি জ্ঞানে,
আঁধারে ডুবাও অজ্ঞানে অধমে,
কোলে টেনে লও, করুণাময়॥

কচি-পায়ে নাচিতে নাচিতে, ক্ষুদ্র কনক-করে তালি দিতে দিতে, মধুবর্ষিণী আধভাষে, সুর করিয়া গৌরী গায়িতে লাগিল,—'ব'য়ে-'স'য়ে, 'হ'য়ে-'ম'য়ে, 'ত'য়ে-'থ'য়ে, উলট-পালট করিয়া,—এর-কথা ওর-ঘাড়ে, ওর-কথা তার-ঘাড়ে ফেলিয়া,—যোড়ে-তাড়ে, অস্ফুট অস্পষ্ট শব্দে গায়িতে লাগিল,—তথাপি সেই স্বর-সঙ্গীতে—করুণা, প্রেম, অভিমান, ভাব, ভক্তি, ভালবাসা,—সকলই যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল,—চারিদিকে যেন সুধাবৃষ্টি

হইল;—সকলের হৃদয় মন তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

আমরা যে সর্ব্বস্থানে শিশুর ভাষায় শিশুর ভাব বা ভাব-অভিব্যক্তি ব্যক্ত করিয়াছি বা করিব, তাহা নহে,—আবশ্যকবোধে কোথাও স্বভাবের যথাযথ অনুসরণ করিয়াছি; কোথাও বা স্বভাবের স্থূল-দৃষ্টির অতীত অপূর্ব্ব আদর্শের সূক্ষ্ম-সৃষ্টির অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এমন না করিলে, এ শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করা সম্ভবে না;—অন্ততঃ এ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে তাহা অসাধ্য।

গৌরী গান গাহিল, সকলে দ্রব হইল। বালিকা নিজেও দ্রবময়ী হইয়াছে;—তাহার সেই সজল নয়ন-পল্লবে দুইটি অশ্রু-মুক্তা ঝুলিতেছে!

সকলের সকল অর্থবোধ হয় না। বোধ না হইলেও, ভাবে সকলে মুগ্ধ হইতে পারে,—মুগ্ধ হয়ও। তাই হিন্দুর শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার অনেক ভাবিয়া বলিয়াছেন,—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।"

ভাব বুঝিয়া সকলকেই চলিতে হয়। ভগবানকে ত বটেই,—মানুষকেও বটে। যে মানুষ বলে,—"আমার ভাবও নাই ভক্তিও নাই,—আমি সাদা-মাটা কথাই বুঝি,—প্রতেক শব্দের অর্থবোধ না হইলে, আমার নিকট সকলই অবোধ্য হয়"—সে সাফ্ মিথ্যা কথা কয়, কিংবা

কৌশলে বড়ই বিজ্ঞতার বড়াই করে। কথার মারপেঁচে যাহা বুঝাইতে হয় বুঝাও, হয়ত তোমার সমধর্ম্মা শ্রোতাও অনেক জুটিবে,—কিন্তু এ কথাটা খুবই খাঁটি যে, ভাব বুঝিয়াই অর্থবোধ করিতে হয়;—অর্থের খুঁটানাটী ধরিয়া, ভাব বুঝিতে গিয়া, ভাবের ঘরে গোল করিতে নাই।

মানব-ভাষা বুঝাইবার ত বিবিধ উপায় আছে; পরন্তু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা—এ সবের ভাষা ত এক 'ভাব' ব্যতীত আর কিছুতেই বুঝিবার যো নাই? মানব-ভাষাই যদি তোমার সত্য সত্যই অবোধ্য হয়, তবে এ সবের হাত এড়াইবে কিরূপে? ইহাদের ত পুঁথিগত ভাষাও নাই, শব্দও নাই,—এখন ইহাদের লইয়াও ত ঘর-কন্না করিতে হইবে? ভাবে ভগবান্‌কে বুঝা ত দূরের কথা,—ভাবে ইহাদিগকে বুঝিতে না পারিলে যে, তোমার সংসারই অচল হইবে, এবং স্বয়ং তুমিও যে ক্রমেই একটি জড়পিণ্ডবৎ অচল হইয়া পড়িবে?

তাই বলিতেছিলাম, ভাবের কথায় ভাষাজ্ঞানের বা শব্দার্থবোধের তত আবশ্যক হয় না,—যত আবশ্যক হয়,—ভাব উপলব্ধি করিতে। নিরক্ষরা, দুগ্ধের শিশু গৌরী ভাবের কান লইয়া, কথকের মুখে পুরাণ-কাহিনী ও ভক্তি-সঙ্গীত শুনিয়াছে,—সেই কাহিনী ও সঙ্গীত তাহার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিয়াছে;—তাই সেই

কাহিনী ও সঙ্গীতের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি না হইলেও, সে ভাব বা সে ভাবের ছবি তাহার বুকের মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে;—সুতরাং, সম্যক্‌রূপে অর্থবোধ না করিয়াও সে তাহাতে না ডুবিবে কেন? আর যাহারা সে গান শুনিল, তাহারাই বা সে গানের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি না করিয়াও তাহাতে মুগ্ধ না হইবে কেন? তাই গৌরী, আধভাবে অস্পষ্টস্বরে গান গাহিয়া নিজেও ভাবময়ী হইল,—অন্যকেও ভাবে নিমগ্ন করিতে পারিল। আর সেই জন্যই তাহার সেই করুণাপূর্ণ নয়নপল্লবে, করুণার দুটি ক্ষুদ্র ধারা, মুক্তাফলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।

এই হিসাবে এ কথাও এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না যে, দেশকালপাত্রভেদে, পাঁচ বৎসরের শিশুতেও অনেক উচ্চভাবপূর্ণ কথা বলিতে পারে,—আবার অনেক সাধারণ কথাও অজ্ঞতাবশতঃ বলিতে বা বুঝিতে পারে না।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া গৌরীর বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেই দুগ্ধের শিশু,—যখন যে অসাধারণ বিষয় ভাবে বা দেখে, বলে বা শুনে,—তাহার মূলে, তাহার জন্মার্জ্জিত একটি অভ্রান্ত সত্য ও উচ্চ সংস্কার নিহিত আছে;—স্থূলদৃষ্টিতে, ভাসা-ভাসা চোখে তাহা দেখিলে, কিছুই বুঝা যাইবে না। সুতরাং

এরূপস্থলে আমাদিগকে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করিয়া, সেই পৌরাণিক উচ্চ আদর্শবাদ অবলম্বনে চলিতে হইবে, —নচেৎ উপায়ান্তর নাই।

গৌরী, কথক-মুখনিঃসৃত একটি গানে,—যেন জগতের ব্যথা উপলব্ধি করিতে করিতে, আধভাবে আধ সুরে তাহা আবৃত্তি করিয়া সকলকে দ্রব করিল,— এবং নিজেও দ্রবময়ী হইল। তারপর বালিকা সেইরূপ ভাবের লহর ছড়াইতে ছড়াইতে, করুণার আধভাযে, রোমাঞ্চিত-কলেবরে, পুনরায় একটি গান ধরিল। এবারও সেই 'ক'-য়ে 'ত'-য়ে, 'ব'-য়ে 'ভ'য়ে, 'ষ'-য়ে 'শ'-য়ে উলট-পালট করিয়া ফেলিল। গানটির বিশুদ্ধ অবস্থা এই ;—

(সুরট-মল্লার—একতালা।)

(মাগো) আর কত কাল, এ ভব-যন্ত্রণা।
যাতায়াত-ক্লেশ, হ'বে নাকি শেষ,
জনমে জনমে আর যে পারি না॥

ছেঁড়' কর্ম্ম-ফাঁস, জীবনের ত্রাস,
অশান্তি উদ্বেগ ভাবনা হতাশ,
কর দূর মায়া, দে মা পদ-ছায়া,
মিটেছে আমার সংসার-কামনা॥

দেখি মা নিয়ত, আসে যায় কত,
জলবিম্ব সম ফোটে ডোবে শত,
গ্রহ তারা খসে, পুন চাঁদ হাসে,
সে হাসিতে মন প্রবোধ মানে না॥

কেঁদে কেঁদে হায়, হ'য়েছি পাষাণ,
জীবন যেন গো বিজন শ্মশান,
স'য়েছি বিস্তর, বিপদ দুস্তর,
সকলি ত জানো, তুমি ত্রিনয়না ;——

(আর) কাজ নাই খেলা, প'ড়ে এল' বেলা,
চাহি না জিতিতে, (এবার) হারিবার পালা,
ধীরে ডুবে মোর অদৃষ্টের ভেলা,—
হায় রে পাষাণি ! তোরি ত ছলনা॥

গান শুনিয়া পুর-মহিলা এবং পোষ্য-পরিজনগণ সকলেই যেন ক্ষণকালের জন্য উদাস হইয়া গেল, এবং সকলেই যেন অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিয়া এক একবার বলিল,— "সত্যই এবার ভবের খেলায় হার হইল।"

তখন জননী-জয়দুর্গা, গৌরীকে কোলে লইয়া, অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, প্রগাঢ় স্নেহভরে গৌরীর মুখচুম্বন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"মা আমার! আশীর্ব্বাদ করি, বাঁচিয়া থাকো।"

উপরি-উপরি দুইটি গান গাহিয়া বালিকা যেন কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সেই সুকুমার মুখপদ্মে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, তিলকার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। পিসী সযত্নে সেই ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে জননী-কোল হইতে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"মা আমার, দু'দিন পরে কেমন করিয়া তুই আমাদের ভুলিয়া পরের ঘরে যাইবি?"

আধভাষে গৌরী জিজ্ঞাসিল,—"পরের ঘর, কোথায় পিসী মা?"

পিসী।—এই তোমার শ্বশুর-বাড়ী,—স্বামীর ঘর।"

গৌরী।—স্বামীর ঘর কি পিসীমা, পরের ঘর?

মার দিকে চাহিয়া বলিল,—"হাঁ মা, পিসীমার কথা সত্য?"

এ কথায়, মাও গোলে পড়িলেন, পিসীও পড়িলেন। পাঁচ-সাত ভাবিয়া মা উত্তর দিলেন,—"ও একটা কথার-কথা।"

আবার কি জানি কেন, বালিকার সেই পূর্ব্ব-কথা মনে পড়িল,—পিসীর সেই 'বিধবা' কথার অর্থ ও ভাব-গ্রহণে আগ্রহ বাড়িল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"হাঁ মা, 'বিধবা' কার নাম? বিধবা বড় কষ্টের

কথা, না মা? —ঐ দেখ মা, পিসী-মা কেমন জড়সড় হ'চ্ছেন। পিসীমার বড় কষ্ট, না মা?"

জয়দুর্গার গা-টা, সহসা যেন কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। পিসী, গৌরীর কথায়, সত্য সত্যই একটু জড়-সড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন যেন একটু ভৎর্সনার ভাবে বলিলেন,—"ও কি কথা গৌরী?"

জননী জয়দুর্গাও যেন একটু রাগতভাবে কহিলেন,—"ছি মা, ও-সব কথা তোমার কেন? ছেলে-মুখে বুড়ো-কথা শুনিলে লোকে নিন্দা করিবে।—চল, ঝির সঙ্গে তোমায় মার-মন্দিরে পাঠাই।"

জননী কন্যাকে শাসন করিলেন এবং ভুলাইলেন। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু ভুলিল না;—তাহার অন্তরের অন্তরে উজ্জ্বলরূপে জাগিয়া রহিল, সেই—'বিধবা'।

বালিকা ভাবিল,—"বিধবা নিশ্চয়ই কষ্টের কথা। নহিলে পিসী-মা অমন কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া, আমায় কোলে করিবেন কেন? আর মা-ই বা কেন ও-কথা শুনে, অমন ক'রে শিহরিয়া উঠিবেন?—আহা, পিসী-মার তবে কি কষ্ট! কি করিলে, পিসীমার এ কষ্ট দূর হয়?—হে হরি, তুমি ব'লে দাও, কি করিলে পিসীমার এ কষ্ট দূর হয়?"

এমনি ভাবে পর-ব্যথা-মোচনের কারণ-নির্ণয়ে, বালিকা

উন্মনা হইল। জীবনের সুখ-উষায়, এই ভাবেই করুণার কনক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। হায় মা, করুণারূপিণি!

রাত্রে শয়নকালে, বালিকা, পিতাকে জিজ্ঞাসিল,—"বাবা, 'বিধবা' কার নাম? বিধবা কি বড় কষ্টের কথা? আহা, পিসীমা বিধবা;—পিসীমার তবে বড় কষ্ট! আচ্ছা, আমি যদি বিধবা হই, তবে আমারও এমনি কষ্ট হ'বে? —ওকি বাবা, অমন ক'রে চুপ ক'রে রইলে যে?"

হঠাৎ প্রদীপের আলোটা নিবিয়া গেল। ছাদের আলিন্দায় বসিয়া একটা পেচক বিকট-রবে ডাকিয়া উঠিল। জননী জয়দুর্গার বুক দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল। তিনি কপালে করাঘাত করিলেন। হস্তস্থিত কঙ্কণ আঘাতে একটু রক্তপাতও হইল।

প্রশ্ন শুনিয়া, আত্মারাম অন্তরের অন্তরে শিহরিলেন। কিন্তু তৎসঙ্গেই মনে মনে একটু হাসিলেন। বিধাতার অব্যর্থ-বিধান দেখিয়া হাসিলেন। আবার সেই ভবিতব্য, সেই জ্যোতির্ব্বিদের গণনা, সেই গৌরীর জন্ম, সেই মায়ের মহাপূজা—একে একে মনে জাগিতে লাগিল। বুঝিলেন, ইহারই নাম ভবিতব্য, বা নিয়তির টান্,—অথবা অদৃষ্টের লিখন। কোন্ সূত্রে কোন্ কথার কি ফল হয়, তাহা তিনি জানিতেন। শাস্ত্রকারের অভ্রান্ত বাণী তাঁহার মনে পড়িল,—"যাদৃশী ভাবনাযস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"—হায়!

আত্মারামের ভাবনাও কি তবে আত্মজার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে? দুই হৃদয়ে কি এমনি যোগ হয়? চিন্তাও কি তবে সংক্রামক?

এইরূপ এবং আর অনেকরূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, আত্মারাম বিনিদ্র নেত্রে রাত্রি যাপন করিলেন।

এইরূপ অতি সূক্ষ্ম কথার আলোচনায়, মনে মনে অনেক করুণার ছবি অঙ্কিত করিয়া, বালিকা বাল্যেই যেন বর্ষীয়সী করুণাময়ী জননী হইয়া পড়িল। গুরুজন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কথকের মুখ-নিঃসৃত উপদেশে,—এবং সর্ব্বোপরি জন্মান্তরীণ আত্ম-সংস্কারে,—বাল্যেই বালিকা ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিল। এমনিভাবে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বালিকা সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিল। এ সময়েরও দুই একটি কাহিনী লিপি-বদ্ধ করিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণার মন্দিরে সুমধুর তানে নহবৎ বাজিল। চিত্রা, গৌরী, পুরবী,—এই সব আপরাহ্নিক কোমল সুরে বাঁশী বাজিতে লাগিল,—আর তদনুরূপ মিঠা বোলে, ধীর তালে, বাদক দামামায় ঠেকা দিতে রহিল। গোধূলির সোনার কিরণ বৃক্ষশিরে, মন্দির-চূড়ায়, অট্টালিকা-শিখরে, কুটীর-অগ্রভাগে ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল। আধ আলো, আধ ছায়ায়, প্রকৃতি-সুন্দরী হর-গৌরী মূর্ত্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন।

স্বভাবের সেই শান্ত স্নিগ্ধ গোধূলি-ছায়ায়,—সেই পরম প্রীতিপ্রদ পবিত্র সময়ে, অন্নপূর্ণার মন্দিরে নহবৎ বাজিতে লাগিল। আত্মারাম সপারিষদবর্গ শ্বেতপ্রস্তর সুশীতল মন্দির-মঞ্চতলে বসিয়া, সেই নহবৎধ্বনি শুনিতে

লাগিলেন। সে ধ্বনি মধুর হইতে মধুরতর;—স্থান-কাল-মনের মধুর মিলনে, সে ধ্বনিতে যেন অমৃতবর্ষণ হইতে লাগিল।

শুদ্ধপ্রকৃতি আত্মারাম, প্রশান্ত গম্ভীরভাবে, নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার নয়নানন্দরূপিণী কন্যা, মুখে অপার্থিব করুণা ও হৃদয়ে সেই করুণা-প্রতিবিম্বিত সোণার স্বপ্ন লইয়া, পিতৃ-আনন্দ পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য, যেন সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহার সহিত,—তাহারই যোগ্যা আর একটি বালিকা,—যেন ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে, তাহার অনুসরণ করিল। সেই বালিকার নাম,—শিবানী।

শিবানী, আত্মরামের পুরোহিত-কন্যা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ঢলঢল মুখ, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব। ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ চোখে মুখে নাকে চিবুকে আসিয়া পড়িয়াছে। গৌরীর পার্শ্বে সে উজ্জ্বল শ্যামমূর্ত্তি, অপরূপ সাজে শোভা পাইতে লাগিল। শিবানী ও গৌরী সমবয়স্কা।

দুই বালিকায় সুকুমার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে আসিতে লাগিল, পশ্চাতে পরিচারিকা তাহাদিগকে আগুলিয়া চলিতেছিল। গৌরীর এক হস্তে ক্ষুদ্র এক পাত্রে কিছু শর্করা; অন্য হস্তে জলপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র ঘট। শিবানীরও এইরূপ দুই হস্ত আবদ্ধ—

এক হাতে ক্ষুদ্র এক খুঁচিপূর্ণ কিছু তণ্ডুল, অন্যহাতে কিছু যব-ছোলা-কড়াই।—করুণারূপিণী বালিকাদ্বয়, মনে কি উচ্চ আশা লইয়া, এই ভাবে মায়ের মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কচি-পায়ে পথ চলিতে চলিতে গৌরী এক স্থানে থম-কিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ নীচু হইয়া, অতি সন্তর্পণে তাহার সেই সযত্ন-রক্ষিত ঘটটি ভূতলে রাখিল। পরিচারিকা, সেটি তুলিয়া নিজহস্তে লইতে গেল,—গৌরী নিষেধ করিল। স্বহস্তে সে তাহার মনের মানস পূর্ণ করিবে,—এই জন্য নিষেধ করিল। তার পর বালিকা দেখিল, সেই পথ-পার্শ্বস্থ এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত হইতে একদল পিপী-লিকা উঠিয়া, সারি গাঁথিয়া, উৎসাহভরে, আহারান্বেষণে চলিতেছে। তন্মধ্যে বা দুই দশটা পিপীলিকা দলভ্রষ্ট হইয়া, এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে খাদ্যদ্রব্যের আঘ্রাণ লইয়া বেড়াইতেছে। বালিকা আপন কনক করস্থিত পাত্র হইতে কিছু শর্করা তুলিয়া লইয়া, সেই পিপীলিকা-দলে অর্পণ করিল। যে গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা-দল উঠি-তেছে ও যে স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের গতি গিয়াছে, সেই দুই স্থানে কিছু কিছু চিনি রাখিয়া দিল। গতিশীল পিপী-লিকা-দল, সহসা সুতীব্র খাদ্য-গন্ধ পাইয়া, একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল;—কোথায় খাদ্য পড়িয়াছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের

দ্বারা তাহার সন্ধান লইল,—তারপর ধীরে ধীরে সেই পথে চলিতে লাগিল। এইরূপে, যাই সিদ্ধান্ত হইল, শর্করাটুকু তাহাদেরই আহারীয় দ্রব্য বটে,—অমনি ঝটিতি দলে দলে ক্ষিপ্রগতিতে সহস্র সহস্র পিপীলিকা সেই স্থানে সমবেত হইল এবং পরিপূর্ণ উৎসাহে সেই খাদ্য সঞ্চয়ে ও আহারে মনোযোগী হইল। এ দৃশ্য দেখিয়া, বালিকা, সত্য সত্যই অপার আনন্দ অনুভব করিল। মনে মনে বলিল,—

"হায়, মানুষ আপন আপন আহার লইয়াই ব্যস্ত; অন্যের আহার হয় কিনা,—হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, সে কথা একবার ভাবেও না। বড় জোর, এক মানুষ, আর এক মানুষের আহার যোগাইয়াই আপন কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করে। বড় হইয়া আমি এ প্রথা উঠাইব। মা-অন্নপূর্ণার রাজ্যে, কোন প্রাণী না অভুক্ত থাকে, আমি সেই ব্যবস্থা করিব।"

কেবল এক স্থানেই এই পিপীলিকা-দলে শর্করা বিলাইয়া বালিকা ক্ষান্ত হইল না,—যেখানে যেখানে পিপীলিকার গর্ত্ত আছে দেখিল, বা যেখানে যেখানে পিপীলিকা থাকার সম্ভাবনা বুঝিল, সেই সেই স্থানেই, সে, শর্করা ছড়াইল। এইরূপ,—ভূতলে, দেওয়ালের ফাটালে, ক্ষুদ্র চারা বৃক্ষ-তলে, কিছু কিছু শর্করা রাখিয়া দিয়া,—

মাতৃরূপিণী গৌরী, সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে চলিল। এইরূপ সে, প্রতিদিনই করিত।

গৌরীকে দেখিয়া, সহসা কোথা হইতে এক দল চড়ুই পাখী আসিয়া, গৌরীকে ঘেরিল। মুখে আনন্দ-সূচক ধ্বনি করিতে করিতে, তাহার সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে অধে আসিয়া লুটোপুটি হইতে লাগিল। কেহ মস্তকে, কেহ স্কন্ধে, কেহ বাহুমূলে, বসিয়া,—কেহ আশাপূর্ণ অন্তরে সম্মুখে উড়িয়া, আর কেহ বা অতি-আব্দারে বালিকার পায়ে-পায়ে জড়াইয়া, আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা যেন বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিল, তাহাদের এক অতি 'আপনার জন', সারাদিনের পর, তাহাদিগকে স্নেহ-সম্বোধনে প্রবোধিত করিয়া আদর করিতে, তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুঝিতে পারিল, যেন মূর্ত্তিমতী স্নেহরূপিণী মাতা, স্নেহে স্তন্য-দান-স্বরূপ, তাহাদের জন্য তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাই তাহারা প্রকৃতিদত্ত কিচি-মিচি স্বরে, মুক্তকণ্ঠে, আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর মাকে দেখিতে পাইয়া, মায়ের স্নেহের নিধি শিশুসন্তানগণ যেরূপ আনন্দ-কোলাহল করিয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। দেখিয়া, বালিকার চোখে জল আসিল। মনে মনে বলিল,—

"তবে, ইহারই নাম ভালবাসা;—ইহারই নাম করুণা! বড় হইয়া তবে আমি এই ভালবাসায় ও করুণায়,—জগৎসংসারকে আপনার করিয়া লইব। মানুষ ত দূরের কথা,—এই ভালবাসা ও করুণায়,—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকেও আপনার করা যায়।—বড় হইয়া কি তবে আমি এই ভাবে জীব, জগৎ ও জগদীশ্বরকে দেখিতে পারিব না? মা-জগজ্জননি! তুমিই আমার সহায় হইও।"

গৌরী, সঙ্গিনী শিবানীর হস্ত হইতে তণ্ডুলাদি লইয়া সমবেত চড়ুই পাখী দলকে খাইতে দিল। ভূতলে নিক্ষেপ করিবার আর বিলম্ব সহে না,—তাহারা গৌরীর সেই ক্ষুদ্র কনক কর-পদ্ম হইতেই সেই আহারীয়, নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে, মনের আনন্দেই খাইতে লাগিল। তারপর গৌরী সেই জলপূর্ণ ঘটটি তাহাদের সম্মুখে ধরিল;—তাহারা মনের সাধে সেই সুশীতল জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

সেখান হইতে দুই পা অগ্রসর হইতে-না-হইতে, অট্টালিকা-আলিন্দা ও মন্দির-চূড়া হইতে একদল পারাবত আসিয়া জুটিল। তাহারাও ঐ ভাবে, গৌরী-প্রদত্ত জল-তণ্ডুলাদি পানাহারে প্রবৃত্ত হইল। শিবানী মনে কি ভাবিয়া, স্বহস্তে একটি পারাবতকে খাওয়াইতে গেল। পারাবত তাহার সে স্নেহে ভুলিল না,—বুঝিল, তাহার

সেই মৌখিক স্নেহের সহিত, বুঝি আন্তরিক আর একটু কি সম্বন্ধ আছে। বুঝিল, সে স্নেহ গৌরীর স্নেহের মত অকৃত্রিম ও সরলতাময় নয়। তাই সে, তাহার নিকট হইতে একটু সরিয়া বসিল,—তার পর কি মনে করিয়া, তথা হইতে একেবারে উড়িয়া গেল।—সে দিন আর তাহার ভাগ্যে গৌরী-প্রদত্ত আহার জুটিল না।

ঘটনাটি গৌরী লক্ষ্য করিল,—পরিচারিকা লক্ষ্য করিল,—আর শিবানী ত লক্ষ্য করিয়াইছে। গৌরী তাহার সেই স্বভাব-সজল নয়ন-পদ্ম লইয়া, ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে, সঙ্গিনীর পানে চাহিল। সঙ্গিনী শিবানী ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও, গৌরীর সে নীরব হাসির অর্থ বুঝিল। মনে মনে সে অপ্রতিভ হইল। অপ্রতিভ হইল বটে, কিন্তু ব্যথিত হইল না। করুণাময়ী গৌরীর স্বাভাবিক করুণ-দৃষ্টি, অন্যায় বা অযথা দেখিলেও, সহসা কাহাকে ব্যথা দেয় না,—ব্যথা দিতে পারে না। তাই শিবানী, আপন প্রকৃতির দুর্ব্বলতা ও করুণার অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া,—অধিকন্তু গৌরী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে ভাবিয়া, অপ্রতিভ হইল। বিধাতার বিধানে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম বৃত্তি গুলি,—মানবের সকল অবস্থাতেই সমান। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে—সর্ব্বকালেই এক ;—কেবল অবস্থাভেদে তাহার ব্যবস্থা বা প্রকার-ভেদ হয় মাত্র। তাই, কারণ ঘটিলে,

অপ্রতিভ বা সপ্রতিভ, দুগ্ধের শিশুতেও হয়,—হইয়াও থাকে। এ ঘটনা সংসারে নিত্য ঘটে। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে জানিলে, শিশুতেও মহান্ মানব-হৃদয়-রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। শিবানী আত্ম-ব্যবহারে, আপনিই লজ্জিত হইয়াছে; কারণ পারাবতটি তাহার কৃত্রিম স্নেহ বুঝিতে পারিয়া উড়িয়া গিয়াছে; আর গৌরী তাহা বুঝিতে পারিয়া, ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে শিবানীর পানে চাহিয়াছে। গৌরীর সেই নীরব হাস্যের পর তাহাকে আর কোন কথা কহিতে হইল না,—শিবানী আপনা হইতে বলিল,—"ভাই গঙ্গাজল! পায়রাটা আপনা হইতে উড়িয়া গেল।—তবে পায়রাতেও আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারে?"

স্নেহপূর্ণ স্বরে গৌরী উত্তর দিল,—"শুধু পায়রা কেন ভাই,—ক্ষুদ্র উইপোকা-উকুনটি পর্য্যন্ত আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারে। আর কিছু না পারুক, ভালবাসা আর নিষ্ঠুরতাটি বুঝিতে পারে। কেননা, এই দুইটি লইয়াই জীবের জীবন-সমস্যা। ভগবান্ এই দুটি বুঝিবার শক্তি সকলকে দিয়াছেন। মানব হইতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারে। এই অংশে, সকল জীব সমান। সেইজন্য কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে নাই, কাহারও প্রতি দ্বেষ-হিংসা করিতে নাই,—সকলকেই আত্মবৎ দেখিতে হয়,—সকলকে ভালবাসিতে হয়।"

শিবানী বলিল,—“আমি ভাই অত-শত বুঝিতে পারি না,—তাই আমোদ ক’রে পায়রাটা ধরিতে গিয়াছিলাম।”

এবার গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল,—“শুধুই কি ধরিবার আমোদ মনে ছিল?—তার বেশী আর কিছু নয়?”

শিবানী।—তোমার কাছে লুকাইব কেন গঙ্গাজল?—পায়রাটা ধরিয়া তাহার ডানা হইতে দুটো পালক লইব মনে ক’রেছিলাম।

গৌরী এবার যেন একটু অধিক ব্যথিত হইয়া গদ্গদ-স্বরে বলিল,—“তবে দেখ, তোমার মনে এক, আর মুখে এক ছিল! এমন মনে-মুখে পৃথক্ করিতে নাই। আর এমন আমোদও মনে স্থান দিতে নাই। যাতে আর এক জনের কষ্ট হয়,—আর একজন যাতে ব্যথা পায়,—তাতে তোমার আমার আমোদ বা উপকার হ’লেও, তা করা মহাপাপ।”

শিবানী।—একথা আমায় কেহ শিখায় নাই। সংসারে সকলেই এমনি করে, আমিও তাই ঐরূপ করিতে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, ইহাই বুঝি সংসারের রীতি। বুঝিলাম, এই কপটতা ও প্রবঞ্চনা ভাল নয়, —সকলেই ইহা বুঝিতে পারে,—পাখীটিও বাদ যায় না। ঐ পায়রাটির যদি মানুষের মত কথা কহিবার শক্তি থাকিত, ত নিশ্চয়ই সে ঘৃণার সহিত আমায় দু’কথা শুনাইয়া দিত,

আর ঐ মন্দির-চূড়ায় বসিয়া, আমার পানে চাহিয়া, অবজ্ঞাভরে আমায় উপহাস করিত।—বোন্, তোমার ঐ করুণামাখা মুখমণ্ডল ও স্বভাব-সজল নয়ন-পল্লব দেখিয়া, এখন আমি সহজেই যেন এ ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

গৌরী।—ভগবান্ তোমার মনের চোখ খুলে দিন,—তুমি যেন এইভাবে জগৎকে দেখিতে শিখ।

শিবানী।—এখন বুঝিতেছি, পায়রাতেও সত্য মানুষ চিনে। আমার মনের পাপ বুঝিয়া, তাহারা আমার হাতে খাইল না, কিন্তু তোমার হাতে কেমন আমোদ ক'রে খাইতে লাগিল। আর চড়ুইপাখী গুলো তো একেবারে ঝাঁক বেঁধে তোমার গায়ে এসে পড়িল। সত্য বোন্, তুমি ভাগ্যবতী।

গৌরী।—মনে করিলে, এ ভাগ্য তো তোমারও হয়? পরমেশ্বর আর আর বিষয়ে মানুষকে অন্যের মুখাপেক্ষী করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরে সকলকে সমান স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। মনে করিলে সকলেই অন্তরে বড় হইতে পারে।—আহা, সকলে তাহা মনে করে না কেন? তাহা হইলে সংসার কি সুখের স্থান হয়!

শিবানী।—আমি বোন্, এখন হইতে সর্ব্ববিষয়ে তোমায় দেখে-শুনে তোমার মত হ'য়ে চলিতে চেষ্টা করিব।

গৌরী।—ঠিক তা নয়, আমারও দোষ আছে,—পরে আরও দোষ জন্মিতে পারে,—তুমি সহজ-জ্ঞানে সরল পথ ধরিয়া চলিও,—কখন বাঁকা-পথে যাইও না। বাঁকা-পথে পদে পদে বিপদ—নিজেরও বটে, পরেরও বটে। বিশেষ, আহারের কি কোনরূপ আসক্তির লোভ দেখাইয়া, দুর্ব্বল লোভী জীবকে আপন আয়ত্তে আনিয়া, ছলে বলে বা কৌশলে তাহার কোনরূপ অনিষ্ট করা, অতি-বড় নিষ্ঠুরের কাজ।—ভাই! আমার 'গঙ্গাজল' হইয়া, তুমি এমন নিষ্ঠুরকার্য্যে লিপ্ত হইবে কেন?

শিবানী।—যা হইবার হইয়াছে,—আর আমি কখন কপটতার প্রশ্রয় দিব না। মনকে গঙ্গাজলের মত,—ভাই গঙ্গাজল, তোমার মত, পবিত্র, শীতল ও স্বচ্ছ করিব। বাবা তোমায় বলেন—করুণাময়ী। সত্যই তুমি করুণাময়ী। প্রাণে করুণা না থাকিলে কি তুমি কীট-পতঙ্গের আহার যোগাও?—পশু-পক্ষীও তোমার বশ হয়? এখন চল ভাই, মার মন্দিরে গিয়া উঠি। ঐ দেখ ভাই, তোমার বাপ, কেমন একদৃষ্টে তোমায় দেখিতেছেন। বুঝি উনি আমাদের কথাবার্ত্তা, কতক কতক শুনিতেও পাইয়াছেন।

গৌরী।—তা শুনুন না, কিছু মন্দ কথা ত হয় নাই?

বালিকাদ্বয় অগ্রে অগ্রে, পশ্চাতে পরিচারিকা, অন্নপূর্ণার মন্দিরে গমন করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা

হয়-হয়। তাহারা বিস্তৃত মন্দির সোপানাবলী আরোহণ করিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় একটি নিরীহ কপোত, হিংস্রক শ্যেন্-পক্ষী কর্তৃক আহত হইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে, গৌরীর বক্ষের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। চমকিতা গৌরী, সজলনয়নে একবার পক্ষীপানে, আর বার ঊর্দ্ধে আকাশপানে চাহিয়া দেখিল,——হায়! এমন নিষ্ঠুরের কাজ কে করিল? ঐ বড় পাখীটা কি? পাখী হইয়া পাখীর প্রাণসংহার করিল?

করুণাময়ী বালিকার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—নীরবে, শতধারে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল,—সে তপ্ত অশ্রুধারায় কপোতের সদ্য-ক্ষত রক্তাক্ত দেহ নিষিক্ত হইল,—ধৌতের জন্য বুঝি স্বতন্ত্র জলের আর প্রয়োজন হইল না।—মুহূর্ত্তের জন্য কপোত একবার চক্ষু মেলিল। মুমূর্ষু সন্তান, যেমন অন্তিম-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, নীরবে, সজল নয়নে, জননীপানে চাহিয়া থাকে,—বলি-বলি করিয়া যেমন সে যন্ত্রণা সে ব্যক্ত করিতে পারে না,—কপোত যেন ঠিক সেই ভাবে সেই অন্তিম-যন্ত্রণা বুঝাইবার জন্য,—এক-বার চক্ষু মেলিল। দেখিল, স্নেহার্দ্রময়ী জননী তাহাকে বুকে করিয়া, করুণার অমৃতধারা ফেলিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া পক্ষীর পক্ষী-জন্ম ধন্য হইল। সে বুঝি মমতার এ অমৃতাস্বাদ জন্মান্তরে পাইয়াছিল,—তাই সেই নিষ্ঠুর

শ্যেনের তীক্ষ্ণ-নখরে দীর্ণপ্রায় হইয়া, সে যন্ত্রণার তীব্রতা বুঝাইবার জন্য, অন্য কোথাও পতিত না হইয়া, জননী-রূপিণী স্নেহময়ী গৌরীর অঙ্গেই রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সেই মমতাময়ী মাতাও, যেন প্রকৃত সন্তান-বাৎসল্যে আকৃষ্ট হইয়া, ক্ষণেকের তরে, আত্মবিস্মৃতভাবে, বিগলিত অন্তরে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরস্পরের সে নীরব সন্দর্শনে, নীরব অশ্রুধারাই, পরস্পরের উত্তর প্রদান করিল।—সদ্যাহত কপোত, নীরবে, কাতর নয়নে বালিকাপানে চাহিয়া, আপন মর্ম্মান্তিক অন্তিমবেদনা জানাইতেছে, আর করুণারূপিণী গৌরী ঠিক যেন জননীর হৃদয় লইয়া, তাহার সেই নীরব কাতরতা উপলব্ধি করিতেছে।—প্রবলের অত্যাচারে সাংঘাতিকরূপে আহত—মুমূর্ষু সন্তানকে কোলে করিয়া বসিয়া, জননী যেমন নির্ব্বাক্ স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিতে চাহিতে, প্রতি পলে মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, গৌরীও যেন ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে, মুমূর্ষু কপোতকে বুকে লইয়া, পলকহীন নেত্রে, তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে! পরিচারিকা জল আনিয়া কপোতের মুখে চোখে নিক্ষেপ করিল,——হরি হরি! সেই জলে মুহূর্ত্তের জন্য রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া, বার দুই চার কণ্ঠনালী

কাঁপাইয়া, কপোত—কপোত-জন্ম শেষ করিল! তাহার ঘাড়ের 'ডুগী' ভাঙ্গিয়া পড়িল,—জন্মের মত তাহার দুই চক্ষু মুদিত হইল;—ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও সে চক্ষু আর খুলিবে না!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে, নিষ্ঠুর শ্যেন্-কর্ত্তৃক আহত হইয়া, কপোত কপোত-জন্ম শেষ করিল,—বালিকা গৌরী সেই মৃত-কপোত কোলে লইয়া, স্থির-নিশ্চলভাবে, নির্নিমেষ নয়নে বসিয়া রহিল। কপোত মরিল, তৎসঙ্গে করুণারূপিণী বালিকার হৃদয়ে, চিরদিনের মত একটি করুণার ছাপ্ পড়িল। অনেক সহিতে হইবে বলিয়াই, যেন বিধাতা বহুপূর্ব্বে বালিকার কচি-বুকে শোকের শক্তি-শেল বসাইয়া দিলেন।

বালিকা মৃত-কপোত কোলে লইয়া, যেন মৃতকল্প হইয়া বসিয়া রহিল,—মুহূর্ত্তকাল কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না,—বলিতে সাহসী হইল না। পরিচারিকা ও শিবানী, সেখানে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরিচারিকা মনে

মনে ভাবিল,—"ওমা, আমি ত এমন ধারা আর কখন দেখি নাই! আমার এই এতখানি বয়স হ'লো,—ঢের-ঢের ছেলে-মেয়ে দেখেছি,—এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। এঁ্যা! এ গৌরী কি তবে শাপভ্রষ্টা গৌরী? এই কচি প্রাণে এত দয়া,—এত ব্যথাবোধ! আমার যে একেবারে হক্‌চকিয়ে দিলে,—মুখের 'রা' যে ফুট্‌চে না?"

শিবানা ভাবিল,—"এ আমারই নষ্টবুদ্ধির ফল! মনের মধ্যে পাপ পুষিয়া, যে পায়রাটিকে আমি খাওয়াইতে দিয়াছিলাম, বুঝি এ সেই পায়রা। হায়, পায়রাটি না খাইয়া, প্রবলের অত্যাচারে, বাজ্‌পক্ষীর তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে, ব্যথার ব্যথীর বুকে পড়িয়াই মরিল,—আমার এ পোড়া বুকে আসিল না! গঙ্গাজল যেন আমার, কেমন হইয়া গেল।—কোন্ মুখে আর কথা কই?"

গৌরীর মনে, তখন বুঝি এই ভাবের উদয় হইতে ছিল,—"হায়, দুর্ভাগ্য জীব! কেন তোর এমন নিষ্ঠুর মরণ হইল? আমার বুকের কলিজা ভাঙ্গিয়া দিবি বলিয়া কি, তুই আমার বুকে পড়িয়া মরিলি? হায়, কে তোর এ দশা করিল? এমন ভাবে, কে তোর মৃত্যুর কারণ হইল? বাজ্‌-পক্ষীই কি এ ক্ষেত্রে সকল অনর্থের মূল? তারই বা এ ক্ষমতা কে দিল?—ব্যথাহারী মধুসূদন, এই কি

তোমার ব্যথাহারী নাম? হায় মা পৃথিবি! তোর বুকে এত ব্যথা?"

তিনজনেই নীরব,—কাহারও মুখে বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি নাই। মুহূর্ত্তকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল।

মায়ের মর্ম্মরপ্রস্তর মঞ্চতলে বসিয়া,—আত্মচিন্তা-নিরত আত্মারাম এই করুণদৃশ্য দেখিতে ছিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে, তাঁহার অনেক চিন্তা মনে জাগিতেছিল। প্রাণাধিকা তনয়ার অদ্যকার কার্য্যাবলী, তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি বহুক্ষণ হইতে, নিবিষ্টমনে গৌরীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন,—ভাববিহ্বল-চিত্তে বালিকার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া, মনে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিতেছিলেন।—বালিকার সেই পিপীলিকাকে শর্করাদান, কপোত-চড়ুই পাখীদের সেই জল-তণ্ডুলাদি দান,—পরম প্রীতিপূর্ণ নেত্রে অবলোকন করিতেছিলেন। তার পর দুই বালিকার উচ্চভাবপূর্ণ কথাবার্ত্তা,—তাহারও কতক কতক তিনি শুনিতেছিলেন। শুনিয়া হর্ষে, আনন্দে, বিস্ময়ে এক একবার রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া উঠিতেছিলেন। নহবতের সেই ধীর-মধুর ধ্বনি অপেক্ষাও গৌরীর কণ্ঠধ্বনি—বালিকার সেই গভীর জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন,—তাহার মধুরতর বোধ হইতে-ছিল। তিনি একাগ্রচিত্তে, আত্মজার এই অপরূপ

শৈশব-খেলা দেখিতেছিলেন। তারপর, হায়!—তারপর যখন দেখিলেন, মন্দির-সোপান-আরোহণের সম-সমকালে, গৌরীর কচি-বক্ষে, রক্তাক্ত কলেবর একটি কপোত উৰ্দ্ধ হইতে লুটাইয়া পড়িল,—শিকারী শ্যেনের সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ও বিষম পাক্‌সাটে,—যখন সেই নিরীহ পারাবতটি মৃতকল্প হইয়া, অন্তিমের সহানুভূতিলাভে, জননীরূপিণী মূৰ্ত্তিমতী করুণার কোমল ক্রোড়ে স্থানলাভ করিল,—এবং তারপর যখন সেই মাতাপুত্রের নীরব যন্ত্রণানুভব ও নির্ব্বাক্ রোদন, পরস্পরের প্রতি সেই অনিমেষ কাতর দৃষ্টি, সেই বাক্‌হীন মৰ্ম্মন্তুদ ব্যথা, ও সৰ্ব্বশেষ—সেই একের বিয়োগে অন্যের গভীর শোক-বিহ্বলতা—সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিলেন, তখন তাঁহার সেই স্বাভাবিক গম্ভীর মূৰ্ত্তি আরও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইল;—পরন্তু সেই গাম্ভীর্য্যের সহিত ভগবদ্ভক্তের ভক্তিময়ী করুণা ও আত্মজার সেই মন্দাকিনী-ধারা-নিঃসৃত বিশ্বব্যাপিনী করুণার মধুর ভাবাভিনয় মিশিয়া,—সে মূৰ্ত্তি গাম্ভীর্য্যে সুন্দর ও অপূৰ্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। মূৰ্ত্তি বা মুখের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, স্বাভাবিক স্বরেরও অনেক তারতম্য হয়। তাই, উপস্থিত মুহূর্ত্তে, আত্মারামের কণ্ঠস্বর বড় মধুর, বড় পবিত্র, বড় করুণাপূর্ণ হইল। সেই করুণাপূর্ণ কণ্ঠে, অন্যের অগোচরে, তিনি আপনাআপনি কহিলেন,—"মা অন্নপূর্ণে!

তোমার মন্দির-প্রাঙ্গণে এ স্নিগ্ধ সায়ং-সন্ধ্যায়,—আজ এ কি করুণার ভাবাভিনয় দেখিলাম! মা আমার, আমার ভবানীর মঙ্গল ক'রো!"

ধীর-গম্ভীর ভাবে, আত্মারাম মন্দির-সোপানাবলী অবতরণ করিলেন। যেখানে, মৃত-কপোত ক্রোড়ে লইয়া করুণারূপিণী কন্যা স্থির নিশ্চলভাবে বসিয়াছিল, ধীরপদে সেইখানে আসিলেন। স্নেহপরিপ্লুতস্বরে, গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "মা আমার! মন্দির-উপরে এস,—মার আরতির সময় হ'লো।"

গৌরী নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধভাবে রহিল,—সে স্বর তাহার কর্ণে স্থান পাইল না।

পিতা পুনরায় ডাকিলেন,—"ভবানী, এখান হইতে উঠ,—মার মন্দিরে যাইবে চল।"

এবার যেন বালিকার চমক ভাঙ্গিল। খুব জোরে একটা মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া পিতার পানে চাহিল। আবার সেই সকরুণ, স্বভাবসজল স্থির নির্ব্বাক্ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে, নূতন যেন কি মিশিয়াছে।—আত্মারামের চক্ষে জল আসিল,—মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার কণ্ঠরোধ,—বুঝি দৃষ্টিলোপও হইল।

এমন সময় অদূরে, মায়ের মন্দির-সন্নিহিত অতিথি-শালায়—"বল হরি হরিবোল" রবে এক ধ্বনি উঠিল।

সকলের কান সেই দিকে গেল। আত্মারাম, সম্মুখবর্ত্তী এক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, অতিথিশালায় এক যাত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ধীরভাবে তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

কন্যার পানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, "ভবানী, এখান হইতে উঠিয়া মার মন্দিরে চল।"

এবার গৌরী কথা কহিল। কিছু ভার-ভার স্বরে, অপেক্ষাকৃত গম্ভীরকণ্ঠে পিতাকে বলিল, "বাবা, আজ আর আমি মার মন্দিরে উঠিব না,—আজ আমার অশুচি।"

'কে, এ বালিকা? এ কি শিশু,—না বর্ষীয়সী কোন প্রৌঢ়া? অথবা হায়, ছদ্মবেশিনী,—বালিকারূপিণী কোন দেবী?'

আত্মারামের যেন ভ্রম হইল,—তিনি যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"মায়ের আরতির সময় হ'য়েছে,—আপনি আসুন।"

আত্মারাম।—ভবানী, আজ তবে মায়ের আরতি দেখিবে না? আমি তবে যাই?

গৌরী।—হাঁ বাবা, যাও। আমার অশুচি,—মাকে একথা জানায়ো।

আবার সেই করুণস্বর,—"আমার অশুচি।" আত্মা-রামের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চক্ষে জল আসিল। মনে মনে বলিলেন, "মা, অশুচি তোমার? এই কচি-বয়সেই জীবের প্রতি এ মমতার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলে? মমতাময়ি, বালিকে! মাতার বিশ্বপ্রসারিণী মমতা লইয়াই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ;—সেই জগন্মাতা জগদম্বাই তোমার মমত্ব-বুদ্ধির সহায় হইবেন।"

গৌরী ও শিবানীকে বাটী লইয়া যাইতে, আত্মারাম পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। তিনি মায়ের আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

আবার সেই অতিথিশালা হইতে গম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"বল হরি—হরিবোল।"

মুহূর্ত্তের জন্য সকলের শরীর রোমাঞ্চিত ও দেহ কণ্ট-কিত হইয়া উঠিল। কি পবিত্র, গম্ভীর, ভীতিবৈরাগ্যপূর্ণ সে স্বর! মন্দির-সোপানে উঠিতে উঠিতে আত্মারাম মনে মনে বলিলেন,—"কে রে ভাগ্যবান্, এ মধুর সন্ধ্যায়, মায়ের আরতির সময়, গম্ভীর হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে, স্বর্গে যাইতেছে!"

গৌরী ভাবিল,—"জীবের এই পরিণাম? সকলকেই তবে যাইতে হয়? কেহ সুখে যায়, কেহ দুঃখে যায়,—এই মাত্র প্রভেদ। কোথায় যায়?—মা-আনন্দময়ীর ক্রোড়ে।

তবে আমায়ও একদিন যাইতে হইবে? কিন্তু বিলম্ব আছে। যাইবার আগে কাজ করিয়া যাইব,—পরকালের পথ প্রশস্ত করিয়া যাইব,—নচেৎ আবার আসিতে হইবে।"

কে, এ বালিকা? একি বালিকা, না মায়ামূর্ত্তি?

নবম পরিচ্ছেদ।

এবার সেই পরিচারিকা আপনা আপনি বলিয়া উঠিল,—"কি সুখের মরণ!"

স্নেহমাখা স্বরে গৌরী বলিল, "ঝি, এইরূপ মৃত্যু তোমার ইচ্ছা হয়?"

পরিচারিকা।—জন্মিলেই যখন মৃত্যু, তখন এমন মরণ, কে না কামনা করে?

গৌরী।—মৃত্যুই তবে নিশ্চিত,—আর সব অনিশ্চিত? —কেমন ঝি?

এ প্রশ্ন ঝিয়ের যেন ভাল লাগিল না, বলিল, "তা এসব কথা তোমার কেন দিদি? এখন ঘরে চল,—মরা পায়রাটা কোল থেকে ফেলে দাও। গা-হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছাড়িবে চল। অমন বিষণ্ণ ভাবে থেকো না।

মার আরতির পর, দুর্গাবাড়ীতে পুরাণ-পাঠ হ'বে, শুনিবে অথন।"

এবার বালিকার চোখে জল আসিল। কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "ঝি, পায়রাটিকে ফেলে ঘরে যাব কিরূপে? আমার পা যেন অবশ হ'য়ে গেছে,—এখান থেকে উঠিতে পারি না।"

পরিচারিকা।—আমার কোলে উঠে যাবে চল। কি কর্‌বে বোন্, সংসারের গতিই এই। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, চিরদিন হ'য়ে আস্‌ছে।

গৌরী আবার যেন তত্ত্বজ্ঞানময়ী প্রৌঢ়া হইল। বলিল,—"চিরদিন হ'য়ে আসছে? কেন হয়? এ নিয়ম কি কেহ রোধ করিতে পারে না? এর কি কেহ কর্ত্তা নাই?"

অনেক ক্ষণের পর শিবানী এবার কথা কহিল। দেখিয়া শুনিয়া, সেও যেন জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী প্রৌঢ়া হইয়াছে। সঙ্গগুণে, উচ্চ মনোবৃত্তির প্রভাব, আর একজনের উপরও প্রভাবিত হয়। গৌরীর প্রভাব, শিবানীর উপরও কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। তাই শিবানী বলিল,—"কর্ত্তা সেই ভগবান। তাঁরই ইচ্ছায় সকলই হয়। এই যে বাজ্‌পক্ষী পায়রাটিকে বিনষ্ট করিল, এও তাঁর ইচ্ছা।"

গৌরী।—তাঁর ইচ্ছা? তবে তিনি কেমন?—তিনি কি নিষ্ঠুর,—ইহাই বলিতে চাও?

শিবানী।—বাবার কাছে শুনেছি, জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে জীব এ যন্ত্রণা ভোগ করে। প্রবল, দুর্ব্বল, অত্যাচার—এ সকলি জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল।—এতে বিধাতার কোন হাত নাই।

গৌরী।—হায়, কেমন সে বিধাতা? কিরূপ তাঁর বিধান? শুনেছি,—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ইচ্ছাময়। তা ইচ্ছাই যাঁর কার্য্য, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত এ জগৎ সুখের করিতে পারিতেন? তবে কেন জগতে এত দুঃখ?

শিবানী। সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার। শুধু সুখটুকু থাকিবে, দুঃখ থাকিবে না,—এমন হইতে পারে না। আলোর পর অন্ধকার, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, জীবনের পর মৃত্যু—পর্য্যায়ক্রমে হইয়া আসিতেছে। সুখ দুঃখও সেই পর্য্যায়ভুক্ত। এ নিয়ম কে রোধ করিবে?

গৌরী।—কে রোধ করিবে, তা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, জগৎ হইতে হিংসাবৃত্তি উঠিয়া গেলেই ধরার ভার অর্দ্ধেক লাঘব হয়। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের যে অত্যাচার, তাহার মূলেও হিংসা। এই হিংসাই সর্ব্ব অনর্থের মূল। দেখ, স্বজাতির প্রতি স্বজাতির হিংসা,

যেন প্রকৃতিগত একটা ধর্ম্ম। মানুষ মানুষের প্রতি হিংসা করে, পশু পশুর প্রতি হিংসা করে, পক্ষী পক্ষীর প্রতি হিংসা করে;—কীটপতঙ্গাদি পর্য্যন্ত এ নিয়মে বাদ পড়ে না।

শিবানী।—এই হিংসার মূল কোথায়, ভাবিয়াছ কি?

গৌরী।—ভাবিয়াছি,—স্বার্থ। আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রাধান্যের জন্যই এই স্বার্থ অবলম্বন করিতে হয়। ছোটটি হইতে বড়টি পর্য্যন্ত,—কীট-পতঙ্গ হইতে মানুষ অবধি,—এই স্বার্থে জড়িত। বাজ্‌পক্ষী যে পায়রাটিকে বিনষ্ট করিল,—ইহাও তাহার জীবধর্ম্মের ফল—সেই স্বার্থ। এই স্বার্থ বর্জ্জন করিতে হইবে। বিধাতার চরম সৃষ্ট—মানবকে ইহার আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। কেননা, মানব-মনেই ভগবান্ বিবেকবুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়াছেন,—অন্য জীব তাহাতে বঞ্চিত। সেই জন্যই মানবের সারধর্ম্ম—

"জীবে দয়া, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।"

বড় হইয়া আমি এই মহাধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

শিবানী।—গ্রহণ করিব কেন বলিতেছ, ইতিমধ্যেই তুমি তাহা গ্রহণ করিয়াছ। জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি না হইলে কি তুমি একটি পায়রার বিয়োগে বিগলিত হও? ভাই গঙ্গাজল, তুমিই সার বুঝিয়াছ,—

'জীবে দয়া, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।'

—ইহাই মানবের সার ধর্ম্ম। তবে আর ভগবানের বিধানে দোষ দাও কেন ভাই?"

গৌরী।—দোষ দিই নাই,—তবে কিছু ব্যথিত হইয়াছি। তা এ ব্যথাবোধও আমার জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল—গঙ্গাজল, তোহার কথাই ঠিক বটে। আমি ক্ষণিক শোকের মোহে, এ সার কথা ভুলিয়াছিলাম। মা জগজ্জননি, আমায় ক্ষমা কর।

ঢং-ঢং ঠং-ঠং ভোঁ-পোঁ রবে, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়া উঠিল; তাহার সহিত দামামার গম্ভীরধ্বনিও মিলিত হইল;—ঘোর রোলে অন্নপূর্ণার আরতি হইতে লাগিল। সেই আরতির সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদ্বয়ের তত্ত্বকথারও অবসান হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জ্যোৎস্না-রাত্রি। পরিষ্কার জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নারূপ শীতল-সলিলে তাপদগ্ধা প্রকৃতি যেন স্নাতা হইতেছেন। চারিদিক্ শান্ত, স্থির ও মধুময়। ঝির্-ঝির্ বায়ু বহিতেছে। সকলেই উৎফুল্ল। কেবল হায়! গৌরীর বুকের ভিতর মর্ম্মকাতরতা,—তাহার প্রাণের ভিতর আজ করুণার সজল ছবি!

শঙ্খ-ঘণ্টা-দামামার ঘোর রোলে, ধূপ-ধুনার সদ্গন্ধে ও পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে, মায়ের আরতি হইতে

লাগিল,—দর্শকবৃন্দ ভক্তিভরে সে আরতি দর্শনে রোমাঞ্চিত কলেবর হইল,—যার যাহা প্রার্থনা, সে মনে মনে মার নিকট তাহা 'মানৎ' করিল,—আর গৌরী, পরিচারিকা-সহচরী-সহ, মায়ের মন্দির-নিম্নে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, শষ্প-শয্যাতলে বসিয়া, মৃত পারাবত বুকে লইয়া, অশুচি কলেবরে, সে আরতির মঙ্গলধ্বনি শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বালিকার দেহ কণ্টকিত ও রোমাঞ্চিত হইল। সেই কণ্টকিত ও রোমাঞ্চিত দেহে, যুক্তকরে, সজল ঊর্দ্ধ নয়নে, বালিকা বলিতে লাগিল,—

"মা বিশ্বজননি! আজ আর তোমার আরতি দর্শন, আমার ভাগ্যে ঘটিল না। অন্তর্য্যামিনি, পরমেশ্বরি! আমার অন্তর দেখিতেছ,—কি দুঃসহ দুঃখে আজ আমি অভিভূত হইয়াছি! মাগো, আজ আমি কাঁদিব।—আমার কাঁদিবার দিন,—তাই আজ সকলকে লুকাইয়া, এখানে বসিয়া, কাঁদিব। যদি এ ক্রন্দন তোমার চরণে স্থান পায়, তবেই আমার কান্না সার্থক হইবে।—মঙ্গলময়ি, তোমার রাজ্যে এত অমঙ্গল, এত হাহাকার, এত পরপীড়ন কেন? জরা, ব্যাধি, শোক, মৃত্যুতে জীব জর্জ্জরীভূত হয় কেন? জীব-ধর্ম্মে,—ক্ষুৎ-পিপাসায় অন্ধ হইয়া, জীব অন্যের মৃত্যুস্বরূপ নিজ শিব চরণে দলন করে কেন? এ তোমার কি লীলা, লীলাময়ি? হায় মা, এ লীলা সংবরণ

করো! জীবের মোহ-চক্ষু খুলে দাও,—হৃদয়ে প্রেম-ধর্ম্ম ঢেলে দাও,—তার অন্ন-চিন্তা দূর করো,—সে যেন নিশ্চিন্ত-চিত্তে, নির্ভয়ে, তোমার নাম লইতে লইতে, করুণার প্রবাহে, জগৎ-সংসার প্লাবিত করিতে পারে। মা অন্নপূর্ণে! দয়া করিবে না কি? তনয়ার কাতর-ক্রন্দনে বিগলিত হইবে না কি?

"এই দেখ' মা, অভুক্ত মৃত-কপোত আমার দেহে! বাছা আমার আহারান্বেষণে মন্দির-চূড়ায় বসিয়া মরিল! যে ইহাকে মারিল, সেও জঠর-জ্বালায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ইহাকে মারিল।—তার দোষ কি মা? তুই তার আহারের সংস্থান ক'রে দিলে, হয়ত সে ইহাকে মারিত না!—এইরূপ জগতের অনন্তকোটী প্রাণী, অন্নের অন্বেষণে —অন্নের অভাবে মরিতেছে,—পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে বাধ্য হইতেছে। এ আসুরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ প্রবলের প্রতিষ্ঠা, এ ভীষণ জয়-পরাজয়,—কতদিনে ধরা-বক্ষঃ হইতে বিলুপ্ত হইবে, জননি! কতদিনে মা, সর্ব্বজীব সমতা প্রাপ্ত হইবে? কতদিনে এ বসুন্ধরা শান্ত, শীতলা, প্রসন্ন-বদনা—মা, তোমার মত হইবে? এ বিষম রক্তপাত, এ কলহ-সংগ্রাম, এ দ্বেষ-হিংসা-বৈরিতার কি অবসান নাই? জগৎ যে অতি পুরাতন হইয়া আসিল? হায় মা! তুমি ত এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে, বিরাট্ অন্নসত্র খুলিয়া, শান্তির

শীতল ছবি দেখাইতেছ? তবে মা বসুন্ধরা অন্নহীনা হইবেন কেন,—তোমার সন্তান অন্নাভাবে মরিবে ও অন্যকে মারিবে কেন? জননি! প্রসন্না হও,—জীবে কৃপা করো,—ধরার তাপ বিলুপ্ত করো,—তোমার অন্নপূর্ণা-নাম সার্থক হউক!"

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, মায়ের আরতির সঙ্গে সঙ্গে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনয়নে, মৃত কপোত কোলে লইয়া, করুণাময়ী বালিকার এই আত্ম-নিবেদন ও ঐকান্তিকী প্রার্থনা।—দেবতার চরণে কি ইহা স্থান পাইবে না?

মায়ের আরতিও শেষ হইল, আর অতিথিশালা হইতে সুস্বর তান-লয়-সংযোগে, এক সাধক-কণ্ঠ হইতে এই গীতটি ধ্বনিত হইল,—

(পিলু-বারোয়া—ঠুংরি।)

মায়ের কৃপার নাইরে তুলনা।
যে জেনেছে, সেই মজেছে,
জান্‌বে কিরে আর-জনা॥

শিশু না আসিতে ভবে, মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ হ'বে,
যা পিয়ে সে বেঁচে রবে,
করবে মায়ের সাধনা॥

ভুলে' জীব এ সূক্ষ্মকথা, ঘুরে বেড়ায় হেথা সেথা,
পাঁচ ভূতে তার খায় রে মাথা,
(বলে) 'কোথা মা তোর করুণা' ;—

মার চেয়ে করুণা যার, 'ডাইন' খ্যাতি আছে রে তার,
আমি তার ধারিনা ধার,
যে হোক্ সে হোক্ গে না ॥

গৌরী একাগ্রচিত্তে এই গান শুনিল। একবার, দুই-বার, তিনবার শুনিল,—কণ্ঠস্থ করিল,—অথবা আপনা হইতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল,

"এই কথাই ঠিক। মাকে যে পেয়েছে, সে-ই মার করুণা বুঝেছে। কৈ, আমিত মাকে পাই নাই,—তবে তাঁর করুণা বুঝিব কিরূপে? আমার মানস-পদ্ম আজিও প্রস্ফুটিত হয় নাই,—মা বসিবেন কোথায়? তাই মধ্যে মধ্যে মায়ের প্রতি অবিশ্বাস, মায়ের করুণার প্রতি অনাস্থা হয়।—অন্তর্যামিনী করুণাময়ী মা আমার কি অবোধ তনয়াকে শিক্ষা দিবার জন্য, এমন সময়, তাঁর ভক্তের মুখ দিয়া এই গানটি আমায় শুনাইলেন? হ'বেও বা,—মায়ের লীলা সকলই বিচিত্র। আমার মনে কিছু অহমিকা জন্মেছিল,—সেই অহংবুদ্ধি ঘুচাইবার জন্যই বুঝি কৃপা-ময়ী মা আমার, ঠিক যথাসময়ে তাঁর ভক্তের মুখ দিয়া

এই গান আমায় শুনাইলেন।—মাগো, যথেষ্ট হ'য়েছে,—আর লজ্জা দিও না মা;—আর আমি করুণার বড়াই করিব না।"

গৌরী, এবার আপনা হইতে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিল। পরিচারিকাকে বলিল,—"চল ঝি, বাড়ী যাই,—রাত অনেক হ'য়েছে।—পায়রাটা ফেলে দিয়ে যাও।"

সকলে নানা ভাব মনে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

ওদিকে, মৃতকপোত কোলে লইয়া, করুণারূপিণী গৌরী যখন জগজ্জননীকে জগতের ব্যথা জানাইতেছিল, সেই সময় মায়ের আরতি দর্শন করিতে করিতে, আত্মারাম আত্মনিবেদনে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া বলিতেছিলেন,—

"মা বিশ্বেশ্বরি! দাও মা, আমার ভুল ভেঙ্গে দাও,—আমার মোহ-চক্ষু খুলে দাও।—সত্যই আমি আজিও বুঝিতে পারিলাম না,—তুমি কে, আর আমার ভবানী কে? মাগো, আজ তার কচি-মুখে, যে করুণার সজীব শান্ত-মূর্ত্তি দেখিলাম, তাতে আমার বোধ হয় না যে, সে বালিকা সামান্যা। আহা, মৃতকপোত বুকে লইয়া, মা আমার অশ্রুসিক্ত মুখে, অতি করুণকণ্ঠে আমায় বলিল,—"বাবা, আজ আমার অশুচি,—মাকে একথা জানায়ো!"—হায় মা, ত্রিলোকজননি! তুমি জানো, তার মনের ভাব কি!

যা হোক্ মা, মার আমার মনের মানস পূর্ণ করিও। জননি, তোমার পুণ্যময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, আমার সার্থক হ'য়েছে,—আমি জননীরূপিণী করুণাময়ী কন্যা লাভ ক'রেছি।—মা, ভবানী যেন আমার চিরায়ুষ্মতী—ভা-গ্য-ব-তী—রমণী-কুললক্ষ্মী হয়।"

"ভাগ্যবতী"—এই কথাটি উচ্চারণ করিবার সময়, আত্মারামের স্বর যেন কিছু কম্পিত হইল,—তিনি যেন ভয়ে ভয়ে ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, আত্মারাম মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আবার সেই জ্যোতির্ব্বিদের গণনা, গৌরীর জন্ম, মায়ের মহাপূজা ইত্যাকার যাবতীয় ঘটনা,—আত্মারামের স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। সকলই যেন তিনি চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইলেন। একটু বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন,—

"দূর হোক্।—ও বিষয়টা, যত ভাবিবনা মনে করি, ততই যেন উহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়,—সব গোলমাল করিয়া ফেলে। হায় রে, নিয়তি-লিখন! জগদম্বার কাছে প্রার্থনার সময়ও তুমি নিষ্ঠুর মূর্ত্তিতে দেখা দাও? সুচিন্তা ও সদ্ভাবের সময়ও তুমি কণ্ঠে বিরাজ করিতে থাকো?—হায় মা! তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

আরতি অন্তে, পূজক ব্রাহ্মণ, তান্‌পূরা লইয়া মায়ের সম্মুখে গান ধরিলেন,—

(মেঘ – চৌতাল।)

নমামি কালিকে, ঈশানি, অম্বিকে,
রাখ' মা চণ্ডিকে, বিপাকে পায়।
কাতরে কাঁদি মা, কৃপা কর শ্যামা,
রবি-সুত-ভয়ে ঠেকেছি দায়॥

আঁধার গগন, আঁধার জীবন,
আঁধারে খেলিছে বিজলী ভীষণ,
এ আঁধার নাশি' পূর্ণচন্দ্র হাসি,
দেখাও জননি, স্বরূপ-প্রভায়॥

'মাভৈঃ মাভৈঃ' বল্ মা বদনে,
এই যে মা তোরে হেরি হৃদাসনে,
(আর) কারে করি ভয়, কিসেরি বা ভয়,
(ঐ) ভয় পেয়ে ভয় পলায়ে যায়॥

ঘুচিল শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা,
কালী কালী ব'লে ডাক রে ভাই।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
কালী নাম ওরে না যায় বৃথায়॥

গান শুনিতে শুনিতে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, আত্মারাম গৃহাভিমুখীন্ হইলেন।

সেই রাত্রে, শয্যায় জননী-পার্শ্বে শুইয়া, গৌরী স্বপ্ন দেখিল,—যেন মা-অন্নপূর্ণা, শান্ত প্রসন্নবদনে, উজ্জ্বল গৌর-বরণে, দিক্ আলোকিত করিয়া, তাহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৃহে যেন এককালে সহস্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে,—মায়ের রাঙা পা দু'খানিতে যেন সপদ্ম ভ্রমর গুঞ্জরণ করিতেছে,—পদ-নখে যেন কৌমুদী ফুটিয়া বাহির হইতেছে,—সুগন্ধে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে,—মা যেন মৃদু-মন্দ হাসিতেছেন।—গৌরী অকস্মাৎ সেই ভুবন-মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত, পুলকিত, রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল,—ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। তখন মা যেন তাহার মস্তকে পদ্মহস্ত অর্পণ করিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া, বীণাবিনিন্দি মধুরতায়—অতি স্নেহ, অতি কোমল, অতি করুণ-কণ্ঠে তাহাকে বলিলেন;—

"বৎসে, এই দেখ, আমি আসিয়াছি। আমায় তুমি প্রাণের সহিত ডাকিয়াছিলে, তাই আসিয়াছি। এমন ভাবে যে ডাকে, তাকে দেখা না দিয়া আমি থাকিতে পারি না। তুমি পরের ব্যথা নিজের ভাবিয়া, তন্ময়ী হইয়া আমায় ডাকিয়াছিলে, তাই আমি আসিয়াছি।

তোমার আহ্বানরূপ কাতর-ক্রন্দনে, আমার পদ্মাসন টল্‌টল্ কাঁপিয়াছিল,—আমি স্থির থাকিতে পারি নাই,—তাই আসিয়াছি। তোমার মনস্কাম পূর্ণ হোক্,—অন্নদানে তুমি জীবের প্রাণ শীতল করো। শীঘ্রই তোমার সে উচ্চ-ক্ষমতা মিলিবে।

"দেখ, আমি নিজ হস্তে কিছু করি না,—যোগ্যপাত্র পেলে, আমার ইপ্সিত কার্য্যের ভার দিই। অনেক দিন হ'তে যোগ্যপাত্র খুঁজিতেছিলাম,—আজ তোমার মধ্যে তার বীজ দেখ্‌লেম। আশীর্ব্বাদ করি, এই বীজে মহা-বৃক্ষ জন্মিবে, এবং কালে তাহাতে অমৃতময় ফল ফলিবে। বৎসে, জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে, যে করুণার অমৃতাস্বাদ তুমি পাইয়াছ,—সেই করুণাবলেই, একদিন তুমি মহা-মাতৃমূর্ত্তিতে লোকের হৃদয়োপরি অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে। একদিন লোকে, আমার নামের সহিত তোমার নাম গ্রহণ করিবে,—প্রাতঃস্মরণীয়া জননী-অন্নপূর্ণা নামে তুমি অভি-হিত হইবে। জন্মান্তরে তুমি যে দুর্জ্জয় তপস্যা করিয়া-ছিলে, ইহজন্মে তাহার ফল পাইবে।

"কলির জীব—অন্নগত প্রাণ, তা জানি। কিন্তু জীবের সে ভোগ কৈ?—আমি কি করিব?—কি করিতে পারি? যে যেমন ভাগ্য লইয়া আসিয়াছে, সে সেইমত ফল ভোগ করিয়া যাইবে। তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহা পাইবে,—

জীবকে অন্নদান করিতে পারিবে। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তোমার এ ব্রত নিষ্ফল হইবে না।

"তোমার মৃতকপোত কোলে লইয়া রোদন, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কতখানি করুণার উদ্ভব তোমাতে হইতে পারে, তাহা দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তিই তোমায় মানাইবে ভাল। এই মূর্ত্তিতেই আমি তোমায় সিংহাসনে বসাইব।

"কিন্তু মা, অবিশ্বাসিনী হইও না,—আমার বিধানে অনাস্থা করিও না। সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকিও,—সম্পূর্ণরূপে আমাতে নির্ভর করিও,—তোমার পরমা গতি লাভ হইবে।

"এই দেখ বৎসে, তোমার সেই মৃতকপোত,—আর এই দেখ তাহার হন্তারূপী সেই শ্যেন্ পক্ষী!—কিছু বুঝিতেছ কি? দেখ, তোমার কপোতও মরে নাই, শ্যেন্ও ইহাকে মারে নাই,—ইহারা সখ্যভাবে আমার দেহ মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। এই দেখ, অহি-নকুল সমভাবেই আছে,—এখানে আর দুর্ব্বল, প্রবল, অত্যাচার—এ সব কিছু নাই। তোমায় পরীক্ষার জন্য, ক্ষণিক বৈষ্ণবী মায়ায়, আমি এই মায়া-কপোত ও শ্যেন্ সৃজিয়াছিলাম,—সে মায়া অন্তর্হিত,—এখন দিব্যদৃষ্টিতে দেখ, হন্তাও কেহ নাই, হতও কেহ নাই,—আমিই সব।——এ সব তত্ত্ব,

সম্যক্‌রূপে এখন তোমার বুঝিবার সময় হয় নাই,—সময়ে হয়ত কিছু কিছু বুঝিবে।

"এক বিষয়ে, তোমায় বড় দুর্ভাগ্যবতী হইতে হইবে। সাংসারিক সুখ, তোমার অদৃষ্টে বড় বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখের ভাগই তোমার অধিক হইবে। তাহাতে বিচলিত হইও না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না,—কিংবা সামান্য জনার ন্যায় অধীর হইয়া, আপন পায়ে, আপন মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। সংসারে তোমায় সব দিব, কিন্তু একে একে সকলই কাড়িয়া লইব। তোমার কোন বন্ধন রাখিব না,—সংসারের সার-বন্ধনও সময়ে ছিঁড়িয়া দিব। বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, পাছে তুমি লূতা-তন্তুর ন্যায় আপন জালে আপনি জড়াইতে থাকো,—এই জন্য তোমার সকল বন্ধন খসাইব। অতি উচ্চ ভার তোমার মস্তকে অর্পিত; দেবতার কাজ তোমায় করিতে হইবে;—সুতরাং সাধারণ মানব মানবীর ন্যায় সুখ দুঃখে জড়িত হইলে, তোমার চলিবে না। বৎসে! প্রস্তুত হও,—হৃদয়-মন সংযত করিতে শিখ। এক দিন তোমায় অতি কঠোর পরীক্ষা দিতে হইবে। একাধারে তুমি কুসুমকোমলা ও বজ্রকঠিনা হইতে অভ্যাস করো,—অতি উচ্চতর ভার তোমাতে অর্পিত। শেষ পর্য্যন্ত তোমায় বুঝিতে হইবে;—কিন্তু সর্ব্বসময়েই তোমার করুণার জয়। সে করুণা,—

অলৌকিক, অপার্থিব, ও নিষ্কাম। মানব, চিরদিন সে করুণার পূজা করিবে। লোকে প্রাতঃ-সন্ধ্যায় তোমার নাম গ্রহণ করিবে।

"শেষ কথাঃ—বৎসে, তিনটি পরমবস্তু তুমি জীবনের প্রিয়তর করিবে। সেই তিনটি,—তোমার অপরাজিতা করুণার চির-সহায় ও মুক্তি-পথের প্রধান আশ্রয় হইবে। **শিবপূজা, গঙ্গাস্নান ও সাধুদর্শন**,—এই তিন মহা-বস্তুর কথা আমি তোমায় বলিতেছি। এখন হইতে যতটুকু পারো, ইহার অনুষ্ঠান করো,—উত্তর-জীবনে ইহাই তোমার সম্বল ও সান্ত্বনার বিষয় হইবে। যখন আবশ্যক বুঝিব, তোমায় দেখা দিব।"

জননী অন্তর্হিতা হইলেন,—গৌরীর সোনার স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিত হইয়া বালিকা বলিয়া উঠিল,—"মা, মা, তবে আবার দেখা দিবে?"

বহুক্ষণ অবধি বালিকা ভাববিহ্বলা হইয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রির অবসান হইয়া আসিল। উষার কনক-রশ্মি গবাক্ষ-পথ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

সেই শান্ত স্নিগ্ধ মধুর উষায়, গৌরী শুনিতে পাইল,—অন্নপূর্ণার মন্দির সন্নিহিত অতিথিশালা হইতে, সেই সাধক, গত সন্ধ্যার সেই সম্মোহন স্বরে, ধীর-মধুর-কণ্ঠে, আপন মনে গাহিতেছেন,——

(সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।)

মার ভাবনা মায়ে ভাবে, তুমি আমি কি কর্‌তে পারি।
মা যে কাঁদায়—কাঁদি, হাসায়—হাসি,
কলের কাজ যেন কলে সারি॥

(মন) ভুলোনা রে, অহঙ্কারে,
'আমি করি'—ভেবোনা রে,
করান্ তিনি, ব্রহ্মময়ী,
(তাই) কখন্ জিতি, কখন্ হারি॥

হারা জেতা কান্না হাসি,
সর্ব্বঘটে সেই সর্ব্বনাশী,—
প্রাণ কাড়ে, কখন্ বাজিয়ে বাঁশী,—
কালী কালা চিন্‌তে নারি॥
মার ভাবনা মায়ে ভাবে, তুমি আমি কি কর্‌তে পারি॥

গান শুনিতে শুনিতে, রোমাঞ্চিত কলেবরে গৌরী গাত্রোত্থান করিল। আপন মনে বলিল, "কি মধুর গান! এ গানও কি আমায় উদ্দেশ করিয়া গীত হইল? সত্য,—মার ভাবনা মা-ই ভাবেন;—আমরা ভাবিয়া তার কি করিতে পারি?—অন্ধকার মাত্র দেখা সার হয়।—কে, এ গায়ক? এ গায়ককে দেখিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

আত্মারামের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা,—এক অপরূপ দৃশ্য। দেশ দেশান্তর আগত শত শত সাধু-সন্ন্যাসী, বৈরাগী ভিক্ষুক, পর্য্যটক পথিক—তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে,—সমাদরে ও শ্রদ্ধা সহকারে তথায় থাকিতে পায়। গৃহস্বামীর সুবন্দোবস্ত গুণে, কাহারও কোনরূপ কষ্ট হয় না। মহামায়া অন্নপূর্ণার ভোগ ত প্রচুর পরিমাণেই আছে; তদ্ব্যতীত কেহ ইচ্ছা করিলে এবং কাহারও আবশ্যক হইলে, ভাণ্ডার হইতে তাঁহার যথোচিত সিধা প্রদত্ত হয়,—কাহারও বা তৈয়ারী জলযোগাদিরও সবিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এজন্য পাচক ও কর্ম্মচারীতে দশজন লোক নিযুক্ত আছে। স্বয়ং আত্মারামও মধ্যে মধ্যে ইহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। অতিথি-

ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ পীড়িত বা অসুস্থ হইলে, তাহারও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। তজ্জন্য ঔষধ, পথ্য বা সেবা-সুশ্রূষার কোন অভাব হয় না,—নির্দ্দিষ্ট লোকজনের প্রতি এই নির্দ্দিষ্ট-ভার অর্পিত আছে। বিস্তৃত অতিথি-শালার এক প্রান্তে,—পীড়িত অতিথিগণের জন্য পরিস্কৃত গৃহ সকল নির্দ্দিষ্ট থাকে,—রোগীগণ যথানিয়মে তথায় থাকিতে পায়। এইরূপ অপূর্ব্ব আতিথ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান,—তখনকার লোকে পরম পুণ্যকর ও গৃহীর অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিত। আত্মারামের এই অপূর্ব্ব অতিথি-সেবা-ব্রত, তাঁহার মহান্ ধর্ম্মজীবনের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যময় ধর্ম্মশালায়, বালিকা গৌরী সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত,—যাতায়াত করিতে ভাল বাসিত। তথায় প্রতিদিন সে, কত নূতন নূতন লোক দেখিত,—কত লোকের কতপ্রকার কার্য্যাবলী, ভাবভঙ্গী, ও আচার-ব্যবহার মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিত,—কত লোকের কত রকমের কথাবার্ত্তা ও ধর্ম্মমতের বাক্-বিতণ্ডা শুনিত। কোথাও দেখিত,—গায়ে ভস্মমাখা অর্দ্ধ-উলঙ্গ জটাজুটধারী কোন সন্ন্যাসী চুলী জ্বালিয়া হোম করিতেছেন; কোথাও দেখিত,—গৈরিক-বসন-পরিহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মাসীন কোন সাধু মুদিত-

নেত্রে ধ্যানমগ্ন আছেন; কোথাও অবলোকন করিত,—হস্তে ত্রিশূল, গলে রুদ্রাক্ষ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক কোন শাক্ত—রক্তবস্ত্রে আবৃত হইয়া, গম্ভীরস্বরে 'মা মা' 'তারা তারা' ধ্বনি করিতে করিতে, ভাববিভোর হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ বালিকা কোথাও বা দেখিতে পাইত,—মুণ্ডিত কেশ ও প্রকৃত সাধুজনোচিত আড়ম্বর-হীন বেশধারী কোন মধুরাকৃতি শান্তপ্রকৃতি বৈষ্ণব—একপার্শ্বে জড়সড় ও সঙ্কুচিত হইয়া, কুশাসনে বসিয়া, নীরবে মধুসূদন নাম জপ করিতেছেন; কেহ বা স্নানান্তে পবিত্র হইয়া আপন মনে তুলটস্থ পুঁথি হইতে 'ভাগবত' পাঠে তন্ময় আছেন। আবার কোথাও বা দেখিত, একদল ভিখারী কীর্ত্তনীয়া,—নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠী, মাথায় টিকি,—খঞ্জনী সহযোগে, সমস্বরে, 'হরেকৃষ্ণ' নাম গাহিয়া,—লোক জড় করিতেছে। কোথাও কেবলই তামাক, দোক্তা, এবং আরও কিছু মুহুর্মুহু পুড়িতেছে। সে সুবাস কাহারও কাহারও বড় আরামদায়ক ও তৃপ্তিপ্রদ হইতেছে,—আর কেহ কেহ বা, সে মধুর মোলায়েম্ গন্ধ সহিতে না পারিয়া, নাকে কাপড় দিয়া, দশ হাত অন্তরে সরিয়া বসিতেছে। কোথাও বা কেবলই খোস-গল্প; কোথাও 'কালী বড় কি কৃষ্ণ বড়' এই তর্ক; কোথাও কথার হের-ফেরে নানারূপ বাক্‌যুদ্ধ;

আর কোথাও গৃহস্বামী-প্রদত্ত ভোজ্যবস্তুর সমালোচনা,—ধীর-মন্থর গতিতে চলিতেছে ;—বালিকা এই সমস্ত দেখিত ও শুনিত। এইরূপ শত প্রকারের শতরূপ ভাবাভিনয় দেখিয়া ও শুনিয়া,—ভক্ত অভক্ত, সাধু ভণ্ড, বিষয়ী বৈরাগীর সমান সম্মিলন—পর্য্যবেক্ষণ করিয়া,—বালিকার মনে নানা চিন্তার উদ্ভব হইত। বালিকা ভাবিত,—

"এ কত মানুষ,—কতরকম প্রকৃতি! এক মানুষের সহিত আর এক মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই,—আকৃতিতেও নাই, প্রকৃতিতেও নাই! বৈষম্যই যেন জগতের ধর্ম্ম। অথচ, সকলেই এক লক্ষ্যে ছুটিতেছে। জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, সকলেই মিলন-পথে ধাবিত হইতেছে। এ মিলন-পথ কোথায়?—সেই জগৎ-কর্ত্তা, শ্রীহরির শ্রীচরণ। মায়ার জীব আহারান্বেষণেই ব্যতিব্যস্ত ; ভাবিবার অবসর পায় কৈ? নহিলে, ভাবিতে পারিলে, সকলেই ভগবদ্ভক্ত হইতে পারিত। হায়, কি করিলে জীবের এই আহারান্বেষণ-চেষ্টা দূর হয়?"

অতিথিশালার মধ্যাহ্নকালীন দৃশ্যও অতি অপূর্ব্ব। দেশ দেশান্তর আগত নানাশ্রেণীর ভিক্ষুক——স্ত্রী ও পুরুষ এবং বালক ও বৃদ্ধ,—সারি গাঁথিয়া আহারে উপবিষ্ট। পরিতোষ পূর্ব্বক তাহারা ভোজনে ব্যাপৃত। গৌরী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র, সকলে সমস্বরে "জয়

মা অন্নপূর্ণার জয়” বলিয়া উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিত। সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, বালিকার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইত ও চক্ষে জল আসিত। বালিকা মনে মনে বলিত,—“হায় মা, পরমেশ্বরি! তোমার অন্নের মহিমা এত? মাগো, আমি কি তোমার এ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিব? জননি, তোমার ধর্ম্ম তুমিই রাখিও।”

অন্নপূর্ণার ভোগ, সর্ব্বজীবে সমান শ্রদ্ধাসহকারে বিতরিত। পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গও সে ভোগে বঞ্চিত হয় না। করুণারূপিণী গৌরী, স্বয়ং দাঁড়াইয়া, নিজ হস্তে এই শেষোক্ত জীবগণকে আহার দিয়া থাকে। ইহাদিগকে স্বহস্তে আহার দিতে, বালিকার বড় আনন্দ হয়। আর ইহারাও গৌরী-প্রদত্ত আহারে যেমন পরিতুষ্ট হয়, অন্য কেহ তাহা বণ্টন করিয়া দিলে, সেরূপ হয় না। গৌরী তাহার সেই কনক-হস্তে অন্নের থালা লইয়া দাঁড়াইবামাত্র, কোথা হইতে নানা শ্রেণীর সহস্র সহস্র পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখে লুটোপুটি হইতে থাকিত; —আদরে, সোহাগে, অনুরাগে, তাহার হাত হইতেই তাহা গ্রহণ করিতে থাকিত;—কিচিমিচি রবে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া,—এ উহার ঘাড়ে, সে তাহার ঘাড়ে পড়িয়া উৎসাহভরে গ্রহণ করিত;—বালিকাকে আর বণ্টন করিবার অবসর দিত না। সে সময় যদি কোন পরিচারক

আসিয়া সেখানে দাঁড়াইত, তাহা হইলে, পক্ষীদিগের সে আনন্দ-কোলাহল, সহসা যেন কেমন মন্দীভূত হইয়া যাইত,—তাহারা যেন মানস-নেত্রে ভয় ও আতঙ্কের ছায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িত,—তাহাদের সেই স্বভাবসুন্দর অনুরাগোৎফুল্ল মূর্ত্তি সহসা যেন কেমন ম্লান ও মলিন হইয়া যাইত। এ দৃশ্য আত্মারাম এক একদিন লক্ষ্য করিতেন,—কি ভাবিয়া তিনিও এক এক দিন কন্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতেন,—তাহাতেও পক্ষিগণ ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হইত। তখন আত্মারাম মনে মনে বলিতেন,——

"এ আর কিছু নয়,—অপার্থিব করুণার অভাব উপলব্ধি করিয়া, পাখীর দল এমন ভাব প্রাপ্ত হয়। ভবানীর ন্যায় আমাদের প্রাণে সে অপার্থিব করুণা কৈ? আমাদের প্রাণে দ্বেষ আছে, হিংসা আছে, স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে,—মার প্রাণে যে কেবলই অমৃত-নিস্যন্দিনী করুণার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত! হায় মা, করুণারূপিণি! তোমারই জয় হউক! তুমিই জীবকে করুণার মহাব্রত শিক্ষা দাও।"

অতিথিশালার যে প্রান্তে বিদেশী, অসহায়, নিরাশ্রয় রোগীদিগের বিশ্রামাগার আছে, করুণারূপিণী গৌরী, সেখানেও মূর্ত্তিমতী আশার ন্যায়, মুখে সান্ত্বনা ও নয়নে অমৃতধারা লইয়া দাঁড়াইত। সঙ্গে সঙ্গিনী শিবানীও থাকিত। বালিকার সেই মধুবর্ষিণী কথায়, সেই সহানু-

ভূতি-সূচক সজল করুণদৃষ্টিতে যেন রোগীর অর্দ্ধেক রোগ-যন্ত্রণা বিদূরিত হইত। কাহারও অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইয়া, কাহারও মুখে জল দিয়া, কোন রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া, কাহারও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া,—বালিকা স্নেহময়ী জননীরূপিণী ধাত্রীর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। 'কেমন আছ', 'কি চাই', 'কি কষ্ট হ'চ্ছে' প্রত্যেক রোগীর শিয়রে বসিয়া, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, মধুমাখা কণ্ঠে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিত। সে সহানুভূতিশীতল সান্ত্বনা-বাণী ও সে আন্তরিকতাপূর্ণ নিঃস্বার্থ সেবা-সুশ্রূষায়, রোগী রোগ-শয্যায় পড়িয়াও, সজলনয়নে, রুদ্ধকণ্ঠে করুণা-রূপিণী বালিকার কল্যাণকামনা করিত। ফলতঃ গৌরী যখন তাহার সেই কনক-কিরণমণ্ডিত, লাবণ্যতরঙ্গায়িত সুকুমার দেহলতা লইয়া,—মুখে পবিত্রতার বিমল ভাতি বিকীর্ণ করিতে করিতে, স্বভাবসজল চক্ষে করুণার স্নিগ্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, এবং যখন সেই পরদুঃখকাতরা দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়া, রোগী বিগলিত অন্তরে মা মা বলিতে বলিতে, মুদিত নয়নে সেই মহামাতৃরূপিণী মহামায়ার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকিত, তখন বোধ হইত, যেন আর্ত্তের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, সত্য সত্যই জননী অভয়া মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূতা।—এক হস্তে বর ও অন্যহস্তে অভয়দান করিয়া, যেন তিনি ভয়ার্ত্ত সন্তানকে সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রাণাধিকা

কন্যার এই মহামাতৃভাবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সহস্র সহস্র জীবের অন্তরের সহিত কন্যার অন্তর বিজড়িত দেখিয়া, আত্মারাম পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবর হইতেন। ভাবিতেন,—"ইহারই নাম ভগবৎ-প্রেম।—এই-ই বিশ্ব-প্রসারিণী স্নেহ! এ হেন কন্যার জন্মদাতা জনক হওয়া পরম শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। এই আতুরাশ্রমে, ভবানী সত্যই যেন সেই সর্ব্বদুঃখহরা—ভবভয়-হারিণী—ভবানী!—ঐ দেখ না, কি মধুর মনোহর দৃশ্য!"

অদূরে এক রোগ-শয্যায় শুইয়া এক দুর্ভাগা, রোগ-যন্ত্রণায় পরিত্রাহিকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে,—জনপ্রাণী তাহার কাছে ঘেঁসিতে সাহসী হইতেছে না,—পরদুঃখ-কাতরা সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা অম্লানবদনে তাহার শিয়রে গিয়া বসিল। সেখানে বসিয়া বালিকার বদন-কমল যেন অধিকতর প্রফুল্ল হইল। পরার্থপর হৃদয়, যে কোন প্রকারে হউক, পরের উপকার করিতে পারিলেই যেন প্রফুল্ল হয়,—আপনাকে সার্থকজন্মা বোধ করে। বালিকা গৌরী গিয়া সেই দুর্ভাগা রোগীর শিয়রে বসিল, আর সেই রোগী যেন প্রাণ পাইল। কে যেন সহসা, তাহার তাপদগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে লাগিল। দুর্ভাগার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার কাতর-ক্রন্দনে করুণার্দ্রা হইয়া, বিমান-পথ-বিহারিণী কোন দেবী, সুধাপূর্ণ হেম-ঝারি হস্তে

লইয়া, বরাভয়দায়িনী মূৰ্ত্তিতে তাহার শিয়রে সমুপস্থিত হইয়াছেন, আর ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে সেই সুধা সিঞ্চন করিতেছেন!

দুর্ভাগা, ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত। সর্ব্বাঙ্গে স্ফোটক-তুল্য বসন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; তাহার জ্বালাময় উত্তাপে অঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে; পিপাসায় কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইয়াছে; শয্যাকণ্টকী বিকারের রোগীর ন্যায়, দুর্ভাগা শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। জীবন যায়-যায়, হায়! তবু জীবন যাইতেছে না;—যন্ত্রণা দেখিয়া বুঝি পাষাণও বিদীর্ণ হয়,—তথাপি প্রাণভয়ে জনপ্রাণী তাহার কাছে ঘেঁসিতেছে না। এমনি অবস্থায়, অনাথের দৈব-সখার ন্যায়, দয়ার্দ্রহৃদয়া বালিকা গৌরী, রোগীর শিয়রে গিয়া বসিল। নির্ব্বিকারা, ঘৃণাভয়-রহিতা, স্নেহ-বিগলিতা হইয়া,—বসিল। প্রাণাধিক সন্তানের বিষম রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া, জননী যে ভাবে গিয়া রোগ-শয্যায় বসেন, সেই ভাবে গিয়া বসিল। আত্মপ্রাণ তুচ্ছবোধ করিয়া, অথবা সেই দুর্ভাগাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্ম-উপলব্ধি করিয়া, অকৃত্রিম স্নেহের আকর্ষণে, মহামাতৃমূর্ত্তিতে তথায় গিয়া বসিল। সেই পুণ্যময়ী মধুর মূর্ত্তি দেখিয়াই, রোগীর সর্ব্বশরীর পুলকে পূর্ণ হইল, চোখে জল আসিল,—আবার তাহার বাঁচিতে সাধ যাইল। এত যে রোগ-যন্ত্রণা, এত যে আপন অদৃষ্টে

ধিক্কার, এত যে মুহুর্মুহু মৃত্যু-কামনা,—বালিকা গৌরীর দর্শনে, তাহার সে সকলই বিদূরিত হইল। অভাগা সজল-নয়নে, যুক্তকরে গৌরীর পানে চাহিল,—গৌরী স্নেহাশ্রু-পূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে তাহার হাত দু'খানি ধরিল,—মধুবর্ষিণী অমৃতশীতল কণ্ঠে—"ভয় নাই বাছা" বলিয়া তাহার গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিল।

আর কোথায় সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় গাত্রদাহ,—কোথায় সেই মরণাধিক রোগ-যন্ত্রণা,—আর কোথায় সেই প্রাণঘাতী চীৎকার ও শয্যাকণ্টকী ছটফট অবস্থা! যেন স্বয়ং দেবী শীতলা, ধন্বন্তরীর অমৃত-কলস হইতে সঞ্জীবনী-সুধা লইয়া, দুর্ভাগার অঙ্গে সিঞ্চন করিলেন,—তার পর পদ্মহস্তে ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গ বুলাইতে লাগিলেন! সে অমৃত-শীতল করপদ্ম-সঞ্চালন-গুণে, রোগী রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল;—ভক্তি-বিমিশ্রিত আবেগময় 'মা-মা' রবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া, গৌরীর পাদতলে লুটাইয়া পড়িল।

বালিকা গৌরী ত্রস্তভাবে—ঝটিতি তথা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর রোগীর পার্শ্বে বসিয়া, সস্নেহে তাহার মস্তক আপন ক্রোড়ে লইয়া, ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল!

অদূরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া, ভাববিভোর আত্মারাম

এই নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহার অপাঙ্গ বহিয়া ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়িতেছিল।

এমন সময় সেই সঙ্গীতপ্রাণ সাধক,—'মা'-নাম-গানে যিনি অতিথিশালা পুলকপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন,—সেই সাধক,—স্মিতমুখে একটি গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। সে বেশে তাঁহার সেই সৌম্য-শান্ত-পবিত্র মূর্ত্তি বড় সুন্দর মানাইয়াছে। গৌরী এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া যেন কিছু বিস্মিত, পুলকিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল। মনে মনে বলিল, "এই—সেই। হাঁ, নিশ্চয়ই সেই। ইহাঁর চরণে শরণ লইতে হইবে।"——"কিন্তু ইহাঁকে যেন আর কোথাও দেখিয়াছি;"——"না, দেখিয়াছি কৈ?—এ পুণ্যমূর্ত্তি যেন আমার জন্ম জন্ম পরিচিত,—চির-বাঞ্ছিত";—"এ সন্ন্যাসী যেন আপন হ'তেও আপনার"—এই রকম একটা ভাব গৌরীর মনে উদয় হইতে লাগিল। বালিকা নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল।—ক্রোড়দেশে সেই বসন্ত-রোগী;—পার্শ্বে রোগীর সেবার উপকরণাদি লইয়া সঙ্গিনী শিবানী;—ইতস্ততঃ দাঁড়াইয়া কৌতূহলাক্রান্ত দুই চারিজন দর্শক;—সর্ব্বচক্ষুর দৃষ্টিভেদ করিয়া একরূপ অলৌকিক মধুর দৃষ্টিতে গৌরী সন্ন্যাসীর পানে চাহিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু যে ভাবে ধর্ম্মাত্মা

সাধুর পানে চান, সেই ভাবে চাহিল। সেই নীরব চাহনিতে যেন কত কথাই প্রকাশ পাইল,—কত অব্যক্ত ভাবই যেন তাহাতে পরিব্যক্ত হইল। তখন সেই অন্তর্দর্শী সন্ন্যাসী, স্মিতমুখে, এক গানেতেই যেন সকল কথার উত্তরদিলেন। তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

(খাম্বাজ—একতালা।)

ভুলি নাই মাগো, তোমারি চরণ,
জন্ম জন্ম তুমি অনাথ-শরণ,
তোমারি লাগিয়া ভ্রমি অনুক্ষণ,
কানন কান্তার নগর গিরি।

অন্নপূর্ণা-ধামে তুমি মা অন্নদা,
অন্ন দিবে জীবে—যাবে ভব-ক্ষুধা,
হাসিবে ধরণী, পান ক'রে সুধা,—
এ আশায় মাগো, জীবন ধরি।

কতদিনে আশা পূরিবে জননি!
কবে বা সে শোভা হেরিবে অবনী,
নিত্য স্মরি আমি সেই দৈব-বাণী,
—গোনা-দিন মোর—ফুরায়ে যায়।

ত্বরা ক'রে এস' ওমা শিব-রাণী,
ওই শুন কাঁদে অনন্ত পরাণী,
দাও ভালবাসা, বুক-ভরা আশা,
আশাতেই তারা বাঁচিতে চায়।

কেউ নাই যার, তুমি আছ তার,
তব মুখ চেয়ে আছে মা সংসার,
কে শোধিবে তব করুণার ধার,
করুণারূপিণি! তাই ভেবে মরি।

আর কত কাল কত জন্ম যাবে,
মিছে ঘুরে ফিরে বহুরূপী-সাজে,
ও রাঙ্গা চরণ হৃদয়ে রাজিবে,
কবে মা ছিঁড়িবে করম-ডুরি।

খেলাতে এনু মা, সাধ ক'রে হেথা,—
চোখে আসে জল, ভাবিলে সে কথা,
ললাট-লিখন কে করে অন্যথা,—
তবু মা দেখিব, পারি কি হারি।

বুকে দাও বল, জীবনে বিশ্বাস,
হৃদয়-মাঝারে হও মা প্রকাশ,
তোমারি কৃপায় তোমারি এ দাস,
শ্রীপদে বাঁধিবে জীবন-তরি॥

গান গাহিতে গাহিতে, সন্ন্যাসীরও মুখের নানা ভাবান্তর হইতে লাগিল, নিবিষ্টচিত্তা গৌরীও সে গান শুনিয়া, কি জানি কেন, মনে নানা ভাঙ্গাগড়ার কল্পনা করিতে লাগিল। সঙ্গিনী শিবানী, একবার এক-দৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছে, আর বার স্থিরনেত্রে গৌরীকে অবলোকন করিতেছে। গান গাহিতে গাহিতে, সন্ন্যাসী কখন হাসিল, কখন কাঁদিল, কখন যুক্তকরে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল,—আর কখন বা গৌরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া, অঞ্জলি পাতিয়া, কি ভিক্ষা করিল। বালিকা গৌরী, যেন কিছু না বুঝিয়াও, সকলই বুঝিল। কি বুঝিল, তা সে-ই জানিল,—কাহাকে কিছু বলিল না।

গান সমাপ্ত হইলে, গৌরী ছল-ছল চক্ষে, গদগদকণ্ঠে সন্ন্যাসীকে কহিল,—"বাবা, এতদিন পরে কন্যাকে মনে প'ড়েছে ?"

সন্ন্যাসী—সেই সদানন্দ দিব্য-পুরুষ,—দিব্য এক উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া, আধা হিন্দি—আধা বাঙ্গালাতে বলিলেন—"আরে মায়ি! আমিই তো তোর ল্যাড়্‌কা হ্যায়। আমাকে তো তুই এতদিন খোঁজ লহিস নে মায়ি!"

সেইরূপ দিব্য উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে, সন্ন্যাসী সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন।

গৌরী এবার সেই রোগীর শিয়র দেশ হইতে উত্থিত হইয়া,— যেন একটু আগ্ বাড়াইয়া, ব্যাকুলভরে উচ্চৈঃস্বরে সন্ন্যাসীর উদ্দেশে কহিল,—"বাবা, বাবা, আর কি দেখা হবে না?"

শূন্যে—বায়ুমণ্ডলে যেন তাহার প্রতিধ্বনি হইল,—"হইবে।"

আত্মারামের আর নূতন বিস্ময় বা কৌতূহল কিছু নাই। কন্যার জন্মকাল হইতে, তিনি অনেক বিস্ময় ও কৌতূহল আয়ত্ত করিয়া আসিতেছেন,—আজিও করিলেন। বুঝিলেন কন্যার জীবনের সহিত দেবতাদের লীলা বা প্রচ্ছন্ন কার্য্যকলাপ জড়িত আছে; সে লীলা বা সে প্রচ্ছন্ন কার্য্যকলাপ বুঝিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। দেখিয়া শুনিয়া, সাধ করিয়া, এখন তিনি এ বিড়ম্বনা-ভোগ, বড় একটা করিতে যাইতেন না;—আজিও করিতে যাইলেন না। মনে মনে তারা-নাম জপ করিতে করিতে তিনি গৃহে ফিরিলেন।

ওদিকে গৌরীও, তাহার মৃতকল্প রোগীকে সুস্থির করিয়া, সঙ্গিনাসহ, প্রফুল্ল-অন্তরে গৃহে ফিরিল।

অন্নপূর্ণার মন্দিরে, ধীর তালে, নহবৎ বাজিল;—

"ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর-উপকার সে লাভ।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ শৈশব-খেলা খেলিতে খেলিতে, অপরূপ বালিকার সাত বৎসর কাটিয়া গেল,—গৌরী অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিল। 'অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী'— আট বৎসরের কন্যাদান—গৌরীদানের সমতুল্য। সুতরাং সে কালের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-পরিবারের আট বৎসরের কুমারী কন্যা,—অনূঢ়া থাকিবার নহে। আত্মারাম, কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়জন্য ঘটক নিযুক্ত করিলেন। ঘটকদল নানাস্থানে ঘুরিয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রূপে গুণে, ধনে মানে, কুলে শীলে সর্ব্বাংশে করণীয় হয়,—অবশ্য এইরূপ স্থলেই পাত্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। ধনবান্ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা,—রূপবতী, গুণবতী ও সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা

প্রিয়তমা কন্যা;—সুতরাং তদনুযায়ী ঘর ও বরের চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানফলে পাত্র মিলিল,—উপযুক্ত ও সর্ব্বাংশে করণীয়—এমন পাত্র মিলিল;—নাটোরের সম্ভ্রান্ত রাজ-পরিবারে এই সম্বন্ধ নির্ণীত হইল। নাটোর রাজবংশের আদি রাজা—রামজীবন রায়ের দত্তকপুত্রের সহিত এই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। এই দত্তকপুত্রের নাম—রামকান্ত। রামকান্ত রূপেগুণে আত্মারাম-দুহিতার যোগ্য বর।

উভয়পক্ষের দেখা শুনা ও কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গেল। লগ্নপত্র ও পাকা-দেখার দিন, পাত্র-পক্ষে স্বয়ং রাজা রামজীবন আসিয়া কন্যা দেখিলেন। লোক-মুখে তিনি যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহাপেক্ষা বরং বেশী দেখিলেন।—ভাবী পুত্রবধূর অপরূপ রূপ ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"এ কি সত্যই আত্মারাম-দুহিতা, না ছদ্মবেশিনী কোন দেব-কন্যা? আমার দৃষ্টিভ্রম হইতেছে না ত?—মা আমার! তোমার মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে, তুমি মানবী! বুঝিলাম, তুমিই নাটোরের রাজলক্ষ্মী হইয়া, ইষ্টদেবীর ন্যায় প্রজাপুঞ্জের পূজা পাইবে। সার্থক তোমার রত্নগর্ভা জননী!—এ মেয়ের আর কোষ্ঠী দেখিব কি?"

নাটোরাধিপতি মহারাজ রামজীবনের সহিত অমাত্য-

কর্ম্মচারী, লোক-নস্কর অনেক আসিয়াছিল; তন্মধ্যে দয়ারাম রায় নামে মহারাজের এক অতি বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান্ কার্য্যকুশল কর্ম্মচারীও ছিলেন। দয়ারামকে লক্ষ্য করিয়া রামজীবন জনান্তিকে বলিলেন,—"এ মেয়ের আর কোষ্ঠী দেখিব কি? মেয়ের কোষ্ঠী দেখিতে পাও নাই বলিয়া তুমি অনুযোগ করিতেছিলে;—তা এমন সর্ব্বসুলক্ষণা, অপূর্ব্ব রাজশ্রী-চিহ্নিতা কন্যার কোষ্ঠী-ফল পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

দয়ারাম। (জনান্তিকে) তবু মহারাজ, পূর্ব্বাপর যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, তাহা 'নয়' করিলে, মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগে।

রামজীবন। না, না, এমন সন্দেহ মনে স্থান দিতে নাই। দেখিতেছ না, অমন দেবীদুর্ল্লভ রূপ, অমন মনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অমন করুণাপূর্ণ অপরূপ মুখচ্ছবি—এমন মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে কোনরূপ অমঙ্গলের ছায়াও পড়িতে পারে না।

দয়ারাম। তাই হউক, মহারাজ! মাকে যেন নির্ব্বিঘ্নে গৃহে লইয়া গিয়া, ভাই রামকান্তের বামে বসাইয়া, নাটোর-রাজগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীজ্ঞানে, যেন আমরা পূজা করিতে পারি।—জয় মা শঙ্করি! যেন এই সজীব প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে, এ রাজভৃত্যের আয়ুঃশেষ হয়।

রামজীবন অগণিত মণিমুক্তা-কাঞ্চন-মুদ্রা সহ ধান-দূর্ব্বাদলে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজ-পুরোহিত সঙ্গে আসিয়াছিলেন;—তিনিও ভাবী রাজ-লক্ষ্মীকে স্বস্তি-বচনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের পাকা কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। যথারীতি লগ্নপত্রও লিখিত হইল। লগ্নপত্রের লিখন-কার্য্য দয়ারামই সম্পন্ন করিলেন। শুভদিনে, শুভক্ষণে, মহাসমারোহে, এই উদ্বাহ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবে।

এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল। গৌরীর খেলা-ধূলার সহচরী—ছায়ার ন্যায় চিরসঙ্গিনী শিবানীকে দেখিয়া, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, রাজপুরোহিত, বালিকা শিবানীকে আপন পুত্রবধূ করিতে মনস্থ করিলেন।

এ প্রস্তাবে, স্বয়ং রাজা রামজীবন সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার অনুচর-সহচরবৃন্দও হৃষ্টচিত্তে উৎসাহভরে ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন;—অপরপক্ষে আত্মারাম চৌধুরী ও তাঁহার কুল-পুরোহিত—শিবানীর পিতাও এ প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলেন।—কাহারো কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না। একই দিনে একই লগ্নে,—দুই শৈশব-সঙ্গিনী, দুই সুযোগ্য পাত্রে সমর্পিতা হইয়া, মনের সুখে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবে,—ইহার বাড়া, আত্মীয়-স্বজনের আর শুভাকাঙ্ক্ষা কি?

কারণ-কার্য্য-কাল—তিনের সংঘটন হইল। অদৃষ্ট অলক্ষ্যে থাকিয়া, আপন চক্রে বসিয়া, ঘুরিতে লাগিল। এ ঘূর্ণনের ফল কি, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন।

রাজ-কুলের সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, কন্যাকুল হইতে কন্যা আনাইয়া, আপন অধিকারে বসিয়া, সেই কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেওয়া, তদানীন্তন রাজাদিগের রীতি ছিল। এ ক্ষেত্রেও সেই কথা উত্থাপিত হইল। দয়ারাম প্রভৃতি রাজপক্ষীয় সকলেই এই কথার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। দৃঢ়চিত্ত আত্মারাম কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। ধনে মানে বংশ-মর্য্যাদায় তিনিও ছাতিন-গাঁ অঞ্চলে কম নন। কিন্তু মনের এ ভাব মনে রাখিয়া, বিনীত ভাবে—অথচ স্পষ্টবাক্যে, তিনি ভাবী বৈবাহিককে জানাইলেন,—

"মহারাজ! আমার এই একমাত্র স্নেহপুত্তলি কন্যা;—দ্বিতীয় সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই;—সুতরাং এমন কন্যার বিবাহ—আমার পুর-মহিলা ও প্রজামণ্ডলী দেখিতে পাইবে না,—ইহা হইতেই পারে না। বিশেষ সকলেই আশা করিয়া আছে যে, এই বিবাহোৎসবে যোগদান করিয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিবে। আমিও কন্যার জন্মকাল হইতে দিন গণনা করিয়া আসিতেছি যে, কন্যার বিবাহ-সময়ে অমুক করিব,—অমুককে অমুক দিব,—ছাতিন

গাঁর অমুক স্থানে অমুক উৎসব হইবে; মহারাজ! ক্ষমা করিবেন, রাজকুলে কন্যাদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া, আমি এত লোকের এত সাধ, এত আহ্লাদ, এত আশা ভঙ্গ করিতে পারিব না,—আমার মনও ইহাতে প্রবোধ মানিবে না।"

রামজীবন দেখিলেন, এক্ষেত্রে আর বাদ-প্রতিবাদ করা বৃথা,—আত্মারাম দ্বিতীয় কথার লোক নন।

দয়ারাম বুঝিলেন, এমন স্থানে তাঁহার বুদ্ধির মাপ্‌কাটী বড় একটা কিছু করিতে পারিবে না,—কেননা, আত্মারাম স্বাবলম্বী—পরমুখাপেক্ষী নহেন,—সুতরাং দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী;—তাঁহার কথার ঝাঁজেই তাহা বুঝা গিয়াছে।

তথাপি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি দয়ারাম একেবারে হটিলেন না;—অভাবপক্ষে, প্রভুর কিছু ভূমিলাভ হয়, এবং তৎসঙ্গে প্রকারান্তরে প্রভুর মর্য্যাদাও রক্ষা পায়,—মনের মধ্যে এই হিসাব করিয়া, তিনি আত্মারামকে বলিলেন,—

"তা চৌধুরী মহাশয় যাহা অনুমতি করিলেন, এক পক্ষে ইহা অতি সমীচীন। কিন্তু মহারাজের দিক্ হইতেও একটা কথা বলিবার আছে। কিছু মনে করিবেন না,—কিন্তু ভাবুন দেখি, মহারাজ যে ছেলের হাত ধ'রে এখানে বিবাহ দিতে আসিবেন, তা কার জমিদারী দিয়ে তাঁকে আস্‌তে হবে? মহারাজ—নাটোরেরই মহারাজ আছেন;—

এ ছাতিন-গাঁর তিনি কে?—এখানকার মহারাজ—আর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—যাই বলুন,—আপনি স্বয়ং আত্মারাম চৌধুরী মহাশয়! ——কেমন কিনা?—আপনারা পাঁচজনে বলুন না?—এই পরের ভুঁই দিয়ে ত মহারাজকে বেটার বিয়ে দিতে আস্‌তে হ'বে?"

"সে কথা ঠিক"—"সে কথা ঠিক"—সভার মাঝে এইরূপ একটা ধ্বনি ও মাথা-নাড়ার পালা পড়িয়া গেল।

বাক্‌পটু দয়ারাম, তখন সুযোগ বুঝিয়া, আবার গলা সাড়া দিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, আমার কাছে মশাই স্পষ্ট কথা—তা মহারাজই হউন, আর দীন্ দুনিয়ার মালিকই হউন।"

এই দয়ারাম, নাটোর-রাজের একরূপ দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ। অতি সামান্য অবস্থা হইতে—রাজ-সংসারের তুচ্ছ ভাণ্ডারীর পদ হইতে—আজ তাঁহার এই প্রধান অমাত্য-পদ—পরামর্শদাতা মন্ত্রীর পদ প্রাপ্তি। অসাধারণ বিষয়-বুদ্ধিকৌশলে ও সর্ব্ববিধ কার্য্যপটুতা গুণে, রাজসংসারে তাঁহার এই প্রতিপত্তি ও পসার। অপিচ, দয়ারামের প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা ও সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষতা কাহারও অবিদিত ছিল না। জাতিতে তিলি; কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণ জমিদার নাটোর-রাজ,—তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সেই দয়ারাম রায় যখন এইরূপ প্রস্তাব

করিলেন তখন আত্মারাম বুঝিলেন, "এ কার্য্যে কিছু উঠিতে হইবে; দয়ারামের এ ব'ড়ের চাল।"

আত্মারাম আর এতদ্‌বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, বিনীতভাবে বলিলেন,—"যে আজ্ঞা, রাজ-মর্য্যাদা আমি যথাসাধ্য রক্ষা করিব। মহারাজ রামজীবন রায়ের প্রিয়-পুত্রের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ, আমি আমার এই ছাতিন-গাঁ পরগণার একাংশ, মহারাজকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিব। যে স্থানে বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও ফৌজ-বরকন্দাজ-সহ বর ও বরযাত্রীগণ সমবেত হইয়া বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিবেন,—অদ্য হইতে সেই ভূমির সহিত আত্মারাম চৌধুরীর আর কোন সংশ্রব রহিল না। আমি স্বেচ্ছায়, আনন্দচিত্তে এই শুভ-প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। ভরসা করি, অতঃপর মহারাজ আর আমাকে রাজধানীতে কন্যা লইয়া গিয়া, সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন করিতে, অনুমতি করিবেন না।"

রামজীবনের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই, দয়ারাম উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন,—"সাধু, সাধু!—চৌধুরী মহাশয়, আপনি সাধু! তা ত হ'বেই,—তা ত হ'বেই——এই মানীর মান মানীই রাখে;—অন্যে তার কি জান্‌বে বলুন? বুঝলেম্, যোগ্যস্থানে মহারাজ বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থির ক'রেছেন। এখন প্রজাপতির ইচ্ছায় শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক,—কায়মনোবাক্যে

এই প্রার্থনা করি।—চৌধুরী মহাশয়! আপনার সকলই প্রতুল হবে,—সব সোজাসুজি হ'য়ে যাবে,—আপনার মন ভাল।"

দয়ারাম একাই এক-শ'—আর কাহাকে কোন কথা কহিবার অবসরই দিলেন না।

একই দিনে, একই লগ্নে—দুই কন্যার বিবাহ। দুই শৈশব-সহচরী, নিত্য-সঙ্গিনী, দুই সমবয়স্কা কন্যার বিবাহ। দর্পণে ছায়ার ন্যায় একত্রে আহার-বিহার-বেশভূষা,—বাক্য-কথন-শিক্ষা,—খেলাধূলা ও ভাব-ভালবাসা,—এমনই দুই কন্যার বিবাহ। যেন গঙ্গা ও যমুনা একই স্রোতে প্রবাহিতা;—এমনই দুই কন্যার বিবাহ। এক,—গৌরী-রূপা ভবানী; আর,—শ্যামারূপা শিবানী। ভবানী ও শিবানী দু'য়ে মিলিয়া শাস্ত্রবিহিত সংসার-ধর্ম্ম পালন করুক,—সংসারে অমৃতময় ফল ফলিবে।

কিন্তু পিতামাতার মনে যে সোনার স্বপ্ন জাগিতেছে, সে স্বপ্ন কি সফল হইবে? কে জানে, কাহার কিসে সফল হয়, আর কিসে বিফল হয়!

সফল-বিফলের ভাবনা, তোমার আমার ভাবিয়া কাজ নাই;—যে যাহার অদৃষ্ট ও কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া যাইবে; তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"ওলো গৌরী, ওলো শিবি, এইবার তোদের আইবুড় নাম ঘুচ্‌লো রে!"

শিবানী। কেন ঠান্‌দিদি, হিংসে হয় নাকি?

ঠান্‌দিদি। আর ভাই, অমন কচি-কচি সোণার-চাঁপা বর পেলে, কার না হিংসে হয় বল?

শিবা। তা ঠাকুরদাদাকে বল্‌বো, না হয় তিনি দিনকত ছুটী নিন,—তাঁর জায়গায় "সোণার চাঁপা" এসে আসন নিন।

ঠান্। আর দিদি, আর কি সে বয়েস আছে, যে, সোণার চাঁপাদের মনে ধ'র্‌বে?

শিবা। বালাই, ষাট্! ঠান্‌দিদি, তোমার কিসের বয়েস,—কিসের অভাব? তোমার মাথার চুল—আজও যেন চিকণ কাল!

(ঠান্‌দিদীর মাথার প্রায় পনেরো আনা চুল পাকিয়া, জট বাঁধিয়া, যেন শোনের দড়ী হইয়াছে !)

ঠান্। তা ভাই, তুই ভালবাসিস, তাই এমন বল্‌চিস।

শিবা। না না, সত্যিই তোমার চিকণ কাল চুল,— ইচ্ছে হয় এই চুল নিয়ে ঘোষালদের বৌয়ের খোপার দড়ী বিনুই।

(ঘোষালদের বউ-এর উপর শিবানীর বড় রাগ,— সে তার 'গঙ্গাজলকে' একদিন নন্দা-মেয়ে ব'লে নাক-সিট্‌কেছিল। গঙ্গাজলের অপরাধ যে, সে তার বাপের অতিথিশালায় যায়, কাঙ্গাল-গরীবের খাওয়া দেখে,—কেউ পীড়িত হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা ক'রে থাকে।—এতেও লোকে আবার তার প্রশংসা করে, –আর ঘোষাল-বৌয়ের সেই কালো-কোলো—লোভাত্বে হ্যাংলা মেয়েটাকে কেউ দু'-চক্ষে দেখ্‌তে পারে না।)

মাথার চুল 'চিকণ কাল' শুনিয়া, ঠান্‌দিদী একবার মাথায় হাত দিলেন; মাথার কাপড়টি একটু টানিয়া দিলেন; আদর করিয়া শিবানীকে বলিলেন,—"সত্যি বল্‌চিস বোন্, আমার মাথার চুল কালো ?—তা অভাগ্যির দশা,—মিথ্যেই বা তুই বল্‌তে যাবি কেন,—তোর তেমন স্বভাব নয় ;—আহা, ভগবান তোরে সুখে রাখুন।—মনের

মত সোয়ামী পেয়ে, তুই বোন্ সুখে ঘর-সংসার কর্; তোর হাতের-নো ক্ষয় যাক্।" (ইত্যাদি, ইত্যাদি।)

শিবানী বয়সে যাই হউক, বুদ্ধিতে পাকা বুড়ী; ঠান্‌দিদীকে পাইয়া বেশ একটু রঙ্গ করিয়া লইল; বলিল, —"ঠান্‌দিদি, তোমার দাঁতগুলি যেন মুক্তোর ঝুরি!"

ঠান্‌দিদীর প্রায় সকল দন্তই পড়িয়া গিয়াছে,—কেবল কসে ও পাশে দুই চারিটা দাঁত বিরাজ করিতেছে;—মধ্য-স্থলে মাড়ী মাত্র সার। সেই মাড়ী বাহির করিয়া ঠান্‌দিদী এক-গাল হাসি হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে নাড়ীতে হাত দিয়া বলিলেন, "হঁ্যা দিদি, এই গেল-বারের সেই কন্‌ক'নে শীতে এই সাম্‌নের দাঁত দুটো আল্‌গা হ'য়ে গেছিল,—খাবার কষ্ট হ'তো ব'লে সাধ ক'রে আমি তা উপ্‌ড়ে ফেলেছি।"

শিবানী—দুষ্ট শিবানী, কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিল, "ঠান্‌দিদীর নাকটি কেমন টীকলো,—যেন মোহন বাঁশীর মত!"

ঠান্‌দিদী একবার নাকে হাত দিয়া, যেন একটু জড়-সড় হইয়া, ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, "না না, তা নয়,— তুই রঙ্গ কচ্ছিস্।"

শিবা। না ঠান্‌দিদী, রঙ্গ নয়,—সত্যি বল্‌চি, তোমার নাকটি টীকলো,—ধনুকের আগার মত।

ঠান্। তা—তা হ'বেও বা। তুই ত এমন মেয়ে নোস যে, মিছে-কথা ব'লে মন রাখ্‌বি।

শিবানী। তাই বল্‌চি ঠান্‌দিদী।—আর কে বলে ঠান্‌-দিদীর আমার গাল তুব্‌ড়ে গেছে? আমি ত দেখি পাকা আঁব্‌টি! আর ঠোঁট দু'খানি যেন টুক্‌টুকে তেলাকুচো!"

এবার ঠান্‌দিদী একেবারে শিবানীর গায়ে আসিয়া পড়িলেন; সোহাগভরে তাহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "বাছা নিজে ভাল কিনা, তাই ওর ঠান্‌দিদীর সব ভাল দেখে।—আহা,—মা-মঙ্গলচণ্ডী বাছার মঙ্গল করুন।—এই দেখ্‌ বোন্‌,—আমি এই বড়-গলা ক'রে বল্‌চি,—তোর ভাল হ'বে। তোর মন ভাল,—তোর ভাল হ'বেই—হবে। ঐ যে কথায় বলে,—"মন ভাল নয় তীর্থি কর, মিছে কাজে ঘুরে মর।——"

শিবানী।—(হাসি চাপিয়া) আর ঠান্‌দিদী, বল্‌তে ভুল্‌ছিলেম,—তোমার গায়ের রং—আজও যেন দুধে-আল্‌তায় গোলা!—হঠাৎ কে দেখে বল্‌বে যে, ঠান্‌দিদীর বয়স কুড়ি পেরিয়েছে!

এবার আর ঠান্‌দিদী সাম্‌লাইতে পারিলেন না,—গলা ছাড়িয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"ওরে আমার দিদীমণিটিরে! যদি কথা পাড়্‌লি, ত বলি শোন্‌। এই তোর ঠাকুরদাদা যখন আমায় বিয়ে ক'রে আন্‌লে, তখন আমি এই

তোদেরি বয়সী—আট বছরের মেয়ে ; তার পর পাঁচ আট কি ছ-আট (এক-আট হাতে রাখিয়া) পেরিয়েছে,—এরি মধ্যে পোড়া-লোকে রটিয়ে দিলে কিনা,—কুড়ি পেরিয়ে ঠান্‌দিদী বুড়ী হ'য়েছে !—(পড়্‌সীদের উদ্দেশে) আরে বুড়ী হ'য়েচি, তা তোদের কি ? তোদের কি ভালটা খেয়েচি রে ?"

এখন, এই 'ভালটা-খাওয়ার' কথা হইতে অনেক রকম ভাল-খাওয়ার কথা উঠিল।—ঠান্‌দিদীর মুখে যেন চড়্‌বড়্‌ করিয়া খৈ ফুটিতে লাগিল। সেই খৈ-ফোটা আর থামে না,—বহুক্ষণ তাহাতে অতিবাহিত হইল।

শিবানী ঠান্‌দিদীকে শান্ত করিয়া বলিল,—"তা ঠান্‌দিদি, লোকের কথা তুমি শোন কেন ? আমরা সুবাদে নাত্‌নি হ'লেও, তোমাকে 'সই' ব'লে জানি।"

ঠান্। তুমি কেমন মেয়ে,—তুমি জান্‌বে না বোন্ ?—আর ধরো ছ-আট বয়েসই না হয় আমার হ'য়েচে,—মেনে নিলেমই পোড়া-লোকের কথা ;—তা বলত বোন্,—ছ-আট—কত হয় ? (আঙ্গুলে পর্ব্ব গণনা করিয়া) আট—এই নয়, দশ, এগারো,—কত হয় ?

শিবা। চৌদ্দ।—ষাট্! কুড়িই বা তোমার পেরুবে কেন ?—ছ-আট চৌদ্দ হয় ;—ঠান্‌দিদীর বয়েস আমাদের এই চৌদ্দ বছর !

ঠান্। (ঈষৎ হাসিয়া) চোদ্দ নয় বাছা,—মিছে বল্‌বো না,—এই উনিশ বছর ন-মাস ;—কুড়ি পূর্‌তে এখনো ছ-মাস বাকী।

ঠান্‌দিদীর এই "কুড়ি পূর্‌তে ছ-মাস বাকী"—অনেকে অনেক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে,—এ কুড়ি আর পূরে না! শিবানী ত শিবানী,—শিবানীর মার বিয়ের সময় শিবানীর মা'ও এই কথা শুনিয়াছে ; শিবানীর বাপও বিয়ের আগে থেকে একথা শুনে আস্‌চে ; আর আজ শিবানীও তাহা শুনিল। শুনিয়া, মনের মধ্যে বেদম হাসিয়া লইল। হাসি চাপিতে চাপিতে, তাহার গাল-গলা-পেট যেন ফুলিয়া উঠিল।

এবার অতি কষ্টে কাসির ভাণ করিয়া, শিবানী বলিল,—"ঠান্‌দিদী, তবে এস, আমাদের শিবপূজার সময় হ'লো—ফুল তুলে নিয়ে যাই।"

ঠান্। হাঁ দিদী, যাই।—আমিও একবার গিন্নী-মার কাছে যাব।—ওকি! 'মা মা' শব্দ করে কে? গৌরী না? চল দেখি, দেখি, কি হ'লো? এঁ্যা! একি সর্ব্বনাশ!

উভয়ে ত্বরিতপদে, ব্যাকুলভরে, গৌরীর নিকট পঁহুছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

একটি স্বর্ণময় ফুলের সাজি লইয়া, গৌরী অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যানে, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। মধুর প্রভাত, মধুর মলয়ানিল, মধুর পুষ্পবাস—তিন মাধুর্য্যে মাধুরিমময়ীর মধুরতা,—অপূর্ব্বভাবে পরিণত হইতেছিল। স্তবকে স্তবকে কুসুম-দাম, স্তরে স্তরে কোরক-গুচ্ছ, পত্রে পত্রে বালার্ক-কিরণ,—তপ্ত-কাঞ্চনপ্রভা গৌরী ধূপছায়া রঙ্গের বিচিত্র পট্টবাসে আবৃত হইয়া, কুসুমকোমল করে সোণার ফুলের সাজি লইয়া, অপরূপ রূপ-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে করিতে, সেই প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যান মাঝে, ফুল-রাণীরূপে বিরাজ করিতেছিল। দাস দাসীর অভাব ছিল না,—ইচ্ছামাত্রেই কার্য্য সমাধা হইতে পারিত,—তথাপি বালিকা দৈনন্দিন শিবপূজার

ফুল স্বহস্তে সাজি ভরিয়া তুলিত, তুলিয়া সুখী হইত। উত্তর-জীবনে যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া, বালিকা দেবী-পদবাচ্যা হইবে, শান্তময় শৈশবের সুখ-উষায়, প্রকৃতি যেন আপনা হইতে তাহাকে সেই শিক্ষা দিয়া রাখিল। স্বভাবের এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম!—অঙ্কুরেই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব প্রারব্ধ হইয়া থাকে।

(এই কথা স্মরণ রাখিয়া ভবানী-চরিত্র অধ্যয়ন করিলে, লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।)

সোনার গৌরী সোনার সাজি লইয়া, সঙ্গিনী সহ পবিত্রমনে পুষ্পচয়ন করিতেছিল;—কি ভাবে, কখন্, কোন্ মন্ত্রোচ্চারণের সহিত, কোন্ ফুলটি শিবলিঙ্গে অর্পণ করিবে ভাবিতেছিল;—এমন সময় পাড়ার ঠান্‌দিদি আসিয়া, তাহার সেই বিমল 'মানসিকে' বাধা দিল। বালিকা সহসা, কেমন যেন চমকিত হইয়া, একটু থত-মত খাইয়া, অদূরস্থ এক লতাকুঞ্জে গিয়া বসিয়া পড়িল। সেখানে সঙ্গিনী শিবানী বা ঠান্‌দিদীর কথাবার্ত্তা তাহার কানেই পঁহুছিল না,—সে আপন মনে আত্মচিন্তানিরত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে, বিনা-সূতায় এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিল। —পুষ্পদল বৃন্তে-বৃন্তে সংযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া, এই সুন্দর মালার আকার ধারণ করিল। সে মালা যাঁহার মাথায় উঠিবে, তিনি দেব-দেব মহাদেব। মহাদেব ও সেই

অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়া, বালিকার চোখে জল আসিল।

সময়গুণে, ইহার সহিত আবার, সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন-বৃত্তান্তও অন্তরে জাগরিত হইল। মা-অন্নপূর্ণা তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়া গিয়াছেন,—"শিবপূজা, গঙ্গাস্নান ও সাধুদর্শন,—এই তিন পরমবস্তু,—জীবনের প্রিয়তর করিও।"—গৌরী এখন তাহাই ভাবিতে লাগিল; মনে মনে বলিল,—

"মা পরমেশ্বরি! তোমার আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিয়া আসিতেছি। শিবপূজা যথানিয়মে প্রতি দিনই করিতেছি,—সংপ্রতি তোমার ইচ্ছায়, মা! আমার সাধুদর্শনও হইয়াছে।—সাধুদর্শন কি প্রত্যক্ষ শিবদর্শন,—তা মা, তুমিই জান। কিন্তু গঙ্গাস্নান,—সে আমি কিরূপে করিব? এ ছাতিন-গায় ত মায়ের আবির্ভাব হয় নাই? তবে ধর্ম্মাত্মা পিতা আমার বহু যত্নে, বহু অর্থব্যয়ে সর্ব্বতীর্থের জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; আমি তাহা হইতে প্রতি-দিনই একরূপ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকি। সুরধুনী পতিত-পাবনী তিনি;—ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে যখন তিনি অবস্থিতি করিতে পারেন, তখন যে তাঁহার নিত্য-স্পর্শে, আমার পাপ-তাপও বিদূরিত না হইবে, এমন হইতেই পারে না।——মা, তবে যা চেয়েছি, তাই এখন দাও। অন্তর্যামিনি, এ

শরণাগতার অন্তরে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিতা হও। মা, আমার স্বামী দাও। স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম গুরু, পূর্ণব্রহ্ম স্বামী আমার দাও। তেজস্বী, ধর্ম্মাত্মা, চিরজীবী স্বামী আমায় দান কর। মা, বরাভয়দায়িনি! তোমার দয়ায় ত কেউ বঞ্চিত হয় না?"

"তুমিও হইবে না,—তবে সম্পূর্ণ নহে।"

গৌরীর কানের কাছে, কে যেন বজ্রগম্ভীর স্বরে, এই ধ্বনি করিয়া গেল। স্বর গম্ভীর, কিন্তু অতি মধুর।

নিমীলিতনেত্রা গৌরী কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে কহিল,—"বাবা, বাবা, এ কি বলিলে? হে শিব, তুমি এ ছলনা করিলে?"

পুনরায় গৌরী যেন শুনিতে পাইল,—"আমি ছলনা করি নাই;—তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বাল-বৈধব্যের হাত হইতে রক্ষা করিলাম।"

গৌরী। (পূর্ব্ববৎ আত্মমনে) এঁ্যা! বাল-বৈধব্যের হাত হইতে রক্ষা? স্বামীর অকাল মরণ? বাবা, বাবা, কন্যার বৈধব্য ঘটাইলে?

সেই স্বর পূর্ব্ববৎ গৌরীর কাণে বাজিল,—"আমি ঘটাই নাই,—তোমার জন্মান্তরীণ প্রাক্তন-ফলেই এইরূপ ঘটিল। বলিয়াছি ত, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন; তাই তোমার অদ্ভুত তপস্যায় ও পিতৃপুণ্যে, তোমার বাল-

বৈধব্য, বলিব কি, তোমার বাসর-বৈধব্য আমি রোধ করিয়াছি। এখন, ইহার অধিক আর শুনিতে চাহিও না।—কেন, তুমি কি সকলই বিস্মৃত হইতেছ ? কে তুমি, —কেন আসিয়াছ, তাহা কি কিছুই মনে নাই ?—এখন সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ কর।—তুমিত পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিয়াছ,—"সাংসারিক সুখ তোমার অদৃষ্টে বড় বেশী ঘটিবে না ; সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখের ভাগই অধিক !"— সুতরাং এই প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়া আশ্বস্তা হও : এখন হইতেই বুকে বল সঞ্চয় কর ; পরাৎপরা তোমার সহায় হইবেন। দেখ দেখি, আমি কে ?"

গৌরী চক্ষু মেলিল,—দেখিল, সেই জটাজুটধারী, বিভূতি-পরিলেপিত, তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী।—তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরবরণ, ঢুলু ঢুলু নয়ন, নির্ব্বিকার সদানন্দ ভাব ;— সন্ন্যাসী গৌরীর পানে অতি করুণ বাৎসল্যভাবে চাহিতে চাহিতে, মৃদু মধুর হাসিতে লাগিলেন।

গৌরী যেন আবেগে, অনুরাগে, পরিপূর্ণ উৎসাহে, সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে গিয়া বলিল,—"বাবা, বাবা, তুমি ?"

"হাঁ, আমি।"

জলদগম্ভীর-স্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন,—"হাঁ, আমি।"

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর সেই বিরাট্ শৈবমূর্ত্তি যেন

শূন্যে উঠিল;—নিম্নে ভূমিতলে তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূলের একটি উজ্জল ছায়া পড়িল।

ভাববিহ্বলা গৌরী এবার কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই বিমানপথবিহারী দেবমূর্ত্তি—অতি মধুর—অতি কোমল ও অতি করুণকণ্ঠে বলিলেন,—

"আমি ছিলাম, আছি, ও থাকিব।—বৎসে, কাঁদিও না;—শান্ত হও;—এখন আমি চলিলাম। তোমার সুদুর্লভ জাতিস্মরা-তুল্য শৈশব বা সোনার স্বপ্ন-কাল ফুরাইল। এখন তোমার জাগরণের অবস্থা। আর তোমার মধ্যে, কেহ বড় একটা অঘটন ঘটন, অপূর্ব্ব কথন, ও অলৌকিক কার্য্যাবলীর সমাবেশ দেখিতে পাইবে না। তোমার নিজেরও এই অপার্থিব [illegible] [illegible] শৈশব-স্মৃতি, বড় একটা মনে থাকিবে না। এইবার তুমি সংসারে প্রবিষ্ট হও। লোকসাধারণে উচ্চ আদর্শ দেখাও। রাজলক্ষ্মী হইয়া, জীবে আরো উন্নত-প্রণালীতে অন্নদান করিতে আরম্ভ কর। এই অন্নদান মহাব্রতে, কালে তুমি জননী-অন্নপূর্ণা সমা গরীয়সী হইবে। তোমার জীবন সফল হইবে।—যাইবার কালে আবার বলি,—বৎসে! শিবপূজা, গঙ্গাস্নান ও সাধুদর্শন,—এই তিন পরমবস্তু জীবনের নিত্য-ব্রত করিও;—তোমার পরমা গতি লাভ হইবে;—ইহজীবনেই তুমি তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিবে।"

মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন ; গৌরী মা মা রবে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই 'মা মা' রব শুনিয়া, শিবানী ও ঠান্‌দিদী ছুটিয়া আসিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরীর বিবাহ-ব্যাপারে, ছাতিন-গাঁয়ে, মহা সমারোহ পড়িয়া গেল। লোক-নস্কর, নগদী বেহারা, উড়ে ভাট, মিস্ত্রী মজুর,—চারিদিকে জনস্রোত ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। কোথাও মেরা বাঁধা হইতেছে, কোথাও সাঁবিয়ানা খাটানো হইতেছে, কোথাও টং বাঁধা হইতেছে, কোথাও রেস্‌লাইয়ের আলোর জন্ম সারি-গাঁথা বাঁশের খোপা বসানো হইতেছে, কোথাও নহবৎ-রেসনচৌকী বাজ্‌নার ঘর তৈয়ারী হইতেছে। ইহা ব্যতীত তোরণ, সিংহদ্বার, ফটক, বাজী-পোড়ানর-মাঠে দর্শকের বসিবার আসন, কাঙ্গালী-ভোজনের স্থান—চালা, আটচালা, ভিয়ান-ঘর—কতস্থানে যে কতবিধ ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ছাতিন-গাঁ অঞ্চলে বংশকুল নির্ম্মূল হইল, দেবদারু-বৃক্ষশাখা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, এবং দড়ি-দড়া-পাট ও দরমা— চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ফুলের বাগানে কাহারো আর ফুল রহিল না,—ফুল ও সুদৃশ্য আরণ্য লতা-পাতা—গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে গিয়া সংগ্রহ করিতে হইল। ফুলের ঝাড়, ফুলের তোড়া, ফুলের মালা যে কত তৈয়ারা হইল, তাহার আর সংখ্যা নাই। ইহা ব্যতীত সোলার-তৈয়ারা ফুল —সোলার লতা-পাতা-গাছ,— সোলার হাতী-ঘোড়া-ভেড়া-মেড়া-উট,—সোলার পাহাড়-পর্ব্বত-রথ,—সোলার গরু-বানর-সাপ—এক সোলারই যে কত জিনিস তৈয়ারী হইল,—কে তাহার সংখ্যা করে? এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কারিকর, ভিন্ন ভিন্ন মিস্ত্রী-মজুর, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে লিপ্ত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন লাঠীয়াল ও মল্লযোদ্ধৃগণও সমবেত হইয়াছে;—তাহারা ঢাল-সড়্কী-লাঠীখেলা দেখাইয়া, নানারূপ কুস্তির কারিগিরি প্রদর্শিত করিয়া, কন্যা-কর্ত্তার নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার আদায় করিবে। বাজেদার-ঢুলি যে কত স্থান হইতে কতদল আসিতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। কাহাকেও কোন বিষয়ের জন্য 'না' বলা না হয়, ইহাই যেন কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছা। সুতরাং যে যেখানে ছিল, এবং যাহার যে বিষয়ের যতদূর বিদ্যা বা কেরামৎ ছিল, সে সেহ

বিষয় দেখাইয়া পুরস্কৃত হইবার আশায়, বিনা আহ্বানে, ছাতিন গাঁয়ে আত্মারামের এলাকায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

একদিকে এই ব্যাপার ;—অন্যদিকের ব্যাপার আরও গুরুতর।—ভোজ্য-আয়োজনের কথাই বলি। আত্মারামের ৺পূজার বাড়ীর পশ্চাতে—একটা খুব বড় ফর্‌দা জায়গা—বিশ পঁচিশ বিঘা ভূমি এককালে ঘেরিয়া ফেলা হইয়াছে। সেই জায়গায় এক প্রকাণ্ড খোলার ঘর তৈয়ারী হইয়াছে। সেই খোলার ঘরে ছোট বড় অসংখ্য কুঠ্‌রী। প্রত্যেক কুঠ্‌রীতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, রাশীকৃত—পর্ব্বতপ্রমাণ সজ্জিত হইয়াছে। যে কুঠ্‌রীতে ময়দা আছে, তাহাতে কেবল ময়দাই আছে,—বস্তার উপর বস্তা,—একেবারে আড়কাঠ ঠেকিয়াছে। যে কুঠ্‌রীতে ঘি আছে, তাহা কেবল ঘিয়ের মট্‌কীতেই বোঝাই—পা গলাইবার যো নাই। এইরূপ গুড়ের কুঠ্‌রী,—গুড়ের মেটেয় পরিপূর্ণ,—মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে। আর চাল-ডাল তেল-নুন চিনি-মসলা তরী-তরকারী—এ সব কুঠ্‌-রীতে ত তিলধারণেরও স্থান নাই,—সে এক বিচিত্র ব্যাপার। প্রত্যেক কুঠ্‌রীর গায়ে এক এক ফর্দ্দ কাগজ আঁটা ;—কাগজে লেখা—অমুক দ্রব্যের কুঠ্‌রী। এত যে বিরাট্‌ আয়োজন,—এত যে অসংখ্য দ্রব্যের সমাবেশ, তা

এতটুকুও বিশৃঙ্খল-ভাব নাই;—কোন বিষয়ে একটুও উলট-পালট হইবার যো নাই। প্রত্যেক কুঠ্‌রী—এক এক ভাণ্ডারীর জিম্মা। প্রত্যেক ভাণ্ডারী এক এক জিনিসের হিসাব-নিকাশের দায়ী। সকলের উপর এক সরকার আছে,—সে-ই মধ্যে মধ্যে এ-কুঠ্‌রী—ও-কুঠ্‌রী দেখিয়া বেড়াইতেছে,—কোন্ জিনিস কত আছে, বা কি কম পড়িতে পারে।

শতাধিক পাচক ব্রাহ্মণ ও সুদক্ষ ময়রা—ভিয়ান্-কার্য্যে নিযুক্ত। দিন থাকিতে পর্ব্বতপ্রমাণ মিষ্টান্ন—খাজা-গজা-রসগোল্লা,—পানতুয়া-বোঁদে-জিলিপি,—মিহিদানা-মতিচূর-মাল্‌পো,—সরপূরিয়া-সরভাজা-সন্দেশ প্রস্তুত হইতে লাগিল। বড় জাঁকের বিবাহ,—ভাবী রাজলক্ষ্মীর বিবাহ; সুতরাং মিষ্টান্নের যে ছড়াছড়ি হইবে, তাহা আর বেশী কথা কি? বিশেষ, বর ও বরযাত্রী হইতে কন্যাযাত্রী ও কাঙ্গালীকুল পর্য্যন্ত সমানভাবে, সমান পর্য্যায়ে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করে, ইহা কর্ম্মকর্ত্তার ঐকান্তিক সাধ। তাই মিষ্টান্ন আয়োজনের আর অবধি রহিল না। আত্মারাম ভাবিলেন,—

"কেন, কাঙ্গালীর রসনা কি নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের রসনা হইতে ভিন্ন? জীবনে তাহারা এক দিন পেট পূরিয়া ভাল সামগ্রী খায়, ইহা কি বিধাতার ইচ্ছা

নয়? যাহা ধনী ও মানীগণ প্রায় প্রতিদিন ইচ্ছামাত্রেই আহার করেন, কাঙ্গালী-ভিখারীকে তাহাদের দুঃখ-দৈন্যময় সমগ্র জীবনের মধ্যে একদিন সেইরূপ খাওয়াইলে,—অবস্থাপন্ন ভাগ্যবানের কি অপমান হয়? নিমন্ত্রিতের পাতে উৎকৃষ্ট ভোজ্য বা মিষ্টান্ন পড়িয়া থাকিলেও, কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে, পরিবেষ্টা তাঁহাকে সাধিয়া-সাধিয়া সেই সব জিনিস দেন;—আর কাঙ্গালীকুলকে কদর্য্য ডাল-ভাত বা সামান্য চিড়া-দৈ দিয়াই, শৃগাল-কুকুরের ন্যায়, ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাভরে দূর্ দূর্ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। কখন বা তাহাদের অঙ্গে বেত্রাঘাত—এমন কি পদাঘাত পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। আমার প্রাণাধিকা ভবানীর বিবাহে আমি এ নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইব;—নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, কাঙ্গালী ভিখারী সকলকে সমানভাবে খাওয়াইব। মা-জগদম্বা কি আমার এ সাধ পূরাইবেন না? বিশেষ ভবানী নিজে কাঙ্গাল-গরীবকে প্রাণের সমান ভালবাসে;—তার বিবাহে, তার ভালবাসার জনকে, আদর করিয়া খাওয়াইব না?"

তাই এই পর্ব্বতপ্রমাণ খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন;—তাই তাহার পর্য্যবেক্ষণে এই সুন্দর বিধি-ব্যবস্থা।

গোপকুল ঝাঁকে ঝাঁকে দুগ্ধ-দধি-ছানা-ক্ষীর লইয়া আসিতে লাগিল। বিশ পঁচিশটা বড় বড় দীঘিতে

বড় বড় মাছ 'নাকাল্' দিয়া রাখা হইল। বস্তা বস্তা কলা-পাত আসিয়া পঁহুছিল। লুচির উনানে মণে মণে লুচি-ভাজার সুরু হইল। ভিয়ানশালা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আর দিন নাই,—শুভ বিবাহ সম্মুখবর্ত্তী।

এদিকে আত্মারামের অন্তঃপুর সুন্দরীমণ্ডলে পরিপূর্ণ। নিকট-কুটুম্ব, দূর-কুটুম্ব, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব;—মামার-শালার পিস্‌তুতো ভায়ের পত্নী,—তদীয়া গুরু-পত্নী; সইয়ের-বৌয়ের বকুল-ফুল; বকুল-ফুলের মালতী; মালতীর গোলাপ; গোলাপের গন্ধরাজ; গন্ধরাজের দ্যাখন্-হাসি; দ্যাখন্-হাসির মকর; মকরের বেহান্; বেহানের বোন্ ঝি; বোন্‌ঝির বিধবা ভাসুর-কন্যা; বিধবা ভাসুর-কন্যার ভিক্ষাপুত্রের পত্নী; সেই ভিক্ষাপুত্রের পত্নীর একটি আইবুড়—কুলীনের ঘরের ডাগর বোন্;—এইরূপ তস্যার [illegible] সুন্দরীতে সেই বৃহৎ পুরী পরিপূর্ণ। কোন সুন্দরী ব্যাসনে গা ঘসিতেছেন; কোন সুন্দরী পান খাইয়া দর্পণে লাল-ঠোঁট দেখিতেছেন; কোন সুন্দরী পায়ে আলতা পরিতেছেন;—আর কোন সুন্দরী বা মুখ ভেঙ্গাইয়া অশান্ত ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন। কোথাও খোস্‌গল্প, কোথাও রঙ্গরস-রসিকতা,—কোথাও বা উচ্চ হাসির রোল। কোথাও দেখিবে, কোন ঐশ্বর্য্য-

গর্ব্বিতা যুবতী, গায়ে এক-গা গহনা পরিয়া, মিহি কাপড়ের বাহার দিয়া, আপন ঐশ্বর্য্য-গরিমা দেখাইবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, এস্থান হইতে ও-স্থানে,—ও-স্থান হইতে সে-স্থানে, গজেন্দ্রগমনে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আতরের গন্ধ; হাতের পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচ হীরার আংটি;—মধ্যে মধ্যে যেন কি দুর্গন্ধ পাইয়া এক একবার নাকে হাত দিতেছেন;—আর সেই সুযোগে অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয় সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে;—তাহার উজ্জ্বল আভা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। একজন অদ্ধবয়সী পরিচারিকা, একটি কারুকার্য্য-খচিত সুবর্ণমণ্ডিত পানের ডিপা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। যুবতীর দৃষ্টি, যেন এ ধরাধামে থাকিয়াও নাই। মাটীতে দাঁড়াইয়া থাকিলেও মনে হয় না যে, তাঁহার পা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে।—এমনিভাবে কোথাও বা ঐশ্বর্য্যের আধিক্য প্রদর্শন,—আর কোথাও বা তার তীব্র সমালোচনা।—"ওরে বাপ্‌রে! ছ-আনী জমীদারীর ঐশ্বর্য্যি এত! দশ-আনী হ'লে ত দেখ্‌চি হাতে মাথা কাট্‌ত।" "সত্যি ব'লেছিস ভাই,—ঠেকারে যেন মাটীতে পা পড়ে না।—তবু যদি গায়ের রংটা আমাদের রঙ্গিণীর মত হ'তো!" "তা যদি ব'ল্লে, ত শুধু গায়ের রংটা কেন,—কপাল একটু উঁচু, চোখের কোল একটু বসা, ভুরু তেমন

জোড়া নয়, নীচের ঠোঁটটা একটু পুরু,—ভালটা আবার কোন জায়গায়?" আর একজন বলিলেন,—"আর গায়ের গহনা—তাই বা এমনি কি? আমার বড় বোন্‌ঝির এর চেয়েও ভাল বাউটী-সুটের গহনা আছে। এমন জান্‌লে তাকে শ্বশুর-বাড়ী থেকে আন্‌তেম।" এইরূপ, আবার কোথাও দেখিবে, সারিগাঁথা সমবয়স্কা সুন্দরীবৃন্দ মাথার চুল এলাইয়া, চুলের দড়ী লইয়া খোপা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খোপা বাঁধিতে বাঁধিতে কত হাসি, কত গল্প, কত শ্লোক আবৃত্তি। মধ্যে মধ্যে এক একটা হাসির কথা উঠে,—আর সেই বিস্তৃত কক্ষ ধ্বনিত হয়।—হাসিতে হাসিতে, এ উহার ঘাড়ে, সে তাহার ঘাড়ে পড়িয়া যায়—অৰ্দ্ধ-বিউনি চুল সর্ব্বাঙ্গে এলাইয়া পড়ে;—পুনরায় চুলবাঁধা আরম্ভ হয়। এইরূপ কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস, খিড়কীর ঘাটে গা-ধোয়া, চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়রূপে উপাদেয় আহার,—গৌরীর বিবাহে সুন্দরীবৃন্দের সহিত পুরী যেন হাসিতে লাগিল।

অন্দরের শোভা যেরূপ, সদরের শোভাও আর এক অংশে, এতদনুরূপ। দেশ দেশান্তর হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপক-মণ্ডলী বিদায় লইতে আসিয়াছেন; দূরদেশস্থ কুটম্ব নিমন্ত্রিতগণ ও দূর-সম্পৰ্কীয় জামাতৃগণ—চারিদিকে বাহার দিয়া বসিয়াছেন। ইতর ভদ্র সকলেই

হৃষ্টমনে চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেছে। কেবলই আনন্দসূচক দীয়তাং ভুজ্যতাং রব চলিতেছে। এইরূপ সদরবাড়ী, দুর্গাবাড়ী, অন্নপূর্ণার বাড়ী, দেবশালা, অতিথি-শালা, টোল, চতুষ্পাঠী সর্ব্বত্রই লোকপূর্ণ। লোকের সেই কল্‌কলা ও হল্‌হলা ভাবে, যেন সজীব ও মূর্ত্তিমান্ আনন্দ বিরাজ করিতেছে। আনন্দের হাটে সকলেই যেন আনন্দ লুটিতেছে।

সেই একদিন, আর এই এক দিন। সেই আট বৎসর পূর্ব্বে, গৌরীর জন্মদিনে,—মায়ের মহাষ্টমী তিথিতে,—উৎসবের আসরে সেই এক আনন্দের হাট বসিয়াছিল;—আর আজ গৌরীর শুভ বিবাহ-বাসরে সেই আনন্দোৎসব জমাট বাঁধিতে চলিল।

মধুমাস। মধুর বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হইয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে নব পত্রোদ্গম; গোঠে মাঠে নব তৃণাঙ্কুর; চারিদিকে আম্রমুকুল-গন্ধ; পশু-পক্ষী আনন্দে উৎফুল্ল; কোকিলের কুহুস্বরে ও পাপিয়া-দোয়েলের মধুর তানে দিক্ পূর্ণ; হিমানীর হি-হি কম্পন ও কুজ্ঝটিকার জড়সড় ভাব আর নাই; প্রাণ-সঞ্জীবন চিত্ত-বিমোহন মধুর-মলয়-হাওয়ায়—জীবকুল সজীবিত ও আনন্দময়; কৃষককুল বর্ষব্যাপী পরিশ্রমে আত্ম-শোণিত-তুল্য শস্য গোলাজাত করিয়া, হাসিমুখে ও মনের সুখে

অবস্থিত;—কাহারো কোন কষ্ট নাই;—এমনি শান্তিময় পবিত্র সময়ে,—শুভ ফাল্গুনের সন্ধিস্থলে,—মানবের আশা, উৎসাহ ও আনন্দের পূর্ণমিলন-কালে,—বারেন্দ্র-কুলোজ্জ্বলা, হিন্দু-কুললক্ষ্মী, দেবীরূপিণী গৌরীর শুভ বিবাহ।

বিবাহের আর দুই দিন বাকী। ছাতিন গ্রাম যেন নন্দনকানন হইয়াছে।

আনন্দময়ী মধু-যামিনী। মধুর মলয় বায়ু ঝির্ ঝির্ বহিতেছে। মধুর পুষ্প-গন্ধ দিক্ আমোদিত করিতেছে। মধুর আলাপ-আপ্যায়নে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি-সূত্রে বাঁধিতেছে। চারিদিকে আলো আর হাসি,—গান আর বাঁশী। বাঁশীতে ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, টৌড়ী, বেহাগ আলাপ চলিতেছে,—চারিদিকে যেন সুধা-বৃষ্টি হইতেছে।

বরযাত্রীদের বাসা-বাটীতে শত শত আলোকদান জ্বলিতেছে; পথের দুই পার্শ্বেও তারা-হারের মত আলোক-মালা হাসিতেছে। তবে এ আলোক সম্পূর্ণ আলোক নহে,—এ আলোক বিবাহের আলোকের মহলা বা নমুনা মাত্র। কন্যাকর্ত্তার বাটীতেও এ নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছে আলোকে সদর অন্দর—দুই-ই হাঁসিতেছে।

কিন্তু যাহার আলোকে সবাই হাসিতেছে, সবাই গাহিতেছে,—সেই আত্মারাম চৌধুরী আজ এত নিরানন্দ

ও বিষণ্ণ কেন? জলস্রোতের মত অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, যিনি এই মহা সমারোহ ব্যাপারের আয়োজন করিলেন, তিনি আজ অমন বিষণ্ণ-গম্ভীর-ভাবে অবস্থিত কেন? শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে লইয়া যিনি শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিতে ভাল বাসেন,—আজ তিনি, সেই দেশ-দেশান্তর-আগত শত শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও, শাস্ত্রীয় বিচারে উদাসীন কেন? কর্ম্মচারীবৃন্দ, কেহ কোন কথা জানিতে চাহিলেও, আত্মারাম ভাল করিয়া উত্তর দিতেছেন না,—পরন্তু যেন একটু বিরক্ত ভাবও দেখাইতেছেন।—কেন? এর কারণ কি?

"কন্যাদায় বড় গুরুতর দায়; শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন না হইলে বিশ্বাস নাই"—এই ভাবিয়া কি আত্মারাম আপন দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, আজ এমন উন্মনা আছেন?

না।—তাঁহার মনে জাগিতেছে, সেই গৌরীর জন্ম,—সেই মায়ের মহাষ্টমী পূজা,—সেই বাড়ীতে সহস্র সহস্র লোক-সমাবেশ,—সেই উৎসবের হাটে আর এক অভিনব উৎসবের জমাট;—তার পর সেই জ্যোতির্ব্বিদের গণনা, সেই কোষ্ঠী প্রণয়ন, সেই কোষ্ঠীফল দেখিয়া আগুনে কোষ্ঠী ভস্মীভূত করণ;—তার পর সেই কন্যার 'বিধবা'-কথার অর্থ উপলব্ধি করিবার জিদ্,—তাহার মুখ দিয়া

ঐ প্রাণঘাতিনী বাণীর নিষ্ঠুর প্রশ্ন,—সেই সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ,—সেই গৃহিণীর হস্তস্থিত কঙ্কণাঘাতে আকস্মিক রক্তপাত,—এইরূপ শত দিনের শতরূপ চিন্তা আত্মারামের মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে,—তাই তিনি অন্তরের অন্তরে গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন;—ভাবনা-সমুদ্রের তলদেশে যেন তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাইয়াছে,—তাই আত্মারাম—আনন্দরহিত গম্ভীর-বিষণ্ণ-ভাবে-দর্শকের চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছেন।

মনের এ অবস্থায় আর অধিকক্ষণ সদরে অবস্থিতি করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, আত্মারাম ধীরে ধীরে অন্দরাভিমুখে চলিলেন। তখন রাত্রিও অধিক হইয়াছে;—অন্দরের আনন্দ-কোলাহল অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে আত্মারাম এক নির্জ্জনকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন;—ধীরে ধীরে সেই কক্ষের দ্বারও রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

আত্মারাম গৃহের এক কোণে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।—ভাবনার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। কি ভাবিয়া আত্মারাম অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। কোঁচার খুঁটটিমাত্র গায়ে দিয়া, শূন্যপদে, মায়ের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

তখন অন্নপূর্ণার আরতি ও শীতল আদি সব হইয়া গিয়াছে। একটিমাত্র আলোক মার মন্দির মধ্যে মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। মন্দির জনশূন্য হইয়াছে। পূজক-ব্রাহ্মণ মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন,—আত্মারাম গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি যাও,—আজ আমি মার মন্দির অবরুদ্ধ করিব।"

পূজক। আপনি?

আত্মারাম। হাঁ, আমি।—তুমি যাও,—আমার একটু প্রয়োজন আছে।

পূজক-ব্রাহ্মণ আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হইলেন না;—ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আত্মারাম মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভিতর হইতে মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে প্রতিমা-সম্মুখে নতজানু হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"মাগো, অন্তর্য্যামিনি! আজ যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ। নূতন কথা কিছু নয় মা,—আজ আট বৎসর ধরিয়া যে কান্না তোমার চরণে কাঁদিয়া আসিতেছি, আজিও সেই কান্না কাঁদিব। কাঁদিয়া, এ পার্থিব কামনা, জন্মের মত বিসর্জ্জন দিব।—মা, ভবানীর আমার কি করিলে?—আর দুই দিন পরে তাহার বিবাহ;—পুরবাসী আনন্দনীরে নিমগ্ন; দেশ

জুড়িয়া আনন্দোৎসব প্রবাহিত; অর্থী প্রত্যর্থী—আহূত অনাহূত প্রাণ ভরিয়া ভবানীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে;—মা, এত আশীর্ব্বাদ, এত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, এত ব্রাহ্মণের পদধূলি,—সকলই কি পণ্ড হইবে? জগজ্জননি! দয়া করিবে না কি?—মুখ তুলিয়া চাহিবে না কি? মাগো, কায়মনোপ্রাণে এতদিন তোমার পূজা করিয়া আসিয়াছি;—তাহার কিছু ফল ফলিবে না কি? দয়াময়ি, দয়া কর! শিবে, সর্ব্বার্থসাধিকে, প্রসন্না হও,—আমার ভবানীর মঙ্গল কর;—তার বাল-বৈধব্য হ'তে তাকে রক্ষা কর!"

"তাহাই হইবে,—ভবানীর বাল-বৈধব্য ঘটিবে না।"

জীমূত মন্দ্রস্বরে, সমগ্র মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া, আত্মারামের কর্ণকুহরে এই মাতৃবাণী প্রবেশ করিল;—আত্মারাম চমকিত হইলেন। তাঁহার দেহ কণ্টকিত ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বিস্ময়ে, ভয়ে, মোহে আত্মারাম পুনরায় বলিলেন,—"মা, মা, যদি দয়া করিলে, তবে তাহার নিষ্ঠুর বৈধব্য-যোগ এককালে বিদূরিত করিয়া দাও,—সে যেন স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া মরিতে পায়।"

সহসা মন্দিরের আলোক নির্ব্বাণ হইল। মন্দির-অভ্যন্তর যেন অমাবস্যার সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মন্দির মধ্যে হো-হো-হো-রবে ঘোর

অট্টহাস্য উঠিল। যেন শত যোগিনী এককালে ভীষণ অট্টহাস্যে আত্মারামকে গ্রাস করিতে আসিল।

আত্মারাম ভয়ে আড়ষ্ট ও অভিভূত হইয়া পড়িলেও, একেবারে সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না,—কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"মা, চণ্ডিকে! যত ভয় বা বিভীষিকা দেখাও,—আমি এখান হইতে উঠিব না। তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া, আমি ইহলোক হইতে বিদায়-গ্রহণ করিব।"

আত্মারাম মুখ গুঁজিয়া, মায়ের পাদপদ্ম আঁকড়িয়া ধরিয়া, পড়িয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল এই ভাবে অতি-বাহিত হইল।

পরমুহূর্ত্তে মন্দিরমধ্যে অপূর্ব্ব আলোক-রশ্মি বিকসিত হইল। শান্তিময় স্নিগ্ধ উষার কনক-রেখা যে ভাবে পূর্ব্ব-গগনে পরিদৃষ্ট হয়; উদয়মান্ বাল-রবির ঘোর রক্তাক্ত কলেবর, পবিত্র ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, যে ভাবে প্রাচী-গগন আলো-কিত করে;—মায়ের মন্দিরমধ্যে সহসা সেই ভাবের অপূর্ব্ব আলোক-রশ্মি বিকসিত হইল। বরাভয়দায়িনী জননী অতি মধুর কোমল কণ্ঠে ভক্তকে কহিলেন,—

"ভয় নাই বাছা, চক্ষু মেলিয়া দেখ,—তোমার মোহ অপসারিত হইবে। দেখ দেখি, তোমার ভবানী কে,—আর আমি কে? আমিই কায়াময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার

আত্মজারূপে তোমার গৃহে অবস্থিতা। জীবে স্বহস্তে পরিতোষ পূর্ব্বক অন্নদান করিব,—বড় সাধ। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, আমি ভবানীরূপে অবনীতে অবতীর্ণা।—আমার লীলায় আমি বিধবা হইব;—সংসারের সকল দুঃখ-শোক ভোগ করিব,—তোমার অনুশোচনা করায় কোন ফল নাই।”

আত্মারাম চক্ষু উন্মীলন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে চাহিয়া রহিলেন; দেখিলেন—মা-অন্নপূর্ণা সত্যসত্যই তাঁহার কন্যারূপে আবির্ভূতা। দেখিলেন, মন্দির মধ্যে এককালে যেন সহস্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।—কি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সে রশ্মি! স্বর্গীয় সুগন্ধে মন্দির ভরিয়া গিয়াছে। আত্মারাম যেন কেবলমাত্র আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া, এই অদ্ভুত দেবী-লীলা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছে,—তিনি যেন একেবারে মূক হইয়া গিয়াছেন।

ভক্তকে তদবস্থায় দেখিয়া, জননী পুনরায় কহিলেন,—

“যাও বৎস, গৃহে যাও,—তুমি যা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা হইয়াছে,——তোমার ভবানী বাল-বিধবা হইবে না। জীবের দৈব-বল অপেক্ষা আর উচ্চ-বল নাই,—একথা স্থির-বিশ্বাস রাখিও। তুমি একান্ত মনে দৈব-আরাধনা করিয়াছিলে, তাই তোমার কন্যার বাল-বৈধব্য,

—বাসর-বৈধব্য বিদূরিত হইল ;—কিন্তু প্রাক্তন-ফল এক-কালে খণ্ডিত হইবার নয়,—তাই তোমার কন্যা যৌবনে বিধবা হইবে। বিধবা হইয়া যোগিনীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিবে ;—জীবের তাহাতে অশেষ কল্যাণ হইবে ;—জগৎ তাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে।—যাও, গৃহে যাও,—আমার বরে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে। যাও, এখন হইতে তুমি অনাসক্ত কর্ম্মী ও গৃহী হইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে সংসার-ধর্ম্ম পালন কর।”

সহসা মন্দিরের সেই আলোক-রশ্মি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল ;—মন্দির স্বাভাবিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

আত্মারামের কি আর আত্মবোধ আছে? তিনি আর কি বলিবেন,—কি বলিতে পারেন? ভাবিয়া দেখিলেন, সকলই দেবী-মায়া,—সকলই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা।—আত্মবুদ্ধি বা আত্ম-চেষ্টায় মানুষ কিছু করিতে পারে না। কৈ, আত্মারাম ত মন্দিরে আসিয়া, মায়ের নিকট প্রার্থনা করিবার সময়ও বলিতে পারিলেন না,—‘আমার কন্যাকে চির-সধবা করিও?’ ‘ভবানীর বাল-বৈধব্য ঘটাইও না,’—তিনি কেবল এই প্রার্থনাই করিলেন। যে জন্যই হউক, তাঁহার মুখ দিয়া যে প্রার্থনা বাহির হইয়াছিল, তাহা সফলা হইয়াছে। এখন আর সাংসারিক ‘হিসাবী’ বুদ্ধিতে—‘ভবানী চির-সধবা হউক,’—‘এই প্রার্থনা করিলে

ভাল হইত',—এরূপ মনে করিলে চলিবে কেন? এরূপ অঘটন ঘটন যাহা হয়, তাহা একবারই হয়,—দ্বিতীয়বারে বুদ্ধির মার্‌পেঁচ খেলাইয়া তাহা না;—অন্ততঃ ভক্তির পথে সে নিয়ম খাটে না।

আত্মারাম ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেন,—"মহামায়ার মায়া, মনুষ্যের সাধ্য কি যে, ভেদ করে!—মা! আমার আত্মবুদ্ধির গরিমা, অনেকদিন হইল খাটো হইয়াছে; যাহা ছিল, আজ তাহাও গেল। এখন সার বুঝিলাম,—তোমাতেই শরণ লওয়া জীবের শেষলক্ষ্য। শরণে ও নির্ভরে, তোমারও পূর্ণতৃপ্তি। মা, আর আমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বঞ্চিত করিও না।"

আত্মারাম ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিয়া, গৃহে গেলেন।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে, মন্দির বাহিরে, কে গাহিতেছিল,—

(সিন্ধু-কাফি—যৎ।)

(ওমা) কত খেলা জান তুমি,
তোমার খেলা কে বুঝ্‌তে পারে।
যে বলে বুঝেছি আমি,
পদে পদে সেই মা হারে॥

(আমার) বুদ্ধির মুখে দিয়ে মা ছাই,
ঘুচাও যত আপদ বালাই,
বুদ্ধি ধ'রে যেই চ'লে যাই,
পাঁচ ভূতে মা বেঁধে মারে॥

(আর) মার খেতে পারি না তারা,
পায়ে রাখ্ মা শিব-দারা,
হ'য়েছি যে দিশেহারা,
মুক্তি যে এ কারাগারে॥

তখন কান্না ভিং

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আজ শুভদিন,—আজ গৌরীর শুভ বিবাহ। পুরবাসি [illegible] সাধে ক'নে সাজাইতে আসিল।

যে ক'নে, তাহাকে আর সাজাইতে হয় না;—প্রকৃতি তাহাকে মনের সাধে সাজাইয়া সংসারে পাঠাইয়াছে।

তবুও ভক্ত প্রতিমা সাজায়। তাহার আপন মনের সাধ ও তৃপ্তি অনুসারে, সে, প্রতিমার গায় অলঙ্কার দেয়। চরণ-নখর হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত, যেখানে যেটি যে ভাবে সাজে, সেখানে সেটি সেইভাবে দিয়া, মনের মত করিয়া সাজায়।—তবুও কিন্তু মনের সাধ মিটে না,—কি-যেন-কি আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রহিয়া যায়। ভক্তের চোখে

তখন জল আসে। সেই রুদ্ধজলে, অন্তরের অন্তরে, ভক্ত তখন আপন অব্যক্ত মন-বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। ভক্তের বাসনা—ভাবরূপ অব্যক্ত।

'ভাবরূপ অব্যক্ত'—সে কেমন?—ভক্ত নিজেই তাহা মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারে,—মুখ ফুটিয়া অপরকে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

প্রতিমা-সেবক প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃতই মাকে সম্যক্‌রূপে সাজাইয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। 'আর যে কি চাই,—কোন্ অলঙ্কারের যে আর প্রয়োজন',—মুখ ফুটিয়া সে কথা সে কাহাকে বুঝাইতেও পারে না,—নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না।—তখন কান্না ভিন্ন আর গতি কি?

ভক্তের কথা দূরে থাক্,—আমরা যে ঘোর বিষয়াসক্ত,—সংসারের কৃমি-কীট;—আমরাও কি অন্তরের প্রকৃত অভাব—ঠিক্ সুনিশ্চিতরূপে কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে পারি? হলপ করিয়া কি কেহ বলিতে পারেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বরদানে উদ্যত হইলে, তিনি জীবনের ঠিক অভাবটি সেই কল্পতরুর নিকট প্রকাশ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভে কৃতার্থ হইতে পারিবেন? না, তা হয় না,—বাসনা অনন্ত;—সেই অনন্ত বাসনা হইতেই আমরা অনন্ত অভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকি। মূলে, জীব বড় দুঃখী।

সোনামুখী গৌরী-প্রতিমাকে স্বর্ণ ও রত্ন-অলঙ্কারে সাজাইতে, পুরবাসিনী রমণীগণ সকলেই আসিল,—সকলেই সযতনে একটু আধটু করিয়া সাজ-সজ্জার আয়োজন করিয়া দিল; কেহ বা মুখে দুই একটা পরামর্শ দিয়া, আপন আপন পছন্দের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল;—কিন্তু কৈ, কাহারো মনের মানস ত পূরিল না? অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পদ দু'খানি হইতে মাথার কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত—মণিমুক্তা-রত্নালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইল;—কিন্তু তাহাতেই কি সকলের মন উঠিল? যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভাবিকা ও সহৃদয়া,—যে গৌরীকে প্রকৃতই ভালবাসে, সে এই ক'নে-সজ্জা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না,—তাহার মনে হইল,—"আবার সব খুলিয়া, সব ধুইয়া-মুছিয়া, নূতন করিয়া এ প্রতিমা সাজাইয়া দিই।" এমনই হয়,—এমনি হওয়াই স্বাভাবিক। ক'নে-সাজান-কার্য্যে যে রমণী গ্রামের অদ্বিতীয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা, তিনিই অবশ্য আপন পছন্দ ও দশের পরামর্শ লইয়া গৌরীকে সাজাইলেন;—কিন্তু তিনিও কি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন? না, এমন অবস্থায় কেহ পরিতৃপ্ত হয় না;—রূপের প্রতিমাকে সাজাইয়া কেহ মনের সাধ মিটাইতে পারে না।—সেই প্রস্ফুটিত চম্পকদল তুল্য সুগঠিত কপোলে ও গণ্ডস্থলে সুবাসিত সচন্দন অলকা-

তিলকা শোভিত হইল;—সুকুঞ্চিত সুবাসিত ঘনকৃষ্ণ কেশদামে যেন ভ্রমর নৃত্য করিতে লাগিল;—ক'নের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া, রত্ন-অলঙ্কার ভেদ করিয়া, যেন চন্দ্রমা-রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল;—গৌরী যেন সত্যই গিরিরাজ-সুতা গৌরীরূপেই সকলের চক্ষে বিরাজ করিল; —কিন্তু এত যে শোভা, এত যে সৌন্দর্য্য, এত যে সাজ-সজ্জা,—তাহা দেখিয়া, প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভাবিকার মন উঠিল কি?—'যেন আরো কিছু হইলে ভাল হইত; যেন আরো কোনরূপে সাজাইলে এ প্রতিমা মানাইত।'—এই রকম একটা ভাব তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

এই সৌন্দর্য্যানুভাবিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা,—গৌরীর সেই পিসী। যিনি গৌরীকে প্রাণের সমান ভালবাসেন, —সেই পিসী। যাঁহাকে বিধবা জানিতে পারিয়া, সেই বিধবা-কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে, গৌরীর একদিন বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল,—সেই সহৃদয়া স্নেহবৎসলা পিসী। বিধবা হইলেও, পিসীর সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি প্রবলা ছিল। এ সৌন্দর্য্য-বোধ, কুৎসিত পার্থিব-চিন্তা হইতে নহে,—পারমাত্মিক ও পারত্রিক-চিন্তা হইতে এই সৌন্দর্য্যানুভব উদ্ভূত হইয়াছিল।

সেই পিসী দেখিলেন, এই সজীব প্রতিমার সব সাজ

একরূপ সাজান হইয়াছে,—কিন্তু একটি সাজ এখনো বাকী আছে,—প্রতিমার পদে পদ্ম নাই!

[illegible] পিসী, অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম আনিয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে, সেই সজীব প্রতিমার পায়ে দিতে গেলেন।

নিকটে গৌরী-জননী জয়দুর্গা দাঁড়াইয়া ছিলেন,—পিসীর এই কার্য্যে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি অতি ব্যগ্রতার সহিত পিসীকে বলিয়া উঠিলেন,—"দিদি, ও কর কি,—কর কি? এতে যে গৌরীর অকল্যাণ হ'বে?"

"এ্যাঁ, অকল্যাণ হ'বে? তাই ত, আমি কোথায় পদ্ম দিতে, কোথায় দিতে যাচ্ছিলুম?—মা, পদ্ম দুটি হাতে নাও,—দু'হাতে এ দুটি ধ'রে থাক;—আমি তোমায় দেখি!"

বিধবার দুই চক্ষু বাহিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। কিন্তু তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে; তিনি সপ্রতিভ হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ গললগ্নবাস, আর লোকলজ্জা-ভয়ে মাথা নোয়াইতে দিল না,—সেই বাস গলদেশ হইতে খুলিয়া পড়িল;—তিনি তাহাতে তাঁহার চক্ষু দুটি মুছিলেন।—গৌরী-জননী জয়দুর্গার এ দৃশ্য যেন বড় ভাল লাগিল না;—তিনি মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

বুদ্ধিমতী গৌরী এই ভাবটি লক্ষ্য করিল। পিসীর ও মায়ের—দুইজনের বিভিন্ন দুইটি ভাব লক্ষ্য করিল। মনে মনে সে সকলই বুঝিল,—কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। বিয়ের ক'নে,—আর কয়দণ্ড পরেই বিবাহ; এমত অবস্থায় কোন কথা বলা উচিত নয় বলিয়া, কিছু বলিল না। বিশেষ, একদিকে মা,—আর দিকে মাতৃস্থানীয়া পিসী।—এমত অবস্থায় বালিকা কি বলিবে,—কি বলিতে পারে? তবে পিসীর প্রদত্ত উপহার—সেই দুটি রাঙা পদ্ম পাইয়া যে, সে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহা পিসীকে অতি কোমল করুণাপূর্ণ মধুবর্ষিণী কথায় জানাইল। বলিল,—

"পিসী মা, আমিও মনে করিতেছিলাম, চুপি-চুপি বাগানে গিয়ে দুটি পদ্ম তুলে আন্‌ব। তা তুমি সত্যই আমায় প্রাণের সমান ভালবাস কিনা,—তাই আমার মনের সাধ, তুমি আপন মন দিয়ে বুঝেছ,—আর আমি না চাহিতেই, আমার হাতে ফুল দুটি এনে দিয়েছ।—এখন দেখ পিসী মা, তোমার ফুল হাতে নিয়ে আমি এই দাঁড়িয়ে আছি।"

পিসী।—দেখি মা, তোমায় দেখি।—হাঁ, দু' হাতে ঐ দুটি ফুল নিয়ে, অমনি ক'রে দাঁড়াও,—আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি! তোমায় মা, এ মূর্ত্তিতে দেখিতে, আমার বড় ভাল লাগে।—বউ, তুইও দেখ্‌,—তোর বড় সাধের গৌরীর কি শোভা হ'য়েছে,—দেখ্‌।

আবার পিসীর চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল;—পিসী কৌশলে সেই জল-ফোঁটাটি মুছিয়া ফেলিলেন।

গৌরী বলিল,—"পিসী মা, তুমি আমায় বড় ভালবাস কিনা,—তাই অমন ক'রে আমায় দেখ্‌চ।—না?"

পিসী। তোমায়, আমি ভালবাসি?—শুধু আমি কেন মা,—পথের পথিকও তোমায় দেখ্‌লে ভাল না বেসে থাকৃতে পারে না।—আমরা পিসী-মাসী,—আমরা যে তোমায় ভালবাস্‌ব,—এ আর বেশী কথা কি?—এখন যাও মা, ঐ বারান্দায় গিয়ে একটু ব'সো। সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা কর্‌বে।

মনে মনে বলিলেন,—"আহা, বাছারে! তুই আর্-জন্মে আমার কে ছিলি, জানি না। সত্য বল্‌চি, তোকে দেখ্‌লে আমার চোখে জল পড়ে। তোর মুখে, কি ঐ মাখানো আছে মা,—যা দেখ্‌লে আমি সংসার ভুলি,—সম্পর্ক ভুলি,—আমার আপনাকেও আমি ভুলে যাই। জানি না মা, তুই জগতের-মা, উমা কিনা?—নহিলে, তোর প্রতি আমার মন এমনভাবে টানে কেন?"

পিসী আবার আপন অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিলেন। একবার মনে হইল, সেই অঞ্চল দিয়া, মনের সাধে গৌরীর রাঙ্গা পা দু'খানি মুছাইয়া দেন,—পরক্ষণে

চমক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভাবিলেন,—“না, ক্রমেই বড় বাড়াবাড়ি হ’য়ে প’ড়্চে দেখ্‌ছি;—মনের এমন অবস্থায় আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়।”

পিসী, গৃহ-কার্য্য-ব্যপদেশে, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

গৌরী ভাবিল,—“এই পিসী, এ আমার আপনার হ’তেও আপনার।—আমায় বড় ভালবাসে।—প্রাণের সমান আমায় দেখে।—ইহার ভাল করিতে হইবে। পিসীই আমার জীবনে প্রথম সুখদুঃখের তরঙ্গ উঠাইয়াছিলেন।—পিসী বিধবা; বিধবার বড় কষ্ট;—আহা! সব থাকিয়াও কেউ নাই।—হাঁ, বড় কষ্ট।—এই পিসী আমায় আপনার মত দেখিয়াছে;—আমিও পিসীকে, ঠিক পিসীর-মত হ’য়ে দেখিব। কিন্তু সে দিনের বিলম্ব আছে।—দূর হোক্, আজ আর ও-সব কথা ভাবিব না।—আজ নাকি ও-সব কথা ভাব্‌তেও নেই। বিশেষ, মা জান্‌তে পার্‌লে রাগ ক’রবেন; পিসীকেও হয়ত ব্যথা দেবেন।—এ্যাঁ! আমার জন্যে পিসী ব্যথা পাবেন?—না, তা হবে না,—মাকে খুসী ক’র্‌তে হবে।”

এমন সময় গৃহস্বামী আত্মারাম অন্তঃপুরে আসিলেন। পুরনারীগণ কন্যাকে কিরূপ সাজাইলেন, দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ একটু জড়সড়

হইলেন,—তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

পিতাকে দেখিয়া গৌরী ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। আত্মারাম কন্যার প্রণাম লইবেন কি,—অন্তরের অন্তরে, অজ্ঞাতসারে, নিজেই সেই রূপ-প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার হৃদয়-পদ্মের সহস্রদলে জাগিয়া উঠিল,—যেন তাঁহার আরাধ্যা দেবী—সুন্দরী—কুলকুণ্ডলিনী-মূর্ত্তি! —মুহূর্ত্তকাল আত্মারাম অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় গৌরী-জননী—রত্নগর্ভা জয়দুর্গা সেখানে আসিলেন। স্বামীকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঈষৎ হাসি-হাসি মুখে বলিলেন,—"মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া, ও দেখিতেছ কি?"

আত্মারাম অতি ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন,—"কি দেখিতেছি, তাহা কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব? যাহা দেখিলে চোখে রূপ ধ'রে না,—রূপ উছলিয়া পড়ে,—আমি সেই অপরূপ রূপ দেখিতেছি! হায় মা তারা! এ রূপেরও আবার——না, ও কথা আর ভাবিব না।—জননি, ক্ষমা কর।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দেখিতেছি, মাকে কেমন মানাইয়াছে। তা মানায়েছে বেশ।—যিনি ক'নে সাজায়েছেন, তাঁর সাজানোর বাহাদুরী আছে।"

জয়দুর্গা। ঠিক গৌরী বেশে আমার সোণার গৌরীকে মানিয়েছে কি না বল?

আত্মারাম। বলিয়াছি ত, ক'নে সাজানোর বাহাদুরী আছে।—কিন্তু মা ভবানী কাল থেকে আমাদের 'পর' হ'য়ে যাবে।

গৌরী। সে কি বাবা, আমি তোমাদের পর হবো?—তা হ'লে আর আমার আপনার হ'বে কে?

আত্মারাম। মারে, বিয়ের আগে, সকল মেয়েই অমন ব'লে থাকে,—তারপর বাপ-মায়ের কথা বড় একটা মনে রাখে না।

গৌ। রীতা বাবা, আর-সকলের সঙ্গে আমার কথ ধরো?—আমি যে বাবা তোমা ছাড়া একদণ্ডও থাকি না?

জননী জয়দুর্গা এবার হাসি-হাসি মুখে, কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া, স্নেহপরিপ্লুত স্বরে বলিলেন, "এর পর থাক্‌বে মা,--এর পর থাক্‌বে। তা তাই থেকো মা,—তাই থেকো।—জন্ম-জন্ম মাথায় সিঁদুর দিয়ে স্বামীর-ঘরেই থেকো।"

মুহূর্ত্তের জন্য গৌরী মাথাটি একটু হেঁট করিয়া, চক্ষু দু'টি ভূমিপানে ন্যস্ত করিল।

পিতা বলিলেন, "ভবানী, তোমার গঙ্গাজলের বাড়ী থেকে কি তত্ত্ব এয়েছে, আমায় দেখালে না?"

গৌরী। "তুমি দেখনি বাবা? হাঁ মা, বাবাকে তুমি আমার 'গঙ্গাজলের' তত্ত্ব দেখাও নি?

জয়দুর্গা।—তত্ত্বের অন্য উপকরণ উনি সব দেখেছেন,—কেবল তোমার গঙ্গাজলের নিজের তৈয়েরী মাটীর খেল্‌না দেখেন্ নি।—তুমি, তা আসবামাত্র শোবার ঘরে নিয়ে গেছিলে।

গৌরী।—হাঁ, তাই বটে।—তা বাবা, আমি সেই খেল্‌না এনে দেখাচ্ছি।

গৌরী, খেল্‌না আনিতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

জয়দুর্গা স্বামীকে বলিলেন,—"তা, মাকে তুমি আজিকের দিনেও ভবানী বল্‌বে?"

আত্মারাম।—আজ কি, আর কাল কি, ভবানীকে চিরদিনই আমি ভবানী বলিব।

জয়দুর্গা।—আচ্ছা, কেন তোমার এ জেদ্? ভবানী নামটা কেমন বুড়ুটে-বুড়ুটে পানা নয়? আহা, অমন পদ্মকলি সোণার-চাঁপা মেয়ে,—সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপ,—অমন মেয়েকে 'গৌরী' না ব'লে, তুমি এই বিয়ের দিনেও ঐ বুড়ুটে নামে ডাক্‌বে?

আত্মারাম মনের ভাব মনে রাখিয়া, একটু শুষ্ক-হাসি হাসিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না।

জয়দুর্গা পুনরায় যেন একটু কাতরতার সহিত "

বলিলেন,—“দেখ, ঠিক আট বছরে গৌরীর-আমার বিয়ে হ’চ্ছে; লোকে কথায় বলে, ‘আটবছরে মেয়ের বিয়ে দিলে গৌরীদানের ফল হয়’; আমাদের এ সত্যিকের গৌরী,—রূপে গুণে যেন গৌরী-প্রতিমা,—বয়েসও আট;—আমাদের সত্য সত্যই গৌরীদানের ফল হবে।—তবে তুমি মেয়েকে ঐ বুড়ুটে নামে ডাক্‌বে কেন?”

আত্মারাম প্রকৃত মনের কথা না ভাঙ্গিয়া বলিলেন, “আর না ডেকে উপায় নাই,—ঐ নামে মেয়ের বিয়ের লগ্ন-পত্র অবধি হ’য়ে গেছে।”

জয়দুর্গা।—তা হ’য়ে থাকে হ’য়েচে,—সম্প্রদান তুমি ‘গৌরী’ নামে ক’রো।—দেখ্‌তে শুন্‌তে—সব রকমে মানাবে ভাল।—চুপ ক’রে রইলে যে?

আত্মারাম।—তা আর হয় না।

জয়দুর্গা।—হয় না কেন?—তুমি মনে ক’ল্লেই হয়।

আত্মারাম।—উঁহুঁ।

এবার জয়দুর্গা কিছু দুঃখিতভাবে বলিলেন,—“দেখ, তুমি স্বামী, আমার ইষ্টদেবতা,—বার বার তোমার ইচ্ছার অমতে চলা আমার ভাল দেখায় না;—কিন্তু মার আমার ঐ গৌরী নামই যেন মানায় ভাল।”

আত্মারাম।—মানায় যে ভাল, তা আমিও জানি। কিন্তু তুমি দুঃখিত হইও না। কোন বিশেষ কারণে,

আমি কন্যার এই ভবানী নাম রাখিয়াছি,—আর সেই নামেই তাকে সম্প্রদান করিতে চাহিতেছি, জানিও।

এবার আর জয়দুর্গা দ্বিরুক্তি করিলেন না। বুঝিলেন স্বামীর এই ইচ্ছার মূলে, তবে সুনিশ্চিতই কোন গূঢ় অর্থ আছে। তিনি বলিলেন—"তা তুমি যখন অমন কথা বলিলে, তখন আর আমি এমন ইচ্ছা করিব না। তুমি ঐ ভবানী নামেই কন্যা-সম্প্রদান ক'রো। আমিও গৌরীকে ঐ নামে ডাকিব কি?"

আত্মারাম।—সে তোমার ইচ্ছা। না, তুমি গৌরী নামেই সম্বোধন করিও।

অদূরে কন্যাকে দেখিয়া, জননী আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দেখ, মা আমার ঠিক গৌরী-প্রতিমার মতই এই দিকে আস্‌ছে।"

আত্মারাম দেখিলেন,—প্রতিমাই বটে! সচল অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি,—জাগ্রৎ প্রতিমা! কিন্তু, ও কি, ও! প্রতিমার পশ্চাতে, ঐ ধূসর ধূমাবতী মূর্ত্তির মত, ও কে ও,—চকিতের ন্যায়, দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল? না, বুঝি দৃষ্টিভ্রম? হাঁ, ঐ যে লুকাইল,—ঐ যে স্পষ্ট দেখা দিল?—একি, আবার?

মুহূর্ত্তের জন্য আত্মারাম চক্ষু নিমীলিত করিলেন;—

অন্তরের অন্তরে 'তারা'-নাম জপ করিতে করিতে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

গৌরী নিকটে আসিয়া ছল্ ছল্ চোখে মাকে বলিল,—"মা, আমার কাজলনতা কোথায়?"

"এ্যা! সে কি!"

জননী চমকিতা,—যেন একটু ভীতা হইলেন। বলিলেন, "এ্যা! সে কি, মা! তোমার কাজলনতা ত তোমার সঙ্গেই ছিল?"

"এখন আর দেখ্‌তে পাচ্চি না।"

"সে কি মা! কোথায় গেল?"

জননী জয়দুর্গা অতিমাত্র ব্যাকুলা হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে এই কথা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে—"সেকি, সেকি" বলিয়া, একই রকমের উত্তর দিল।—"তবে কি হ'বে মা" বলিয়া জয়দুর্গা, সেই শত শত নিমন্ত্রিতা রমণীর সহানুভূতিশীতল সান্ত্বনাবাণীর উপর যেন কন্যার মঙ্গলামঙ্গলের নির্ভর করিতে লাগিলেন। কেননা, তাঁহার সংস্কার, বিয়ের আগে এই মাঙ্গলিক-চিহ্ন হারাইয়া যাওয়া, একটা ঘোর দুর্লক্ষণ। এমত অবস্থায় জননীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল, তাহা জননীই বুঝিলেন।

আর আত্মারাম? সবিশেষ দেখিয়া শুনিয়া, তিনি

একরূপ 'পরমহংস-বিশেষ' হইয়া গিয়াছেন। বিপদ সম্পদ—এ দু'য়েই যেন তিনি আর বড় একটা নূতন কিছু দেখেন না। তাই ধীর ও প্রশান্তভাবে তিনি পত্নীকে বুঝাইলেন,—

"ছি, সামান্যার ন্যায়, ও কর কি? তোমার বাড়ীতে আজ এই শত শত আত্মীয়-কুটুম্বের সমাবেশ,—বাহিরে লোকে লোকারণ্য,—আর কয় দণ্ড পরেই কন্যার শুভ-বিবাহ,—এমন সময় সামান্য একখানা 'কাজলনতা' হারানো উপলক্ষে, তোমার এ আকুলি-ব্যাকুলি ভাব কি শোভা পায়? ইহাতে যে সকলকে একরূপ অমর্যাদা করা হয়? মনে মনে অনেকে, এজন্য যে কুণ্ঠিতও হইতে পারেন? মঙ্গল বা অমঙ্গল সে ত ভগবানের হাত;—তা সে জন্য তুমি অমন অস্থির হও কেন? মা-মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ কর, সকল দুর্ভাবনা দূর হ'বে।"

পরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "মা ভবানী! ইহাই তোমার প্রাক্তন-ফল। ঐ ধূসর ধূমাবতী মূর্ত্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া, নিশ্চয়ই তোমার মাঙ্গলিক চিহ্ন লুকাইয়াছে।—আমার মন স্পষ্টই একথা বলিতেছে। বুঝিলাম, ইহাই দৈবের ছলনা।—জননি, অন্নপূর্ণে! সূচনাতেই সব প্রকাশ করিলে? কর মা, কর,—আর

আমি তোমার বিধানে আস্থাহীন হইব না। মঙ্গলময়ি! তুমি যা করিবে, তাহাই মঙ্গলের জন্য,—ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।"

সকলের মুখের ভাব-গতিক দেখিয়া, এবার গৌরী বড় কাঁদ-কাদ মুখে মাকে ডাকিল,—"মা!"

জননী স্নেহবিগলিত হৃদয়ে কন্যাকে বুকে ধরিয়া বলিলেন, "কি মা,—কেন মা?"

"মা, তবে কি হ'বে?"

"কি আর হ'বে মা,—তোমার সোনার কাজলনতা গিয়েছে,—হীরের কাজলনতা হ'বে।"—আত্মারাম উৎসাহ সহকারে এই কথা বলিয়া, স্নেহভরে কন্যার চিবুক স্পর্শ করিলেন।

মনে মনে বলিলেন,—"মা, এমনি যে একটা কিছু হইবে, তাহা আমি জানিতাম। সেই জন্যই তোমার স্নেহময়ী গৌরী-নামের পরিবর্ত্তে, ভক্তিময়ী ভবানী নাম আমি রেখেছি।—মা, এই নামই তোমার সর্ব্বাংশে মানাইবে জানিয়া, আমার অন্তরাত্মা তোমার এই নাম রাখিয়া দিয়াছে।—আমি পরের কথা শুনিব কেন?—এখন যাও মা ভবানী, এই অখণ্ডনীয় প্রাক্তন ও জন্মার্জ্জিত উচ্চ তপস্যা লইয়া, রাজ-গৃহে অধিষ্ঠাত্রী হও জননি!—তোমার কল্যাণে তোমার শ্বশ্রূ-কুল উজ্জ্বল হইবে;

হিন্দুসমাজ পবিত্র হইবে ;—সমগ্র বঙ্গদেশ ধন্য হইবে।—পিতার এ আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবে না মা!"

ধর্ম্মাত্মা পিতার শুভ আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, তবে যাও ভবানি! নাটোর-রাজ-পরিবারে মিশিয়া যাও! তবে যাও লক্ষ্মী-স্বরূপিণি! বঙ্গের ঘরে ঘরে সতী-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইয়া, ধরায় অমরী হইতে যাও! তবে যাও অন্নপূর্ণা-রূপিণি! জননীর হৃদয় লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ;—কোটী কোটী জীবে অন্নজল দানে সুশীতল কর ;—তোমার পুণ্যে ধরার ভার লাঘব হউক,—করুণার জয় হউক,—সর্ব্বজীবের মঙ্গল হউক ;—ইহলোকে তুমি অতুল যশস্বিনী ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয়কারিণী দেবী হইয়া, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পূজা পাইতে থাক।—তোমার পিতৃ-আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রপুরী তুল্য বিবাহ-আসর সজ্জিত হইয়াছে। কন্দর্প-তুল্য বর—বরের আসনে শোভা পাইতেছে। চারিদিকে পাত্র মিত্র অমাত্য আত্মীয়বর্গ বেষ্টিত রহিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক বরকে দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। পুরাঙ্গনাগণ গবাক্ষের ফাঁক দিয়া, কেহ সাঁবিয়ানার ছিদ্র দিয়া, আর কেহ বা সূক্ষ্ম চিকের কাঠী সরাইয়া, বরকে দেখিতে লাগিলেন। কোন কোন অতি-কৌতূহলাক্রান্তা রমণী, এ উপায়েও সাধ মিটাইতে না পারিয়া, ছদ্মবেশিনী হইয়া দাসীমহলে মিশিলেন, এবং অতি কষ্টে, কোনও রকমে পুরুষের ভিড় কাটাইয়া, অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া, একটু হুমড়ী খাইয়া, বরের মুখ খানি দেখিয়া লইলেন, এবং তদবস্থায়

সেইখানে দাঁড়াইয়াই, সঙ্গিনীর সহিত তাহার সাদা-মাটা এক-প্রস্ত সমালোচনা করিয়া লইলেন।

বর বিবাহ-সভায় আসিলে, শঙ্খ ও হুলুধ্বনি এক-দফা হইয়া গিয়াছে,—বিপুল বাদ্যভাণ্ডও বুঝি তাহার নিকট পরাভব মানিয়া গিয়াছিল। যাঁহাদিগের সে ধ্বনি শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই,—তাঁহারা এইবার তাহা শুনিয়া লউন,—অনেক দিন তাহা মনে থাকিবে।

স্ত্রী-আচারের সময় হইয়াছে,—বরকে যথারীতি পরম সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল।—প্রকাশ্য ভাবে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, পরের অন্দরে বর মহাশয়ই যাইতে পান,—তাহাতে সমাজ বা রাজ-শাসনের এমন একটিও বিধি নাই যে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারে। বরং এই অন্দর-গমনে কোন কারণে বর মহাশয় গর্‌রাজী হইলে, অন্দরস্বামীই তাঁহাকে সমাজ ও রাজশাসনের অধীনে আনিতে পারেন।—বিবাহের দিন বরের এত খাতির ও এত মান্য!—সেদিন তিনি 'বর' কিনা?—তাই এত আদর-আপ্যায়ন পান।

পরন্তু, এই বরের পাছু ধরিয়া,—ভাই, বোনাই, বা এমনি একটা কিছু পরিচয় দিয়া, গুপ্তভাবে অন্দর-প্রবেশ করিতে গিয়া, সময় সময় কোন কোন বেয়াড়া বদ-রসিক,—রীতিমত উত্তম-মধ্যম খাইতে খাইতেও রহিয়া

যান,—কখন কীলটা চড়টা কাণমলাটা অবধিও বেমালুম হজম করেন,—কখন বা তাহারও অধিক ঘটিয়া থাকে,—কীল, লাথি হইতে জুতা, ঝাঁটা পর্য্যন্ত পিঠে দমাদম্ পড়িয়া যায়;—বেহায়াদের তখন হুঁস হয় যে, ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকিয়া প্রকৃতই বড় অন্যায় করিয়াছিল। হুঁস হয় এই জন্য যে, কি কন্যাপক্ষ আর কি বরপক্ষ,—কাহারো নিকট আদৌ সহানুভূতি পায় না,—পরন্তু যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও ধিক্কারলাভ হয়।—এই শ্রেণীর একদল জীব, আজিও সমাজ-শরীরে বড় প্রচ্ছন্নভাবে মিশিয়া আছে বলিয়া, কথাটা এমন ভাবে এখানে পাড়িলাম।

তা এ শ্রেণীর ছুচ্ছুন্দর জাতীয় জীব জুতা-ঝাঁটা খাইয়া যতই নিগ্রহ ভোগ করুক,—বর মহাশয়ের কিন্তু আজ আদর-আপ্যায়নের চরম আয়োজন।—এক সুন্দরীতে রক্ষা নাই,—আজ শত সুন্দরী তাঁহাকে ঘেরিয়া আছেন,—আদর-সোহাগ-স্নেহপূর্ণ মিষ্টকথা এবং মধুর হইতেও মধুর-তর—মধুরতম সম্ভাষণ—যা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই,—আজ বিনা আয়াসে, বিনা ইচ্ছায় লাভ করিতে-ছেন। তবে মধ্যে মধ্যে এক আধটা উগ্র-মধুর কর্ণমর্দ্দন-পাল আছে বটে। তা সেটাও, সুন্দরি-করপদ্মনিঃসৃত ভাবিয়া উপেক্ষা করিলেও করা যাইতে পারে।

'বর' কিনা—যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। বিবাহের বর, ঐ

বিবাহের দিনেই শ্রেষ্ঠ ;—অন্য দিন আর নয়। সেদিন তাঁহার আসন শ্রেষ্ঠ, বসন শ্রেষ্ঠ, ভূষণ শ্রেষ্ঠ, আদর শ্রেষ্ঠ, আপ্যায়ন শ্রেষ্ঠ,—সম্বন্ধ আবার শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর ;—সেদিন তাঁহার সহিত কাহারো তুলনা হইতেই পারে না। সে দিন তাঁহার তুলনা—তিনি। কেননা, তিনি 'বর'।

বরের এত মান্য—এত আদর কেন, জান? সম্পূর্ণ অপরিচিত ও খুব দূর-পরকে,—বিন্দুমাত্রও রক্তের সম্পর্ক না থাকে,—এমন পরকে,—প্রাণের সমান ভালবাসিয়া, এবং প্রাণাধিক সন্তানের তুল্য বিশ্বাস করিয়া,—আপন স্নেহের নিধি—বুকের ধন—কন্যারত্নকে জন্মেরমত সঁপিয়া দিতে হয়। ভগবানের হস্তে আপন অদৃষ্টের—মানুষের যতটা নির্ভর ও বিশ্বাস, একটা পরের পর—তস্য পর—ব্যক্তিকে কন্যাদান, তাহা অপেক্ষা কম নির্ভর ও বিশ্বাসের কাজ বলিয়া, আমার মনে হয় না। ব্যাপার বড় সহজ মনে করিবেন না।—অন্য ধর্ম্মের পক্ষে যাহাই হউক, আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মে, কন্যাদান তুল্য গুরুতর দায়িত্ব, গৃহীর আর নাই। ভাবুন, একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জীবনের সহিত—সেই অজ্ঞাত জীবনের অদৃষ্ট-সূত্রের সহিত,—একরূপ চোক-কাণ বুজাইয়া, বুক ঠুকিয়া, প্রাণাধিকা দুহিতার জীবন-সূত্র গ্রথিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার হাতে কন্যাকে সঁপিয়া দিবে,

তাহার সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, জীবন মরণের সহিত কন্যারও ঐ গুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।—ব্যাপার কি গুরুতর, ভাবিয়া দেখুন।

অপর পক্ষে, যিনি ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া কন্যা গ্রহণ করিলেন, তাঁহার দায়িত্ব আরও গুরুতর। সে গুরুত্ববোধ সকলেই অল্পবিস্তর করিয়া থাকেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না।

তা এমন যে বর, তাহাকে সর্ব্বাংশে প্রাধান্য দেওয়া হইবে না? বিশেষ এই একটি দিনের জন্য,—দণ্ড-কয়েক সময়ের নিমিত্ত। যে, আজীবনের জন্য অত-বড় একটা দায়িত্ব মাথায় করিয়া লইল,—অজিকার দিনে,—সে সর্ব্বরকমে প্রাধান্য পাইবে না ত, আর কে পাইবে, বা পাইতে পারে,—অথবা কার পাওয়া উচিত?

সামান্য এক দিনের এই হাসি, বাঁশী, গল্প, গাথা, অথবা গান শুনিয়া,—এক দিনের এই একটুখানি আদর, আপ্যায়ন, স্নেহ, ভাব, মাধুরী স্মরণ করিয়া, যাহাকে আজীবন সংসারের কঠিন রণে যুঝিতে হইবে, সেই যদি না বর অর্থাৎ প্রধান হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারে তার দাবী-দাওয়া না অধিক হইবে, ত আর কাহার প্রাধান্য বা দাবী-দাওয়া সম্ভবে? শিকারী যেমন, মধুর মোহন স্বরে বাঁশী বাজাইয়া, মুগ্ধ হরিণশিশুকে জালবদ্ধ করে, তেমনি সমাজও

এক হিসাবে,—সরল, শান্ত, সাংসারিক-জ্বালাযন্ত্রণাহীন যুবাকে 'বর' সাজাইয়া,—বিপুল বাদ্য-ভাণ্ড সহ সমারোহ ব্যাপারের অবতারণা করিয়া,—চাক্‌চিক্যময় মহা আড়ম্বরের আবরণে তাহাকে ভুলাইয়া, আপন জালে ফেলিয়া, গৃহী করিয়া লয়।—এহেন বরের এই এক দিনের প্রাধান্যটুকুও যে সহিতে না পারে, তাহার লোকালয় ছাড়িয়া, বনে বাস করাই উচিত। আর যে, সেই বরের দণ্ডেকের —সুন্দরী সখীবৃন্দের প্রতি পাপদৃষ্টিতে চায়, তাহার চোখ্ দুটা উপাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্ত্রীআচার-কার্য্য সম্পন্ন হইলে, বর-রূপী—পরম রূপবান্ রাজকুমার রামকান্ত, বিবাহের মন্ত্রপাঠ করিতে, পুরোহিত-সম্মুখে, আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে তখনও জাগিতেছিল,—সেই—শুভদৃষ্টি। কি পুণ্য-পবিত্রতা শান্তি-সরলতাময়—সে দৃষ্টি! যেন হৃদয়ের একটা ঘন আবরণ চিরদিনের মত উন্মুক্ত হইয়া গেল;—যেন দূর অতীতের বিস্মৃতিপ্রায় একটি সোনার স্বপ্ন সম্মুখে জাগ্রৎবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল;—যেন অলকায় মন্দাকিনী-তীরে কোন দেববালার সহিত অপরূপ শৈশব-খেলা খেলিতে খেলিতে, কাহার ছলনায় পথ ভুলিয়া, তিনি এ সংসার-প্রান্তরে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন,—আবার সেই দেববালার সহিত সম্মিলন হইল,—এমনই একটা মধুর

স্মৃতি তাঁহার মনে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সেই বালা যেন তাঁহার হৃদয়-দ্বারে দাঁড়াইয়া, বড় মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দেখ দেখি, আমি কে?—আর আমাকে ভুলিয়া যাইবে?"—এমনই যেন একটা প্রাণময়ী আনন্দদায়িনী স্মৃতি—সেই শুভদৃষ্টির মধ্যে দীপ্যমান্ হইয়া উঠিয়াছিল,—আর সেই স্মৃতির মোহিনী শক্তিতে, মনে মনে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। পবিত্র স্ত্রীআচারের মুখ্য লক্ষ্য,—বর-কন্যার এই শুভদৃষ্টি। পরন্তু এই পুণ্যময় শুভদৃষ্টিতে, যে পামর-পামরী অলক্ষিত-ভাবে, কোনরূপে বাদ সাধিবার চেষ্টা পায়, তাহার সেই পরামাণিকের—সেই উদ্দেশে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার তুল্য গালা-গালি ও অভিসম্পাৎ প্রকৃতই ন্যায্য-প্রাপ্য বটে।

রামকান্ত মন্ত্রপাঠ করিতে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সম্মুখে স্বয়ং নারায়ণ—শালগ্রাম শিলা। তাঁহার সম্মুখেই মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে। পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যদিকে বিচিত্র পট্টবস্ত্রমণ্ডিতা, রত্নালঙ্কারভূষিতা, করুণাময়ী, সোনার গৌরী সমাবিষ্টা। সে অপরূপ রূপপ্রভায় শত শত উজ্জ্বল দীপালোকও বুঝি ম্লান হইয়াছে। আত্মারাম নিজেই কন্যা-সম্প্রদান করিতে বসিয়াছেন।—কন্যা না প্রতিমা? ভাগ্যবান্ রাজকুমার এ প্রতিমা লাভ করিবেন।

প্রতিমার মনে তখন উদয় হইতেছিল,—"এই বিবাহ? এই বিবাহেই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ হয়? এই আমার বর? আহা, কি জ্যোতির্ম্ময় মনোহর রূপ! মা বলিয়া দিয়াছেন,—আজ হইতে ইনিই আমার স্বামী, ইষ্টদেবতা, ইহকাল-পরকালের সহায়, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। আজ হইতে আমায় ইহাঁর সেবিকা—দাসী হইতে হইবে।—পাদ্য-অর্ঘ দিয়া নিত্য ইহাঁর চরণ পূজা করিতে হইবে।—মা, তোমার আশীর্ব্বাদই যেন সফল হয়;—আমি যেন জীবনে মরণে, কায়মনোপ্রাণে, এই স্বামি-পদ সার করিতে পারি।"

পুরোহিত মন্ত্র পড়াইয়া যাইতেছেন, আত্মারাম ভক্তি-গদগদকণ্ঠে, তদ্গতচিত্তে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চিত কলেবরে, একবার প্রাণাধিকা কন্যার পানে, আর বার নব-জামাতার পানে, চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "মা জগজ্জননি! যেন এ মণি-কাঞ্চন-যোগ সার্থক হয়। জগদম্বা, মুখ রেখো।—আমার ভবানীকে ভা-গ্য-ব-তী ক'রো।"

আবার সেই 'ভাগ্যবতী' কথা; আবার এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সেইরূপ স্বর-কম্পন।—আত্মারাম একটি ক্ষুদ্রনিশ্বাস ফেলিলেন।

যথানিয়মে, নির্ব্বিঘ্নে মন্ত্রপাঠাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। এইবার অগ্নি-সাক্ষী-ক্রিয়া ও বরকর্ত্তৃক কন্যার সীমন্তে

সিন্দুর-স্পর্শ-কার্য্য হইয়া গেলেই, শুভবিবাহ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সুসম্পন্ন হইয়া যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই দুই শেষ মাঙ্গলিক কার্য্যেই একটু বিঘ্ন ঘটিল।—ভাবী পত্নীর সীমন্তে সিন্দুর লেপন করিতে গিয়া, বরের হাত হইতে সেই সিন্দুর-পাত্র পড়িয়া গেল। আর ও-দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল পুরোহিত অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বর-কন্যা আসন হইতে একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইল। সেই সময় হঠাৎ, সেই আহুতি-উত্থিত একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কন্যার পরিধেয় বস্ত্রে সস্পৃষ্ট হইল। তাহাতে সেই সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র নিমেষ মধ্যে অনেকটা পুড়িয়া গেল।

"হায়, একি!" বলিয়া পুরোহিত সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন।

অন্যে যত না হউক,—আত্মারাম এই দুইটি বিষয় নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার নূতন কোন উদ্বেগ বা আশঙ্কা আসিল না।—তখন তিনি এ দু'য়ের অতীত হইয়া গিয়াছেন। তাই মনে মনে "তারা, তারা" বলিতে বলিতে, তিনি একটু হাসিলেন। বিধাতার অব্যর্থ বিধান দেখিয়া, হাসিলেন। কন্যার জন্মদিনেও এমনি একটু হাসি—তিনি হাসিয়াছিলেন,—

আজিও সেইরূপ হাসিলেন। অবশ্য বর বা বরপক্ষীয়গণ—অথবা আর কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

আত্মারাম মনে মনে বলিলেন,—"মাগো, এইরূপেই তুমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক? বীজ রোপণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিণতি ও ফল—ঠিক করিয়া রাখ? তবে আর জীব—কি? তারের-পুতুল ছাড়া,—আর কি? তাকে তুমি যেমন নাচাও, সে তেমনি নাচে মাত্র।—মাগো, আমাকে আর নাচাইও না, আমাকে ডাকিয়া লও মা,—আমার মনুষ্য-জন্মের সাধ মিটিয়াছে।"

এবার ভক্তের চক্ষু-কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিল। "চোখে বুঝি কি পড়িল" বলিয়া, তিনি কৌশলপূর্ব্বক সেই জলটুকু মুছিয়া ফেলিলেন,—কাহাকেও কিছু বুঝিতে দিলেন না।

বিবাহ হইয়া গেল। ঘোর রোলে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল। পুরাঙ্গনাগণ হাসিমুখে, মনের সুখে বর-ক'নে লইয়া বাসর-ঘরে গেলেন। বাসরের শোভা অতুলনীয়া; কিন্তু তাহা বর্ণনার স্থান ইহা নহে। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, স্বর্গের সুষমারূপে, ধরাবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিল। দিকে দিকে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল।

বৈবাহিকে বৈবাহিকে কোলাকুলি হইল; বরযাত্রী-

কন্যাযাত্রীদের মধ্যে এবার সম্বন্ধ ধরিয়া, নানারূপ মিষ্ট-কটু-কথায় আলাপ-পরিচয় চলিল; বারোয়ারী-গ্রামভাটীর পাণ্ডাগণ বরকর্ত্তার নিকট 'ধন্না' দিয়া পড়িয়াছিল; এখন সেই ধন্নার পর্য্যাপ্ত পুরস্কার পাইল। ভোক্তাগণ মিষ্টান্ন-স্রোতে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।—চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ রব পড়িয়া গেল।

যে সময়ে ভবানীর বিবাহ হইয়া গেল, সেই সময়ে আত্মারামের পুরাহিত-বাড়ীতে শিবানীর বিবাহও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। পুরোহিত-কন্যার বিবাহের যাবতীয় ব্যয় আত্মারাম দিয়াছিলেন। একই সময়ে, একই লগ্নে, দুই কন্যার শুভ বিবাহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দুইজনের বিবাহও যথানিয়মে হইয়া গেল। কিন্তু কি জানি, কাহার ইচ্ছায়, কোন্ কারণে, দুইজনের অদৃষ্টে দুই বিভিন্ন ফলের সূচনা হইল। কার কতদুর কপাল-জোর, তাহা সেই ফল দেখিয়া বুঝা যাইবে।

এখন, ভবানি! তোমার বড় সাধের 'গৌরী'-নাম আজ হইতে ঘুচিল। তোমার পিতা, তোমায় যে নামে সম্প্রদান করিলেন এবং তুমি যে নামে রাজসংসারে পরিচিতা হইলে,—এখন হইতে আমরা তোমাকে সেই নামেই অভিহিত করিব।

তবে যাও, রাজকুললক্ষ্মী! পতি-গৃহ গিয়া উজ্জ্বল

কর! এতদিন তোমায় বালিকারূপিণী দেবীমূর্ত্তিতে দেখিয়া জীবন সার্থক করিলাম,—এইবার তোমায় আদর্শ-গৃহলক্ষ্মী-মূর্ত্তিতে দেখিব, মানস করিয়াছি। মাগো, মনের মানস তুমিই পূর্ণ করিও।

সেই দিন অতি প্রত্যূষে, অন্নপূর্ণার মন্দিরে, কে গাহিতেছিল,—

(ভৈরবী—বং।)

(ওমা) পারি না আর বইতে বোঝা,
আমার মনের মানস কেড়ে নে।
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,
দে মা আমায় ছুটী দে॥

ঘরের ছেলে ঘরে যাই মা,
আর বিত্তেতে কাজনি শ্যামা,
যারা চায় তাদের দেনা,
আমার গরব বাড়ে যে॥

আর বাড়িয়ো না পায়ে পড়ি,
খাওয়াবে কে বিষের বড়ি,
কেউ দেওয়াবে হাতে দড়ি,
তখন তাদের থ্যাকায় কে॥

দশ-হাতেই ঢের দিয়েছ,
দু'-হাতে আর দিবে কত,
গুটিয়েছ হাত, বেশ ক'রেছ,
(এখন) ভালয় ভালয় পালাই গে ॥

আর লোভ দেখাস্ নে তারা,
আবার হ'বো আপনা হারা,
দোহাই তোর—সারাৎসারা,—
আর যেন না আসে সে ॥

(ওমা) পারি না আর বইতে বোঝা,
আমার মনের মানস কেড়ে নে ॥

ইতি প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কিশোরী—রাজলক্ষ্মী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নব-নির্ম্মিত নাটোর-রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের উচ্চ-চূড়া শিল্পকার্য্য সংযুক্ত। অতি উর্দ্ধে, গগন ভেদ করিয়া, সে সৌধ-চূড়া বিরাজিত। প্রাসাদের চতুঃস্পার্শ বেড়িয়া গভীর খাদ। সেকালের গড়বন্দী বাড়ী। চারিদিকে মন্দির ও দেবালয় সংস্থিত। মধ্যে সুদৃশ্য, সুগঠিত, মনোহর রাজ-অন্তঃপুর। রাজ-অন্তঃপুর বিবিধ বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত। এই শোভান্বিত রাজ-অন্তঃপুর,—রাজলক্ষ্মী ভবানীর পাদস্পর্শে পবিত্র ও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

কমলার আবির্ভাবে, যেমন দিক্ প্রফুল্ল ও গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হয়; সর্ব্বকার্য্য সুশৃঙ্খলে ও সুনির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া, সর্ব্ববিষয়ই যেমন সুপ্রতুল ও সুমঙ্গলের আধার হয়;

সকলের দ্বেষহিংসা-বর্জ্জিত সদানন্দময় হাসিমুখ যেমন সকলের সহানুভূতি ও শুভদৃষ্টিলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে;—তেমনি লক্ষ্মীস্বরূপা ভবানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে,—বিপুল রাজ-পরিবারে শ্রী, শোভা, সম্পদ, প্রীতি, প্রসন্নতা, শান্তি—যেন পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভবানীর সে পুণ্যময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিলে, কাহারও মনে আর কোনরূপ খল-কপটতা বা পাপ-হিংসার আবির্ভাব হয় না। এই হিসাবে, মহারাজ রামজীবনের সংসার,—পরম পুণ্যের সংসার বলিতে পারা যায়, এবং এই হিসাবে, নবাগতা রাজবধূকে 'রাজলক্ষ্মী' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। নহিলে, ভবানীর বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই, রাজপরিবারের মধ্যে যে কলহ, আত্মদ্রোহ ও বিদ্বেষাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল,——কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে ভবানীর শান্তিময় সংসার-ধর্ম্মের দুই একটি কথা কলিব।

বিবাহের পর ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,—ভবানীর সে সোনার শৈশব আর নাই,—এখন সুখদুঃখময় কৈশোর অবস্থা। কিশোরী রাজলক্ষ্মীর সে অপরূপ রূপ,—এখন ষোলকলায় পূর্ণ।—যেন মূর্ত্তিমতী ভগবতী,—সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও আনন্দ লইয়া, পতিগৃহে বিরাজ করিতেছেন।

পতি রামকান্ত, ভবানীকে প্রাণের সমান ভালবাসিতেন। কিশোরীর রূপ দেখিয়া যে ভালবাসা, সে ভালবাসা নহে,—পতিপ্রাণা ভক্তিমতীর হৃদয়-আকর্ষণে যে পুণ্যময় অনুরাগ জন্মে,—সেই অনুরাগ-গুণে তিনি ভালবাসিতেন। সে ভালবাসায়, দুইজন দুইজনকে প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া রাখিলেন। দাম্পত্য-প্রেমের এ পবিত্র বন্ধন, ইহজীবনে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।

কিন্তু, এই ইহজীবন হইলেই কি সব হইল? অনন্ত-কালের তুলনায়, ইহজীবন কতটুকু? রামকান্ত মনে মনে বলিতেন,—"জগদীশ! যেন জন্ম জন্ম এ পুণ্য-প্রতিমা বুকে ধরিতে পারি।" ভবানী ভাবিতেন,—"এই স্বামী,—এই আমার ইহকাল-পরকাল,—এই আমার মূর্তিমান ঈশ্বর!—অন্তর্য্যামি! যেন এই ঈশ্বর-চরণ আমার জীবনে মরণে সম্বল হয়;—যেন এই চরণবলে আমার নারীজন্ম সার্থক করিতে পারি!"

কেবল মনে মনে এইরূপে বন্দনা করিয়াই ভবানী ক্ষান্ত নন,—প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় তিনি সচন্দন পুষ্পদলে স্বামি-পদ পূজা করিতেন। ভক্ত যেমন আরাধ্য দেবতাকে তদ্গতচিত্তে পূজা করে, সেই ভাবে তিনি পতি-দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। মনে মনে বলিতেন,—"হে দেবদেব! হে প্রাণেশ্বর! নিজগুণে যাহাকে দাসী বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছ, তাহাকে জন্ম জন্ম দাসী বলিয়াই মনে রাখিও,—ইহার অধিক প্রার্থনা আমার নাই।"

রামকান্ত ভাবিতেন,—এই দেবীদুর্লভ রূপ, এই অপরাজিতা ভক্তি, এই অলৌকিক পাতিব্রত্য,— ভগবন্! এ পুণ্য-প্রতিমা কি অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবে?"

রামকান্তের চক্ষে তখন টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত। পত্নীর পূজা সমাপনান্তে, তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইতেন।

সৌন্দর্য্য-রাণী ভবানী তখন হাসি-হাসি মুখে স্বামীর পদরেণু লইয়া মাথায় দিয়া বলিতেন,—"প্রাণেশ্বর! দাসীর মনের মানস সফল হইবে ত? বল প্রভু! আমার পূজা তুমি গ্রহণ করিয়াছ ত?"

রামকান্ত স্নেহভরে পত্নীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া, পত্নীকে বামে বসাইয়া, প্রেম-গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিতেন,— "প্রাণাধিকে, সত্যই বলিতেছি, আমি আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না,—তুমি কে? তুমি যেই হও, আমি ভাগ্যবান্ যে, তোমাকে প্রিয়তমা পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিয়াছি। কিন্তু হৃদয়েশ্বরি! এত সুখ অদৃষ্টে সহিবে ত?

ভবানী।—অমন কথা বলিও না নাথ! আশীর্ব্বাদ করিও, যেন ঐ পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া, হাসিতে হাসিতে

বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইতে পারি।—কৃপা করিয়া দাসীকে চরণে স্থান দিয়াছ, তাই না তাহার এই সম্মান?

ভবানী পতির পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

রামকান্ত রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন,—"পতিব্রতা সাধ্বীর মুখেই এমন কথা শোভা পায় বটে। গৃহলক্ষ্মী আমার! তোমার পুণ্যেই আমি পতিতপাবনী সনাতনীকে চিনিয়াছি। আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, যেন অচিরাৎ তুমি পুত্রবতী হইয়া, রাজপরিবারস্থ সকলের হৃদয়জাত আশা ও আনন্দের শুভসংযোগ করিতে পার।"

ব্রীড়াবনতমুখীর পবিত্র মুখ-কমলে রামকান্ত চুম্বন করিলেন;—লজ্জারাগরঞ্জিত হইয়া সে মুখশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রামকান্ত মুগ্ধনেত্রে, অনিমেষ নয়নে, সে শোভা দেখিতে লাগিলেন।

এমনই, প্রায় প্রতিদিনই হইত। এমনি আদর ও অনুরাগে এবং ভক্তি ও ভালবাসার সহিত, প্রায় প্রতি-দিনই, পতি-পত্নীর হৃদয়-কথা প্রকাশ পাইত।

বিবাহের পর রামকান্ত পত্নীকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, অসাধারণ প্রতিভাবতী ভবানী, অতি অল্প আয়াসেই, স্বামি-প্রদত্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু সেই শিক্ষা অপেক্ষা, জন্মার্জ্জিত

সংস্কার তাঁহার জীবনে অধিক কার্য্যকর হইয়াছিল। তাই তাহার এই শিক্ষার বিষয়, কাহারও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই।

রাজ-পুত্রবধূ হইলেও, দাস দাসী সদা যোড়-হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলেও, স্বামি-পরিচর্য্যা ও স্বামীর নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজগুলি, ভবানী নিজহস্তেই করিতেন,—কাহাকেও করিতে দিতেন না। প্রতিদিন স্বামীর পাদোদক, দেব-চরণামৃতবোধে পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সে সময়ে, তাঁহার সেই ভক্তি-গাম্ভীর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, রামকান্ত কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন,—তাহার মুখে আর বাক্যস্ফুরণ হইত না। তিনি মনে মনে বলিতেন,—"সত্যই কি ভবানী আমার স্ত্রী,—না ছদ্মবেশিনী কোন দেব-বালা—স্ত্রীরূপে আমায় ছলিতে আসিয়াছেন?"

স্বামীকে যেমন, বৃদ্ধ শ্বশুরকেও ভবানী সেইরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজ রামজীবন পুত্রবধূর সে পরিচর্য্যা ও সেবাব্রত দেখিয়া,—সাংসারিক সকল কার্য্যে বধূমাতার দূরদৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অপার আনন্দ-সলিলে নিমগ্ন হইতেন। বিশেষ, পরিবারস্থ সকলকেই ভবানী কি এক স্নেহসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন,—তাঁহার মাতৃভাব-পূর্ণ মধুর ব্যবহারে সকলেই কেমন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শান্ত ও পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া

বৃদ্ধের নয়ন-কোণে জল আসিত। ভবানীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী বহুপূর্ব্বে স্বর্গারূঢ় হইয়াছিলেন; সুতরাং ভবানীকে একরূপ বিয়ের ক'নে হইতেই এই এত বড় একটা বৃহৎ রাজ-সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে;—তথাপি সে সংসার এমন সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও পবিত্রতাময়। তাই বৃদ্ধ রামজীবন এত সুখী,—এমন আনন্দময়। এক এক দিন তিনি আপন মনের ভাব, বধূমাতার নিকট প্রকাশ করিয়াও ফেলিতেন। বলিতেন,—

"মা আমার! শুভক্ষণে তোমায় গৃহে আনিয়াছিলাম, তাই নাটোর-রাজপরিবারের এই সুখৈশ্বর্য্য সার্থক হইল। নাহলে এতদিনে মা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িত,—জমিদারী বাড়ী-ঘর সব ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া যাইত,—কাহারো সহিত কাহারো মনের মিল থাকিত না,—এ পুরী শ্মশানতুল্য হইত;—মা আমার! তুমিই করুণাময়ী দেবী-মূর্ত্তিতে আসিয়া সব রক্ষা করিলে।—হায়, গৃহিণী স্বর্গারূঢ়া;—আমারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে;—তোমাকেই মা এ সংসার-ধর্ম্ম রাখিতে হইবে। তা মা, তুমিও তা রাখিতে পারিবে;—রাজলক্ষ্মী দেবীজ্ঞানে তুমি সকলের হৃদয়ে আসন পাইয়াছ;—তোমার পুণ্যে সকলই রক্ষা পাইবে। আশীর্ব্বাদ করি মা, সৎপুত্রের জননী হইয়া পতি-পুত্র লইয়া, চিরায়ুষ্মতী হইয়া থাক।"

শ্বশুরের এইরূপ শুভ আশীর্ব্বাদ, স্বামীর পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চধারণা ও স্নেহ,—কুবেরের ভাণ্ডার তুল্য রাজার-সংসার, সে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী,—ভবানীর জীবন মধুময় হইয়া উঠিল;—পরিপূর্ণ অনুরাগে তিনি সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।
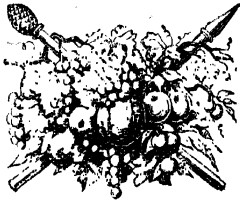
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনের এই মধুর প্রভাতে, শান্তিময় এই সুখ-বসন্তে, আপনার সাথীগণকে লইয়া থাকিতে, সকলেরই সাধ যায়। ভবানী এখন পতিগৃহবাসিনী; সুতরাং জনক জননী কিংবা পিতৃকুলস্থ আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাতের বড় একটা সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু বিধির বিধানে আর এক শুভ সাধে তিনি সফল-মনোরথ হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বাল্যের সঙ্গিনী, খেলা-ধূলার প্রিয়সহচরী, সুখে দুঃখে সমভাগিনী—শিবানীকে মনে করিলেই তিনি দেখিতে পাইতেন। শিবানী এখন রাজপুরোহিতের পুত্রবধূ; রাজবাটীর সন্নিকটেই তাঁহাদের বাস; সুতরাং ভবানী সেই শৈশবসঙ্গিনীকে, ইচ্ছা করিলেই, আপন বাটীতে আনাইতে পারিতেন। শিবানীও,

ভাবী রাজরাণীর সাদর আহ্বানে, শিবিকারোহণে, প্রায়ই সেখানে আসিতেন,—আসিয়া সুখী হইতেন।

বয়সে সমান ও শৈশবের খেলা-ধূলায় এক হইলেও, শিবানী মনে মনে, ভবানীকে বিশেষ ভক্তি করিত,—ভক্তিহেতু মান্যও করিত,—এমন কি সময়বিশেষে একটু ভয়ও করিত।—ভয় করিত? হাঁ, ভয় করিত। উচ্চ মনোবৃত্তির প্রভাব দেখিয়া,—সর্ব্বজীবে করুণা, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি অবলোকন করিয়া,—সম্ভ্রমজনিত মনে মনে একটু ভয়ও করিত বৈ কি? গুরুকে শিষ্য যে ভাবে দেখিয়া থাকে,—প্রণয়ে রঙ্গিণী এবং খেলায় সঙ্গিনী হইলেও,—শিবানী, ভবানীকে ঠিক সেই ভাবে দেখিত। বরং এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, সেই দর্শনজনিত ধারণা বা সংস্কার, ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। শিবানী আসিয়া, ভবানীর নিকট হইতে স্বামিভক্তি শিক্ষা করিয়া যাইত। কি করিলে স্বামী ধর্ম্মশীল ও পুণ্যাত্মা হয়; কি করিলে স্বামীর মন পবিত্র ও প্রফুল্ল থাকে; কোন্ উপায়ে স্বামীর পরোপকার-প্রবৃত্তি ও আত্মহিত-ইচ্ছা বলবতী হয়;—স্বামি-সেবাপরায়ণা সুশীলা শিবানী—ভবানীর নিকট সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিত। কারণ শিবানীর স্বামী কালীপদ শর্ম্মা,—লোক বড় সুবিধার নন।

শিবানী। বোন্, কি করিলে স্বামী আমার সৎ-

স্বভাবাপন্ন হন? কি করিলে গৃহে তাঁহার মন বসে;—অসৎ-সঙ্গে মিশিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হয় না;—বোন্, ভাল করিয়া তাহা আমায় বলিয়া বুঝাইয়া দাও।—আমি যেন তাঁকে সুখী করিতে পারি।

ভবানী। ভাই, কেহ কাহাকে শিখাইয়া বা বুঝাইয়া, তাহার অদৃষ্ট ভাল করিতে পারে না। যে যেমন ভাগ্য লইয়া আসিয়াছে, তাকে সেই মত ফল ভোগ করিতে হইবে। তবে ভাই, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবে, পতির বাড়া মহাগুরু স্ত্রীলোকের আর নাই। পতিই দেবতা, পতিই ঈশ্বর,—তোমার আমার আর দ্বিতীয় দেবতা কি দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই।—সেই পতিকে ভাল করিতে হইবে;—ধর্ম্মশীল, সংযতচেতা, পরোপকারী গৃহী করিতে হইবে;—বড় কঠিন সমস্যা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাই গঙ্গাজল! তুমি অমন আকুলি-ব্যাকুলি করিলে চলিবে না।—ইহা একদিনের কাজ নয়।

শিবানী। একদিনের কাজ নয় তা জানি। কিন্তু বোন্, আর কত দিন তাঁর এমন ভাব দেখিব? পাপমুখে গুরুনিন্দা করিতে নাই, কিন্তু ব্যথার ব্যথী তুমি,—তোমায় বলি,——

ভবানী বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্, আমায় আর তাহা বলিও না;—আমাকে তাহা তোমার বলিতে নাই;—আমারও তাহা শোনা উচিত নয়।"

শিবানী অবাক্ হইয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল; ভবানী বলিতে লাগিলেন,—"স্বামীর এমন অনেক দোষ বা গুণ থাকিতে পারে, যাহা কেবল স্ত্রীই জানে, আর স্ত্রীরও তাহা জানিয়া, মনে মনে রাখা উচিত। স্বামীর সদ্ব্যবহার-জনিত সুখ পাও, মনে মনে ভোগ করিবে; দুর্ব্ব্যবহার-জনিত দুঃখ পাও, মনে মনে তাহা সহিবে;—আর কাহাকেও তাহা বলিতে নাই। কথা প্রকাশ হইলে কাজ হয় না,—পদে পদে সে কাজে বিঘ্ন ঘটে।"

শিবানী। তবে কি গঙ্গাজল, তুমি আমার 'পর'?

ভবানী। স্বামীর তুলনায় কতকটা বৈ কি? তুমি তোমার স্বামীর দোষের কথা আমায় বলিবে, আর আমি কাণ পাতিয়া তাহা শুনিব?

শিবানী। তোমায় বলিলে আমার বুক অনেকটা হাল্কা হয়, তাই তোমায় বলিয়া জুড়াইতে চাই।

ভবানী। এমন বুক হাল্কা করিতে নাই।—ব্যথা সহিতে অভ্যাস কর;—ব্যথা সহিতে জানিলে ব্যথাহারীর দয়া পাইবে।

শিবানী। গঙ্গাজল, নারীধর্ম্ম কি এতই কঠিন?

ভবানী। সকলের সকল ধর্ম্মই কঠিন। তবে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে, কঠিন সহজ হইয়া যায়। তখন কঠিনকে আর কঠিন বলিয়া মনে হয় না।—তুমি তোমার

স্বামীর মনের গতি বুঝিয়াছ? তিনি কি চান্,—কিসে ভাল থাকেন, ভাল করিয়া ভাবিয়াছ কি?

শিবানী। ভাবিয়াছি।—কিন্তু তাঁর মনের মত হইতে গেলে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ভাসিয়া যায়।

ভবানী একটু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম? স্বামী ছাড়া তোমার আবার ধর্ম্মকর্ম্ম কি? তোমার স্বামীই তোমার ধর্ম্ম,—তিনিই তোমার কর্ম্ম।"

শিবানী কোন উত্তর না দিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ভবানী বলিতে লাগিলেন,—

"আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম,—সকলই আমাদের স্বামী। বলিয়াছি ত, স্বামী ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই? তবে যে আমরা দেবদেবীর পূজা করি,—জপতপ বারব্রত করি,—তাহা আমাদের নিজের জন্য নয়,—সে আমাদের পতি-দেবতা স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত। আমাদের মঙ্গলামঙ্গল,—ইহকাল-পরকালের একমাত্র কর্ত্তা—স্বামী। স্বামীর চরণ-পূজাই আমাদের ঈশ্বর-পূজা।—গঙ্গাজল! তুমি এই ভাবে, বিকারশূন্য হইয়া, স্বামীকে দেখিতে অভ্যাস কর,—মনে কোন কষ্ট থাকিবে না।—স্বামীও ক্রমে তোমার মনের মত হইবেন।"

শৈশব-সঙ্গিনীর মুখে স্বামিভক্তির এই কথা শুনিয়া,

শিবানী স্তম্ভিত হইল; মনে মনে বলিল,—"ইহারই নাম সতী-ধর্ম্ম বটে!—মা আদ্যাশক্তি, সতি-শিরোমণি! তুমি মা আমার নারীধর্ম্মের সহায় হইও,—আমি যেন মা, নির্ব্বিকারচিত্তে, এইভাবে, পতিপূজা করিয়া যাইতে পারি!—কিন্তু গঙ্গাজল আমার—দেবী না মানবী?"

মনের আবেগে শিবানী, সজল নয়নে ভবানীর পদধূলি লইতে গেল; ভবানী ত্বরিতগতিতে পা সরাইয়া লইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বলি, ও আবার কি হয়? আমাকে তুমি মা-গোঁসাই করিতে চাও নাকি? অমন করিলে ভাই, আমার 'গঙ্গাজল' বলা বন্ধ হ'বে।"

ভবানী শিবানীকে অনুরূপ মিষ্টকথায় তুষ্ট করিলেন।

সেই সময় রামকান্ত সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিবানী কক্ষান্তরে গেল, তারপর আপন-আলয়ে চলিয়া আসিল।

পরম রূপবান্ তরুণ যুবক রামকান্ত, তরুণী ভার্য্যা ভবানীর নিকট আসিয়া, বহুমূল্য দুই ছড়া মুক্তার মালা দেখাইয়া, হাসিমুখে বলিলেন,—"দেখ দেখি, কেমন এ মালা? এ সুন্দর গজমতি হার কোন্ কণ্ঠে শোভা পায় বল দেখি?"

ভবানী সে হার দেখিলেন,—অতি চমৎকার সে হার! —হারের উজ্জ্বল আভায় গৃহ যেন আলোকিত হইয়াছে।—

সেই হার হাতে লইয়া, এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া, ভবানী অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিলেন,—"দেবতার কণ্ঠ ছাড়া এ হার আর কোথায় শোভা পাইবে? মানবীর কণ্ঠ মাংসপিণ্ড মাত্র,—তাহাতে প্রাণ নাই।—সে মৃত জড়-কণ্ঠে এ উৎকৃষ্ট শোভা মানাইবে কেন? স্বামিন্, যদি সাধ করিয়া এ হার আনিয়াছ, তবে জননী জয়কালীর গলে ইহা উৎসর্গ কর।—আমরা প্রাণ ভরিয়া সে শোভা দেখিয়া জীবন সার্থক করি।"

রামকান্ত। প্রিয়ে, এ দুই ছড়ায় একটু ইতরবিশেষ আছে, দেখিতেছ? এক-ছড়া তোমার, আর এক-ছড়া দেবীকে দিব মানস করিয়াছি।

বুদ্ধিমতী ভবানী স্বামীর মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, উৎকৃষ্ট হার ছড়া, স্বামী তাঁহাকেই দিতে চাহিতেছেন; আর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছড়া, দেবীকণ্ঠে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ভবানী আর স্বামীকে, তাঁহার মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিবার অবসরই দিলেন না,—আগ্রহসহকারে কহিলেন,—"তা স্বামিন্! তবে আমাদের দুই জনের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—এ দু'-ছড়া হারই জননী-জয়কালীর গলে উৎসর্গ করা হউক। মায়ের বৃহৎ মূর্ত্তি,—এ দুই ছড়ায় মানাইবে ভাল।"

তারপর অতি সোহাগভরে স্বামীর গায়ে হাত

বুলাইতে বুলাইতে, সেই স্বভাবসজল করুণাপূর্ণ চক্ষু স্বামীর মুখোপরি স্থাপিত করিয়া, মধুবর্ষিণী কণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি মাতৃকণ্ঠে হার দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবে, আর আমি বুঝি তাহাতে বঞ্চিত হইব?"

উত্তর শুনিয়া রামকান্ত স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার দেবভক্তির প্রস্রবণ-মূলে, যে এক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া, স্রোত একটু রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল;—পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর অমৃতময়ী কথায়, সে পথ পরিষ্কার হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া, অন্তরের অন্তরে মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানে দেখিলেন, ভক্তের মনের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া, মা মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তখন যেন তাঁহার চৈতন্য হইল। বুঝিলেন, ঠিকই হইয়াছে,—পত্নীর ব্যবস্থাই অতি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। বুঝিলেন,—"ভবানী আমার প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী বটে। 'পত্নীই পতির ধর্ম্মের সহায়'—এ ক্ষেত্রে ভবানী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইল। কিন্তু আমি আজিও বুঝিতে পারিলাম না যে, ভবানী দেবী কি মানবী?—আ মরি মরি! ঐ দেহে এত রূপ!—আবার ঐ দেহের ভিতর যে অন্তর, তাহাতে এত গুণ! এখন আমি মুগ্ধ কিসে—ঐ রূপে, না এই গুণে?"

অনিমেষ নয়নে ধর্ম্মশীল যুবক, পত্নীর সে অনিন্দ্যসুন্দর

মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে জল আসিল। তিনি সেই সজল চক্ষে, পুণ্যবতী পত্নীর অমৃতশীতল বুকে, মুখ লুকাইলেন।

আর ভবানী? তিনি স্বামীর এ সূক্ষ্ম মনোভাব, আপন মন দিয়া বুঝিয়াছিলেন। স্বামীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন; তাই ঘটনার পারম্পর্য্য ও স্বামীর তৎকালীন মুখের আকৃতি দেখিয়া, তিনি সকলই বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্ত স্বামীর ভক্তির মূলদেশ আবার সরস ও স্বাভাবিক হইয়াছে,—তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তাই চোখে এ জল দেখা দিয়াছে। মনে মনে তিনি বিশেষ আনন্দ-অনুভব করিলেন। অনায়াসে স্বামীর এই ধর্ম্মপথের সহায় হইতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, এই আনন্দ অনুভব করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ভাগ্যবতীও মনে করিলেন। ভক্ত ও নিঃস্বার্থ প্রেমিক, এই ভাবে আত্মানন্দ উপভোগ ও আত্ম-সৌভাগ্যের নিদান-স্থির করিয়া থাকেন।

তবে যে ভবানী স্বামীকে মুখে বলিলেন,—"তুমি মাতৃকণ্ঠে হার দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবে, আর আমি বুঝি তাহাতে বঞ্চিত হইব?"—ওটি একটি সৎকার্য্য-সাধনের প্রকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টতম কৌশল। এমত অবস্থায় কৌশল দোষের নয়,—গুণের। ভবানীর তখন মনে হইতেছিল,—

"এ সময় যদি আমি স্বামীর ইচ্ছার পোষকতা করিয়া, আপন ব্যবহারের জন্য, ঐ উৎকৃষ্ট হার ছড়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে স্বামীর তাহাতে ক্ষণিক পরিতৃপ্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার পুণ্যপ্রবৃত্তি, আমা হইতেই মলিন হইল।—কি, দেবতা আর আমি, এক পর্য্যায়ভুক্ত হইব?—না, তাহা হইতেও কিছু অধিক!—উৎকৃষ্টটি আমার,—নিকৃষ্টটি দেবতার! ছি, ছি, আমি কি এতই লোভী ও অলঙ্কারপ্রিয় যে, স্বামী আমার মুক্তার মালা দিয়া তাঁর ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপদ হইবেন,—আর আমি ধর্ম্মপত্নী হইয়া তাহা দেখিব?—কি ছার নারী আমি যে, আমার জন্য, আমার ইষ্টদেবতার এ অধোগতি ঘটিবে? না, তা হইতে দিব না।"

আত্ম শুভ-ইচ্ছায় স্বামীর ইচ্ছা সংক্রামিত করিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া, ভবানীও তখন পরিপূর্ণ অনুরাগে, সযতনে, বক্ষঃস্থিত স্বামীর কণ্ঠ, আপন বাহুলতায় বেষ্টন করিলেন। মুহূর্ত্তকাল এই ভাবে কাটিয়া গেল; মুহূর্ত্ত-কাল উভয়ের চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সে জল কেমন, ভগবদ্ভক্ত পরম প্রেমিকই তাহা বলিতে পারেন।

ভক্তির জয় হইল দেখিয়া, ভক্ত রামকান্তও তখন, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারচিত্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে, সেই দুই ছড়া

বহুমূল্য মুক্তার মালা—জননী-জয়কালী দেবতার চরণে উৎসর্গ করিলেন;—মাও যেন প্রসন্ন-অন্তরে, হাসিমুখে, সে-মালা গ্রহণ করিলেন;—সে মালা পরিয়া মন্দির যেন আলোকিত করিয়া রহিলেন।—সেই বৎসরেই সামান্য একটু ঘটনাসূত্রে, মহারাজ রামজীবন রায়ের জমিদারীর আয় প্রায় দশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইল।

এমনই হয়। মা-ই সব দেন। তুমি আমি তার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া, চোখে অন্ধকার দেখি মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু, চিরদিন হায়, সমান না যায়! উত্থান পতন, বৃদ্ধি হ্রাস, জুয়ার ভাটা,—প্রকৃতি-রাজ্যের এ চির-নিয়ম। যেমন আলোক আসে, অমনি অন্ধকার উঁকি মারে; যেমন বসন্তের আবির্ভাব হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম ও বর্ষা পর-পর প্রস্তুত হইতে থাকে; যেমন নদীর দুকূল পরিপূর্ণ করিয়া বেলবেগে জুয়ার আসে, অমনি তার গায়ে-গায়ে—বিপরীত দিকে—অতি ধীরে অন্তঃশীলা উজান বহিতে থাকে।—জলের ভিতর কি হইতেছে-না-হইতেছে তাহা কেহ দেখে না,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এমনি হয়;—তারপর ভাটার পূর্ণ আবির্ভাবে সকলে তাহা প্রত্যক্ষ করে। জুয়ারে-ভাটার মাত্রা,——শূন্যে একটা 'ঢিল—মাথার সোজাসুজি

উপরপানে ছুড়িয়া দিয়াও বুঝা যাইতে পারে। ঢিলটা তুমি ছুড়িয়া উপরপানে চাহিয়া দেখ, ঢিল উপরপানে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রতি [illegible] নিম্নের দিকে নামিয়াছে।—তবে উত্থানের দিকে তখন তাহার পূর্ণ গতি ছিল বলিয়া, তার ঐ অনুপরিমাণ পতনের দিকে কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। ঢিলের এই উত্থান-পতন যেমন, নদীর ঐ জুয়ার-ভাঁটা যেমন,—আর এক পক্ষে জীবের জীবন-মৃত্যুও তেমনি। যে পরিমাণে যতটুকু বাঁচিয়া আছি, ঠিক সেই পরিমাণে ততটুকুই মরিয়া গিয়াছি;—এই নিশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গেও একটু জীবনক্ষয় হইল।—এইরূপ জীবন ও মৃত্যু—ঠিক গায়ে-গায়ে,—এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত,—পাশাপাশি জড়াইয়া আছে। সহস্র চেষ্টা কর, আর সহস্র হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখ,—সময় হইলেই সব উল্‌টিয়া যাইবে। কে যেন অলক্ষ্যে, এই সংসার-নাট্যালয়ে,—জড়, প্রকৃতি ও জীব,—সকলকে লইয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছে। অভিনয়ের বিষয় ও সময়ের ক্রম অনুসারে, আপন আপন প্রারব্ধমত,—কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সাধু কেহ চোর, কেহ ঋষি কেহ লম্পট, কেহ দেবতা কেহ বানর, কেহ সতী কেহ বেশ্যার অভিনয় করিয়া যাইতেছে। জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-দুষ্কৃতি-অনুসারে,

এই অভিনেয় অংশ লইয়াই আবার পরস্পরের মধ্যে বিবাদ। যে চোর, সে ভাবিতেছে,—"আমি কেন সাধুর অংশ পাইলাম না"; যে বানর সে ভাবিতেছে,—"আমি কেন দেবতা সাজিয়া বাহাদুরী লাভে বঞ্চিত হইলাম।" এইরূপ যে বেশ্যা, সে ভাবিতেছে,—"কি পাপে আমি বেশ্যা হইলাম? ভগবান্, একি তোমার অবিচার?"—এইরূপ সজীব ও অতি-স্বাভাবিক অভিনয় সংসার-রঙ্গালয়ে প্রতি-নিয়তই চলিতেছে;—প্রকৃতি নীরবে তাহা দেখিতেছেন ও মনে মনে হাসিতেছেন। বিলাসী নবীন নধর রূপ-গর্ব্বিত যুবকের বিলাস-সজ্জা দেখিয়া, মহাকাল যম যেমন অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিয়া থাকেন,—সেইরূপ হাসি হাসিতেছেন। পরকালবিস্মৃত অজর-অমর-জ্ঞানী বিষয়ী-লোকের—ভূমিবিভাগ বিবাদ দেখিয়া বসুন্ধরা যেমন মনে মনে হাসেন, সেইরূপ হাসি হাসিতেছেন। দুষ্টানারীর জারজ-সন্তানকে কোলে লইয়া, আপন সন্তানবোধে সেই সন্তানের সস্নেহ মুখচুম্বন করিয়া, দুর্ভাগা স্বামী যেমন প্রবঞ্চিত হয় এবং সেই প্রবঞ্চনা-জনিত সুখ উপভোগ করিয়া কলঙ্কিনী ভার্য্যা যেমন মুখ মুচকিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকে,—প্রকৃতি নীরবে ঠিক যেন সেইরূপ হাসি হাসিতেছেন। পরন্তু এই অভিনয়ের মালিক যিনি,—তিনি জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার

অদৃষ্ট-ছক্‌ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন;—নাকে দড়ি দিয়া মনের সাধে তাহাকে নাচাইয়া বেড়াইতেছেন;—তবুও হায়! সে তার স্বভাব ও সংস্কার ভুলিতে পারে না,—অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার বশে, সর্ব্বদা রেষারিষী ও দ্বেষাদ্বেষী করিয়া জ্বলিয়া মরে। পরন্ত, সেই নিখিলনাথ অক্ষ-স্বামীর অদৃষ্ট-ছক্‌ যে বুঝিতে পারে, সেই ভাগ্যবান্‌ আপনা হইতেই শান্ত ও সংযত হয়,—তাহার আর লাফালাফি ও দাপাদাপি বড় একটা থাকে না,—সে সেই অনন্ত শান্তিময়ের শীতল চরণে শরণ লইয়া, নিশ্চিন্তমনে আপন আরব্ধ কাজ করিয়া যায়। কেন না, সে তখন বুঝিতে পারে, ঐ অভিনেয় অংশের রাজা বা প্রজা কিংবা প্রভু ও ভৃত্য সাজায় বড় একটা বাহাদুরী নাই,—যত বাহাদুরী,—যে অংশ গ্রহণে বাধ্য হইতে হইয়াছে,—শত বাধা সত্ত্বেও, সেই অংশের উপযোগী—ঠিক ও যথাযথ অভিনয় করিয়া যাওয়া। কেন না, তখন সে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে, অভিনয়—অভিনয়,—দু'দণ্ড ভাঁড়ের নাচ মাত্র,—যবনিকা-পাত হইলেই,—বাস্‌! সব অন্ধকার!—আর কোথাও কিছু নাই,—সব ভোঁ ভাঁ।—সুতরাং ইহাতে ক্ষোভ বা আহ্লাদ কি?

এই জীবের যেমনি, প্রকৃতিরও তেমনি; অথবা প্রকৃতির যেরূপ, জীবেরও তদনুরূপ—কেবলই উলট-পালট,

কেবলই ভাঙ্গা-গড়া, কেবলই জুয়ার-ভাটা,—কেবলই রূপান্তর। সহস্র বিদ্যা-বুদ্ধি-সত্ত্বেও, কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। কেন না, কাল-স্রোত অমোঘ ও অপ্রতিহত। কাল, তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রবল প্রতাপে, আপন কাজ করিয়া যাইবেই যাইবে। যতদিন যার ভোগ, ততদিন সে ভুগিয়া মরে মাত্র। কেহ সুখে মরে, কেহ দুঃখে মরে;—কিন্তু ভোগে দুই জনেই। কে কম, কে বেশী, তাহা ভুক্তভোগীই বলিতে পারে।

নাটোরাধিপতি মহারাজ রামজীবন রায়ের এখন সেই ভোগের কাল ফুরাইল,—অথবা নূতন ভোগ আরম্ভ হইল। সহস্র তদ্বির-চেষ্টা করিয়া, কিংবা বুদ্ধি-ফিকির খাটাইয়াও তিনি এই ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহার জীবন-নদীতে ভাটা ত লাগিয়াই ছিল, এখন তাঁহার বড় সাধের বিষয়-নদীতেও ভাটা লাগিল। যে ঘরোয়া-বিবাদ-রূপ বিদ্বেষ-বহ্নি তিনি অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়ে ভয়ে নিবাইয়া আসিতেছিলেন,—সময়গুণে তাঁহার অবসানের সন-সময় হইতেই,—সেই বহ্নি আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রঙ্গ-স্বামী সংসার-রঙ্গালয়ে, এবার তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া, তাঁহার ছায়াশ্রিত পাত্রমিত্র পুত্রপরিবারবর্গকে, কোন্ অংশের অভিনয় দিবেন, তাহা কে বলিতে পারে?

রামজীবনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম রামরতন রায়। সেই রামরতনই এই নূতন অভিনয়ের নায়কস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। কেন, কি জন্য, বা কাহার ইচ্ছায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। সময়-স্রোতে যেমন ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই বলিয়া যাইব মাত্র।— দোষ বা গুণ কাহার কত অধিক, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

রামকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পূর্ব্বে, কালিকাপ্রসাদ নামে রামজীবনের ঔরষজাত এক পুত্র ছিলেন। সেই পুত্র উপযুক্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। পিতা-মাতার বুকের পাঁজর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। একমাত্র পুত্রের অকাল নিধন,—যে দুইদিন পরে রাজতক্তে বসিবে,—সেই বংশধর, কুলের শেখর,—সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল,—বৃদ্ধ রামজীবনের সেই মর্ম্মান্তিক কষ্ট বুঝাইবার নহে। জ্ঞাতি বন্ধু সকলেই ভাবিল,— এইবার রামরতনেরই কপাল খুলিল,—সেই-ই এইবার উত্তরাধিকারীস্বরূপ, নাটোর রাজ্যের যুবরাজরূপে পরিগণিত হইবে। কেন না, রামজীবনেরা তিন সহোদর ছিলেন। তিন জনেই একান্নবর্ত্তী। সুতরাং নাটোর জমিদারী,—রামজীবনের নামে লিখিত হইলেও,—তাঁহাদের এজমালি সম্পত্তি। এখন এই এজমালি সম্পত্তি,

রামজীবনের অবসানে, তাঁহার একমাত্র দ্রাতুষ্পুত্রই পাইবে,—সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল।

কিন্তু রামজীবন, সকলের এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। যে কারণেই হউক, তিনি তদানীন্তন এক প্রধানতম কুলীনের ঘর হইতে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই দত্তকপুত্রই—আমাদের রামকান্ত।

তা রামকান্ত দত্তকপুত্র হইলেও,—বিদ্যা, বিনয়, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে, অতি অল্পদিন মধ্যে, রামজীবনের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। এমন কি, বৃদ্ধ রামজীবনও যেন, ক্রমে কুমার কালিকাপ্রসাদের শোক ভুলিয়া, রামকান্তকেই আপন ঔরষজাত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই;—তাই এই সময় তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

রামকান্তের প্রতি বৃদ্ধের এতটা স্নেহ-মমতার আধিক্য দেখিয়া, রামরতনের পক্ষীয়গণ মনে করিলেন,—"তবে আর রামরতনের আশা-ভরসা কিছু রহিল না;—বৃদ্ধের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র কুমার রামকান্তই নাটোরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবে।"

কিন্তু বস্তুতঃ, রামজীবনের তাহা আদৌ ইচ্ছা ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র এককালে বঞ্চিত হয়,—ইহা তিনি

স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তবে কেহ কেহ রামরতন সত্ত্বেও তাঁহার দত্তক পুত্র গ্রহণ, দোষাবহ মনে করিতেন বটে। যাই হউক, বৃদ্ধ, ভ্রাতুষ্পুত্র রামরতনকে ছয় আনা, এবং রামকান্তের নামে দশ আনা জমিদারী লিখিয়া চিহ্নিত করিয়া দেন।

তা এই হইতেই যে অমন অনর্থকর গৃহবিবাদ উঠিবে বা উঠিতে পারে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু ভাবিলেই বা কি করিতে পারিতেন? যাহা হইবার, তাহা ত হওয়া চাই? অক্ষ-স্বামীর অদৃষ্ট-ছকে সকলকে ত পড়া চাই?

মধ্যে দুইবার এই বিষয়-বিভাগের কথা উঠে।—রামকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণের সময় একবার; রামকান্তের বিবাহের সময় আর একবার। দুইবারই রামজীবন—ঐ দশ আনা ও ছয় আনার কথাই বলেন। কিন্তু তাহাতে রামরতনের পক্ষীয়গণ সম্মত হন নাই। আধা-আধি আট আনা রকমের বলিলেও যে, তাঁহারা সম্মত হইতেন, এমনও বোধ হয় না। কেননা, তাঁহাদের মনে মনে এই মতলবই ছিল,—"বুড়া মরিলে, এই সমস্ত জমিদারীই রামরতনের একার হইবে,—আধা-আধিই বা কি? আর দত্তকপুত্র?—উহা প্রসিদ্ধ প্রমাণ করা যাইবে।"

ফলে, এই সকল অতি-হিতৈষী আত্মীয়গণ, মধ্যে মধ্যে রামজীবনকে বড়ই উত্তক্ত করিয়া তুলিতেন।—তাঁহাদের পারিবারিক সুখশান্তি সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। কখন বা দুইদলে বাঁধাইয়া দিয়া, ভিতর ভিতর মজাও দেখিতেন। রামকান্তের বিবাহের সময়ও তাঁহারা বিধিমতে বাদ [illegible]। সে পক্ষে কোনওরূপ ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ভবিতব্য রোধ করিবার সাধ্য, মানুষের নাই। তাই কুমার রামকান্ত, শত্রুর মুখ মলিন করিয়া, মহাসমারোহে, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়া আনেন।

যে কারণেই হউক, এই বিবাহের পর, কিছুকাল, উভয়পক্ষের মধ্যে আর কোন বিবাদ-বিসংবাদ হয় নাই,—পারিবারিক সুখশান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল; আবার আত্মদ্রোহ ও আত্মকলহ ঘুচিয়া, রাজপুরী আনন্দের হাসি হাসিয়াছিল।—তাহা ভবানীর পুণ্যবলে, কি বিধাতার ইচ্ছাফলে, তাহা কে বলিবে?

বলিয়াছি ত, রঙ্গস্বামী অলক্ষ্যে থাকিয়া, সমগ্র সংসারটাকে লইয়া, প্রতিনিয়তই সজীব অভিনয় করিয়া যাইতেছেন? কেবলই প্রাক্তন ও কালের মাত্রাভেদে,—কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ আমীর, কেহ ফকির সাজিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এ হিসাবে কৃতিত্ব বা পৌরুষ

কাহারও নাই ;—দোষ বা গুণও কাহারও নাই। যদি থাকে, ত তাহা জন্মার্জ্জিত অভুক্ত কর্ম্মফলের।

অন্তিম-শয্যায় শায়িত হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যপতি মহারাজ রামজীবন রায়, এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিলেন,—সকলই সেই চক্রধারীর চক্র,—মানুষের হাত কিছুই নাই।

তথাপি, তিনি বিষয়ী হিসাবে, শেষব্যবস্থাও করিলেন। কুমার রামকান্ত ও প্রধান অমাত্য দয়ারামকে ডাকাইলেন। উভয়ের দুই হাত এক করিয়া সম্মুখে বসাইলেন। বলিলেন,—

"রামকান্ত, তুমি দয়ারামকে কি বলিয়া সম্বোধন কর?"

রামকান্ত। আপনার আদেশমত 'দাদা' বলিয়া ইঁহাকে ডাকি এবং জ্যেষ্ঠের ন্যায় সম্মান করি।

রামজীবন। চিরদিন এই ভাব থাকিবে? রাজতক্তে বসিয়া ইহা ভুলিয়া যাইবে না?

রামকান্ত। পিতা, কেন আজ সন্তানকে এমন অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছেন? আপনার আদেশ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইবে।

পরে বৃদ্ধ, দয়ারামের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দয়ারাম,

তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না,—আজ হইতে তুমিই কুমার রামকান্তের একমাত্র অভিভাবক হইলে। রাজ্যপরিচালন সম্বন্ধে তুমি যে পরামর্শ দিবে, কুমার সেইমত কার্য্য করিবে। বিষয়-বৈভবে শত্রু পদে পদে; তাহা তুমি জান। রামকান্তকে সদা চোখে চোখে রাখিও।—তোমার ধর্ম্ম তুমি শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

দয়ারাম। সে মহারাজের অনুগ্রহ। আপনাকে আমি পিতা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি, কুমারকেও কনিষ্ঠ বলিয়া জানিব। 'কি ছিলাম আর কি হইয়াছি'—ইহা যখন আমার মনে অনুক্ষণ জাগিয়া আছে, তখন আশা করি, মহারাজের আশীর্ব্বাদে, এ রাজ-ভৃত্যে, অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসহন্তার পাপ স্পর্শিবে না।

রামজীবন। তাহা আমি জানি। জানি বলিয়াই, তোমাকে এই গুরুভার অর্পণ করিলাম।—রামকান্তকে তোমার হস্তেই সঁপিয়া দিলাম। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।

কিন্তু, তাই কি? নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি মরিতে পারিলেন কি? বিষয়ী লোক কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া মরে না। যে বিষয়ী নয়, কিন্তু মনে মনে বিষয়ের কামনা করে, সেও নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারে না;—মরণকালে বিষয়ের

স্বপ্ন দেখে। নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারে সে-ই,—যে জীবন ও মৃত্যু একই চক্ষে দেখিয়া আসিতে পারিয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারে সে-ই,—যে ভগবানে নির্ভর ও পরকালে বিশ্বাস ধ্রুবরূপে করিয়া আসিতে পারিয়াছে। হাসিতে হাসিতে, উদ্বেগহীন অন্তরে, প্রশান্ত হৃদয়ে মরিতে পারে সে-ই,—যে ধর্ম্ম ও সত্যকে জীবন-সম্বল করিতে গিয়া, আজীবন মরণাধিক জ্বালা ও অসহ্য অত্যাচার সহিয়া আসিয়াছে। মরণকালে ইঁহারাই চক্ষু মুদিয়া, সেই পরমপদ ধ্যান করিতে করিতে, নিশ্চিন্ত ও সুখসুপ্ত হইয়া থাকেন,—তোমার আমার ভাগ্যে, শতজন্মেও সে সুকৃতী ঘটিবে না।

রামজীবন ত একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কালের আহ্বানে চলিয়া গেলেন;—এখন সেই বন্দোবস্ত-মত কি তাঁহার সংসার চলিবে?

না। অদৃষ্ট, কাল ও পাত্রের যথাযথ যোজনা হইয়াছে;—এখনকার অভিনয় অন্যরূপ। রামকান্ত ও ভবানীর জীবন-নাটকের নূতন পট উত্তোলিত;—রঙ্গস্বামী এখন নূতন খেলা খেলাইবেন।

হায়! কেমন এ খেলা? এ খেলার কি অবসান নাই?

না। বসন্তের পর বর্ষা আছে, জুয়ারের পর ভাঁটা আছে, আলোর পর অন্ধকার আছে,—একভাবে কাহারও

দিন চলিতে পারে না।—সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এইরূপ উলট-পালট খেলাই চলিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধি হ্রাস, উত্থান পতন, ঘাত প্রতিঘাত,—ইহা প্রকৃতির নিয়ম,—কালেরও নিয়ম।

এখন সেই কাল সমুপস্থিত। অদৃষ্ট-নেমীর নিষ্পেষণে, কাল—আধার লইয়া ঘুরিতেছে;—ক্রিয়ার পর প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে;—ব্যাঘ্রের করাল দংষ্ট্রা হইতেও নরদেহ ছিনাইয়া লওয়া সহজ,—তথাপি কালের গ্রাস হইতে জীবের জীবত্ব পৃথক্ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। কাল, প্রতিনিয়তই এই জীব-দেহে ঘুরিতেছে, কিন্তু দেখা দেয় না,—সেই জন্য ভাষায় তাহার নাম অদৃষ্ট। এখন সেই অদৃষ্টের পূর্ণ প্রকোপ প্রকটিত;—কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে?

ঐ যে,—অদৃষ্টরূপী কাল আধার মুখে লইয়া ছুটিয়াছে!—পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা পাইলেও এখন সে, বাধা বলিয়াই মানিবে না;—যে তাহার সম্মুখে পড়িবে, তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

তবে, এস রামকান্ত,—এস ভবানি! তোমরাও কিছুদিন এই কাল-স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া বেড়াও! তোমাদের জীবন-নাটকের নূতন পট উত্তোলিত;—এখন রঙ্গস্বামী তোমাদিগকে লইয়া কি খেলা খেলান্, আমরা দেখি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"বল কি!—তাও কি হয়?—তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"ভায়া হে, এ সব কার্য্যে সাহস চাই,—মরিয়া না হইলে এ সব কাজ হয় না।"

"কাজ নাই আমার এমন কাজে!—উঃ! নরহত্যা? রক্তপাত?—তুমি বল কি?"

নির্জ্জন এক কক্ষে বসিয়া, দুই ব্যক্তিতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

তখন গভীর নিশীথ কাল। স্থান—এক নির্জ্জন উদ্যান-বাটী। তাহার চতুঃপার্শ্বে জন-মানবের বসতি নাই। বৃহৎ ঝাউগাছ বায়ুভরে, প্রেতযোনীর ন্যায় সাঁ সাঁ শব্দ করিতেছে। দূরে বংশবৃক্ষশ্রেণী হেলিতেছে,

ছুলিতেছে, পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া এক একবার ভীতিসূচক ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ করিতেছে। শৃগালকুল থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে ভীতি ও ঘন কৃষ্ণছায়া। অমা-চতুর্দ্দশীর রাত্রি;—অন্ধকার কুপ্-কুপ্ করিতেছে। আকাশে কোটী কোটী—অনন্ত কোটী নক্ষত্র পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিয়াছে;—যেন পৃথিবীর অনন্ত পাপ অনন্ত চক্ষে দেখিবে বলিয়া ওরূপ ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই গভীর নিশীথে, সেই উদ্যানে বসিয়া, একজন অন্যজনকে বলিতেছে,—

"উঃ! নরহত্যা? রক্তপাত? তুমি বল কি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল,—"বলি এই যে, আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য, যেরূপে হউক, পথ পরিষ্কার করিতে হইবে।—তাতে নরহত্যাই হউক, আর রক্তপাতই হউক!"

প্রথম ব্যক্তি। উঃ! তোমার মন্ত্রণা কি ভীষণ!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। এমন সব বড় কাজ করিতে হইলে, বুকে একটু বলসঞ্চয় করা দরকার।—এই লও, মায়ের এই মহাপ্রসাদটুকু অমৃতবোধে পান কর;—মাথা খেলিবে ভাল।

প্রথম ব্যক্তি। না, উটি আমা হইতে হইবে না।—তোমায় ত আমি কতবার বলিয়াছি যে, মদ আমি জীবনে

স্পর্শ করিব না?—তা তুমি কেন আমায় পুনঃপুনঃ এরূপ লোভ দেখাও?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কি বলিলে,—মদ? অমন কথা মুখে আর উচ্চারণ করিও না বলিতেছি।—বল যে, মায়ের প্রসাদ। তা এ প্রসাদ তোমার অদৃষ্টে নাই,—আমি কি করিব?

এই বলিয়া সেই কৃষ্ণকায়, রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত-চক্ষু, চুল-দাড়ি-নখবিশিষ্ট ভীষণমূর্ত্তি,—মৃৎভাণ্ডপূর্ণ সুরা ঢক্-ঢক্ করিয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল।

প্রথম ব্যক্তি তখন একটু হাসিয়া বলিল,—"কালীপদ, এরি নাম বুঝি তোমার মায়ের মহাপ্রসাদ পান? বলি, এ কু-অভ্যাসটা ত্যাগ কর না? ইহাতে লোক-সমাজে ক্রমেই যে তোমাদের মাথা-হেঁট হইতেছে? শেষে কি সকলে জুটিয়া জাত্যন্তর করিয়া বসিবে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন গলাটা একটু সাড়া দিয়া, স্পর্দ্ধা-ভরে বলিল,—"হাঁ, জাত্যন্তর অম্‌নি করে সকল বেটাই? হুঁ-হুঁ, আমার এ তান্ত্রিক মতের সাধনা; এর মর্ম্ম তারা বুঝিবে কি?"

প্রথম ব্যক্তি। তারা না বুঝুক,—ব্রাহ্মণের ছেলে,—গলায় একটা পৈতা র'য়েছে,—এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ভাল দেখায়?

দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন যেন একটু রাগিয়া, শ্লেষভরে বলিল,—"আর তুমি রামরতন রায়,—কপালে ঐ রাজ-টীকে র'য়েছে,—তুমি যে এই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে, এই বাগানে ব'সে, আর পাঁচ-বেটার সঙ্গে মতলব এঁটে, এক-জনের সর্ব্বনাশের ফিকিরে আছ,—এটাও কি ভাল দেখায়?"

কড়া জবাব পাইয়া, প্রথম ব্যক্তির মুখ একটু শুকাইল। তখন অন্য কথা পাড়িয়া, প্রথম দ্বিতীয়কে সান্ত্বনা করিল।

দ্বিতীয় বলিল.—"হাঁ, এই বেশ। ঘেঁটিয়ো না বাবা!"

প্রথম,—রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র—রামরতন। দ্বিতীয়,—রামজীবনের পুরোহিত-পুত্র—কালীপদ। কালীপদ—শিবানীর স্বামী। দিবারাত্র মদ-ভাং খাইয়া, হতভাগা মাথা খারাপ করিয়া ফেলিয়াছে।—কাকে কি বলে, ঠিক নাই।

রামরতনের চক্রান্ত,—নবীন রাজা রামকান্তকে নাটোরের রাজতক্ত হইতে সরাইয়া দিয়া, সমগ্র রাজসাহী জমিদারীটা কৌশলে হস্তগত করা। তাই এই এত রাত্রে, এই নির্জ্জনে তাঁহার অবস্থিতি।—মন্ত্রণাদাতা হিতৈষীগণ এখনও আসিয়া পঁহুছেন নাই।

কালীপদ রামরতনের ঠিক মন্ত্রণাদাতা নহে,—তবে

সংপ্রতি সঙ্গের সাথী—একরূপ বন্ধু বটে। কেননা, কিছুদিন হইল, কালীপদ—ভরা-গাঙ্গে নৌকা-ডুবি হইতে রামরতনের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল;—সেই হইতে পরস্পরের মধ্যে মেলা-মেশা। দ্বিতীয়তঃ, রামকান্ত যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে,—রামরতনের তাহাকে আপনার করিতেই হইবে;—তা সে মদ্যপায়ী পুরোহিত-পুত্রই হউক, আর পথের পথিক বা গলা-কাটা ডাকাতই হউক। জ্ঞাতি-হিংসা এইরূপেই চরিতার্থ করিতে হয়। আপন নাক কাটিয়াও জ্ঞাতির যাত্রাভঙ্গ করিতে হয়।

রামকান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু জমিদার;—মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে কুল-পুরোহিত পদে রাখিতে পারেন না;—তাই তাহাকে প্রথম প্রথম অনেক ভয়-মৈত্রী দেখাইয়া,—শেষে বহুবিধ শাসনেও সংশোধন করিতে না পারিয়া, ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজবাটী হইতে জন্মেরমত রুটী উঠিল দেখিয়া, কালীপদ, রামকান্তের উপর দাদ্ তুলিতে সচেষ্ট হইল। শেষে রামরতনের সহিত মিলিত হইয়া, সেই মতলবেই বেড়াইতে লাগিল। রামরতন দেখিলেন, যা-শত্রু-পরে-পরে,—এই অপমানিত প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোকটাকে হাতে রাখায় লাভ আছে;—জ্ঞাতি-বাদ সাধিতে, সময়-শিরে, ইহার দ্বারা কোন-না-কোন কাজ হইতে পারিবে। সেই অবধিই কালীপদ শর্ম্মা রামরতনের

এক জন সহচর হইল। মত্তপ সহচরের মুখ-আট্‌কানো দায়; তাই হতভাগা, নেশার ঝোঁকে কখন্‌ কি বলিয়া বসে, ঠিক নাই;—আজও সেইরূপ একটা বেয়াদবি কথা বলিয়া ফেলিল।

কথাটা রামরতনের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহা গায়ে মাখিলেন না। যাহার দ্বারা কাজ লইতে হইবে, বিষয়ী লোক তাহার কথায় চটে না। রামরতনও চটিলেন না,—পরন্তু সহচরের মনস্তুষ্টির জন্য, অন্য কথা পাড়িলেন।

এই সময় তাঁহার হিতৈষী মন্ত্রীবর্গ কতকগুলা খাতাপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ লইয়া সেইখানে আসিলেন। এক জন প্রস্তাব করিলেন,—"আমি বলি কি, আর অতটা হাঙ্গাম-হুজ্জুতে কাজ নেই,—দয়ারামকে ধ'রে, আধা-আধিই রফা ক'রে ফেলা যাক।—কি বলেন আপনি?"

রামরতন পূর্ব্ব হইতেই এ প্রস্তাবে নিম্‌রাজী ছিলেন; এখন সেই ভাব দেখাইতে-না-দেখাইতে, দ্বিতীয় হিতৈষী, প্রথমের প্রতি রাগিয়া উঠিয়া, একটা স-ভ্রূকুটী হুম্‌কি দিয়া বলিল,—"কি বলিলে তুমি? আধা-আধি রফা? কেন, একি ভিক্ষা নাকি? তাই সেই শূদ্রটা হাতে তুলে যা দেবে, তাই নিতে হবে? ওতে মেট্‌বার হ'লে, রাম-জীবন রায় বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তেই মিট্‌তো।—সলিয়ে-

কলিয়ে ধ'ল্লে, বুড়ো ছ-আনার উপর আরো দু-আনা উঠ্‌তো। তা যখন হয়নি,—তখন, হয় এস্‌পার, কি নয় ওস্‌পার।"

তৃতীয়। তা বৈ কি? গায়ে প'ড়ে—মিটুতে গেলেই ওরা পেয়ে ব'স্‌বে। ও, মিটাবার নামটিও কেউ মুখে এনো না।

চতুর্থ। বটেই ত! মেটামিটি হয় কার সঙ্গে? সরিক ব'লে মান্‌লে ত মেটামিটি? নিজের হক্ গণ্ডা,—তার আবার মিটুবে কি?

পঞ্চম। বেঁচে থাকো মোর ভাইরে!—ঠিক ব'লেছ!—রামকান্ত যে সরিক্, কিংবা জ্ঞাত্, অথবা জ্যেঠার পুষ্যিপুত্তুর,—এ কথা মান্‌লে ত? ওকে একেবারে আমলেই আনা হ'বে না।—প্রমাণ ক'ত্তে হবে যে, কুমার রামরতনই মৃত রামজীবন রায়ের একমাত্র ওয়ারিসন্,—কস্মিন্‌কালে তিনি পুষ্যিপুত্তুর কি ধৰ্ম্মপুত্তুর—এ সব কিছু নেন্ নি,—ও-সব জাল!

প্রথম। পার্‌বে?

পঞ্চম। না পারি ত, তুমি আমায় কুকুর ব'লে ডেকো।—তবে (রামরতনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) বাবাজী না পেচিয়ে পড়েন!

ষোল-আনা বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব,—একরূপ সমগ্র

রাজসাহী জেলাটার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হওয়ার লোভ,—রামরতন সংবরণ করিতে পারিলেন না। পঞ্চম হিতৈষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, এ বিষয়ে তুমি কি নজীর সংগ্রহ ক'রেছ, আমায় দেখাও দেখি। সম্ভবপর হয়ত, আমি পেচ্‌পাও নই।"

পঞ্চম। অসম্ভব আমার কাছে কিছু নেই বাবাজী! আমায় ত তুমি চিন্‌লে না বাপ্‌ধন!—এই গোটা দু'-তিন গঙ্গাজোলে—বব্বোলে-গোছের সাক্ষী আমার চাই।—(সঙ্গীদের প্রতি চাহিয়া) বলি, দানপত্তরটা ত তৈয়েরী ক'ত্তে হবে?

প্রথম। আচ্ছা, তারপর?—সেটা ত জাল হ'বে?

পঞ্চম। ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! জাল হবে, কি আমার চোদ্দ-পুরুষের উদ্ধার হবে, তা জেনে.. তোমার লাভ কি? বলি, দু-একটা সেকেলে বুড়ো-হাব্‌ড়ার নাম দস্তখত ক'রে দিতে পার? সে বিদ্যেটা ত একটু-আধটু শিখেচ?

প্রথম। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তা কার হাতের কি রকম লেখা,—আখর না দেখে কি কোরে বল্‌বো বলো? আচ্ছা, কার কার নাম—ব'লে যাও দেখি?

পঞ্চম। এই পইলে ধরো,—রামপদ পুরুৎ;—কেন,

তুমি কি তাঁর হাতের লেখা দেখ নি? দিব্বি গোটা-গোটা মুক্তোর-মত হরপ।—সে তুমি এক আঁচড়েই মেরে দেবে।—কি, চুপ ক'রে রইলে যে?

মদ্যপায়ী কালীপদ এতক্ষণ মদ্যের নেশায় ঝুম্ হইয়াছিল। তবে জ্ঞান হারায় নাই,—সকল কথাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। যাই তার বাপের নাম হইল, অমনি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল,—"ওকি বাবা! মরা-বাপ্‌কে নিয়ে টানাটানি কেন? নিজে এই সশরীরে এখানে বিরাজমান্ আছি, এই কাট্‌মার্ উপর দিয়ে যা ইচ্ছে ক'রে যাও বাবা!"

পঞ্চম হিতৈষী। না হে কালীপদ, এ একটা বড় কাজের কথা হ'চ্ছে,—এখন রঙ্গ ক'রো না।

কালীপদ। হাঁ হে, হাঁ! আমি তোমাদের কাজও বুঝি, আর অকাজও বুঝি। কেন বল, ভালমানুষের ছেলেটাকে নিয়ে নাস্তানাবুদ কর?—শেষ মূলে হা-ভাত হবে? (রামরতনকে লক্ষ্য করিয়া) সেই জন্যই ত বল্‌ছিলেম, অত ফিকির-ফন্দি জাল-যোগসাজে না যেয়ে, একেবারে কম্ম সাবাড় ক'রে ফেলো—ও পাপ বিদেয় হওয়াই দরকার।—নাস্তিকটা কিনা গুরু-পুরুত ত্যাগ করে? নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে,—ত্বরায় নিপাত যাবে।—কি বাবা, অমন কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছ কেন?

কি বল্‌ছিলে, ব'লে যাও,—আমি আর তোমাদের কথায় নই। এই আমি মুখ বুজ্‌লুম।

এইবার এক নিশ্বাসেই সেই মৃৎভাণ্ড খালি হইয়া পড়িল। শূন্য ভাণ্ড ভূমে গড়াইতে লাগিল। তৎসঙ্গে সেই মাতৃপ্রসাদপায়ী মহাপুরুষও ভূমে গড়াইলেন।

প্রথম। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) হতভাগা! মদেই মারা গেল!

দ্বিতীয়। (রামরতনকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রথমের প্রতি) আর এখন উনিই বল-বুদ্ধি-ভরসা। উনি না সহায় হ'লে, গরীব বামুন এতদিনে সপরিবারে পথে প'ড়ে ম'ত্তো। ও-বাড়ীর ত্রিসীমানায় ত এখন যাবার যো নেই।—তা জান ত?

প্রথম। জানি সব, তবে ম'রে আছি।

ইত্যবসরে সেই পঞ্চম হিতৈষী,—সেই সকলের মোড়লটি,—কতকগুলা খাতাপত্র হইতে, রামরতনকে কি হিসাব-নিকাশ দেখাইল। দুই একটা দলিল-দস্তাবেজ দেখাইয়াও, মাথামুণ্ড কি বুঝাইল। শেষ বলিল, "বাবাজী, আমার এ অব্যর্থ সন্ধান! এই দেখ, ইহাতে মহারাজ রামজীবন রায়ের শীল-মোহর আছে। এই দেখ, এই স্থানটা একটু শাদাও আছে।—হুঁ হুঁ! আমার এ বেড়া-জালে বাছাধনকে পড়্‌তেই হ'বে। এ রাজসাহী মুলুকে

তোমার একাধিপত্য স্থাপন ক'রে দিয়ে, তবে আমার কাজ! ওঃ! সেই শূদ্র দয়ারাম রায় মন্ত্রীত্ব ফলিয়ে হুকুম-জারি কর্‌বে, আর আমরা এতগুলো বামুনের ছেলে তার পায়ের তলায় জোড়-হাত ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? ভগবান্ কি নেই?—এ ঘোর কলিতে, ধর্ম্ম কি চার-পো থেকে এক-পয়ও দাঁড়িয়ে নি? সব কি গিয়েছে?—না, তা হ'তেই পারে না।"

সাক্ষাৎ কলির ধর্ম্ম-পুত্রটি, এই ভাবে ধর্ম্মের ও ভগবানের নামের দোহাই দিলেন। তবে রামরতন এই দোহাই-মত কাজ করিবেন কিনা, তাহা এখন তাঁর বিবেচনা-সাপেক্ষ।

বলা বাহুল্য, এই গায়ে-পড়া হিতৈষীগুলি,—রাম-রতনের বহু দূর-সম্পর্কীয়;—নিক্তির ওজনেও সহজে সুবাদ মিলে না। যদিও বা সুবাদের একটু গন্ধ মিলে, ত কি বলিয়া যে পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিবেন, তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় বয়োঃজ্যেষ্ঠগণ, ভবিষ্যতের অনেক আশা রাখিয়া, রাজসাহী জমিদারীর 'হক্ মালিককে',—স্নেহসূচক বাবা, বাবাজী, বাবাজীবন, দাদা, ভাই, ভায়া,—এই সব মোলায়েম মিঠা-বোলে সম্বোধন করিতেন। ইহাতে আর কিছু না হউক, এই তোষামোদকারী কলির জীবদের তোষামোদের

পথটি বেশ খোলসা হইত। স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের মুখ হইতে হঠাৎ কিছু অপমানসূচক কড়া-কথা শুনিলেও, তাহা গায়ে না মাথার পক্ষে একটু সুবিধা হইত বৈকি?—তখন, বার দুই চার বাৎসল্য-ভাবব্যঞ্জক 'বাবা' 'দাদা' সম্বোধন করিয়া, বাহিরের আর দশটি তীক্ষ্ণ-চক্ষু এড়াইয়া, সেই স্নেহাস্পদের গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, সহজে ও স্বল্পায়াসে, ইহাঁরা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতে পারিতেন।

এই শ্রেণীর গায়ে-পড়া পঞ্চম হিতৈষীটি, দম্ভ করিয়া পুনরায় বলিলেন,—

"বাবাজীবন! আমি এই বড়-গলা করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে তিনমাসের মধ্যে, তোমাকে নাটোর-রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রমাণ করাইয়া, রাজ-গদিতে বসাইব,—আর কুপোষ্য রামকান্ত রায়কে সপরিবারে পথে দাঁড় করাইব,—তবে আমার নাম দিগম্বর ভাদুড়ী!——মহারাজ রামজীবন রায়ের দত্তক পুত্র? শাস্ত্রবিহিত পিণ্ডাধিকারী? মিথ্যা কথা! দায়ভাগ মতে দত্তকপুত্র অসিদ্ধ প্রমাণ করাইব।—পালিতপুত্র বলিয়া বড় জোর খোর-পোস্ পাইতে পারিবে। নবাব-দরবারে গিয়া, কে উহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? যে দিবে, তাহাকে ঘুস-খোর—জালিয়াৎ প্রমাণ করাইব।—বাবাজী, তুমি পিছাইও না,—এই অনুরোধ।"

মদ্যপায়ী হতভাগা কালীপদটা এতক্ষণ অবধি চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। এইবার উঠিয়া বসিল। চক্ষু রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে বলিল,—"সব ত হইল, এখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টা দেয় কে বাবা?"

রামরতন এইবার হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"ব'লেছ বটে একটা কথা!—তা তুমি এখনো জেগে আছ?"

কালীপদ। হাঁ,—জেগে জেগে সব শুন্‌ছিলেম। তা ভাহুড়ী খুড়োর মতলব মন্দ নয়,—তবে বঁড়্‌শীতে মাছ বিঁধ্‌লে হয়।"

"সে বিঁধুবার ভার আমার উপর রহিল।"—পঞ্চম হিতৈষী বুক ফুলাইয়া, এই কথা বলিয়া, তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিলেন।

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। ষড়যন্ত্রকারীগণ একে একে চলিয়া গেল। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এখন, রামরতন রায় দো-টানায় পড়িয়া ঘোর হাবু-ডুবু খাইতে রহিলেন। কুচক্রীদের কুমন্ত্রণায়,—লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষা বিলক্ষণরূপই জাগিয়াছে;—তার উপর জ্ঞাতিহিংসার স্বাভাবিক বাদ-সাধাও খানিকটা আছে; পরন্তু অন্যপক্ষে, 'বেশী আশা করিতে গিয়া যদি সর্ব্বস্বই খোওয়াইতে হয়'—এই ভাবনাও সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আজ কয়দিন হইতে আহার-নিদ্রা তিনি একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন। থাকিয়া-থাকিয়া আপনা আপনি চমকিয়া উঠেন; কখন বা দৃঢ়তার সহিত দুই একটা কথাও বলিয়া ফেলেন। আজ আপন আবাস-বাটীর অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষে বসিয়া ঐরূপ চিন্তামগ্ন আছেন। চিন্তায় তাঁহার মুখে কালি পড়িয়াছে,

চক্ষু কোঠরগত হইয়াছে, কণ্ঠার হাড় যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মর্ম্মচ্ছেদকর একটি তপ্তশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—

"এখন কি করি?—কোন্ পথ অবলম্বন করি?—দয়ারাম রায়ের শরণাপন্ন হইব? নবীন রাজা রামকান্তের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইব? না, প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না। পোষ্যপুত্র,—পরের ছেলে, তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিব না। সে কোথাকার কে,—উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল,—আমার পৈত্রিক বিষয়ের ষোলআনা মালিক হইল,—আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল, তাহাকে আমি 'ভাই' বলিয়া স্বীকার করিব? আমার গোত্র নয়, জ্ঞাতি নয়, সুবাদে কেউ নয়,—রক্তের সম্পর্ক মাত্র নাই,—সেই পরের-পর—তস্ত পর—তার ছায়ায় আমি বাঁচিয়া থাকিব? কেন, প্রাণ কি এতই প্রিয়? দিন যেমন যাইতেছে, এমনি যাইবে,—সেও ভাল,—তথাপি দীনতা অবলম্বন করিয়া শত্রুর কৃপা-প্রার্থী হইতে পারিব না।—না, কিছুতেই নয়। সেই আমার ভৃত্য দয়ারাম যাহা চিহ্নিত করিয়া দিবে,—হাতে তুলিয়া যাহা ভিক্ষা-স্বরূপ দিবে, তাহাই লইয়া আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? আর অন্যদিকে,—নবীন রাজা রামকান্ত,—রাজছত্র মাথায় দিয়া, রাজদণ্ড হাতে লইয়া,

রাজাসনে বসিয়া থাকিবে,—সহস্র সহস্র লোক তাহাকে 'জয় মহারাজ পৃথ্বীপতি' বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিবে, আর আমি চক্ষু মেলিয়া তাহা দেখিব? না, কথনই নয়,—প্রাণ থাকিতে নয়! শত্রুর নিকট কথন মাথা নোঙ্গাইব না!

"কিন্তু অদৃষ্টদোষে যদি হিতে বিপরীত হয়? তাহাকে বঞ্চিত করিতে গিয়া যদি নিজে বঞ্চিত হই? ষোল-আনার আশা করিতে গিয়া যদি ছ-আনাও খোয়াইয়া ফেলি?—তথন? তথন তৃণের ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে।—স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া পথে পথে ঘুরিতে হইবে। লজ্জায় ও অপমানে মরমে মরিয়া থাকিতে হইবে।—মুখ তুলিয়া কাহারো পানে চাহিতেও তথন পারিব না।—তথন, উপায়?

"দূর হউক,—এ সব দুশ্চিন্তা মনে স্থা দিই কেন? অমন অমঙ্গল ভাবনায় মন মলিন করি কেন? সুখের জাগ্রৎ দশায় সাধ করিয়া এ দুঃস্বপ্ন দেখি কেন? 'উদ্‌যোগী পুরুষ সিংহঃ'—এও ত একটা কথা আছে? তবে এ ধোঁয়া-ধোঁয়া অদৃষ্ট ছাড়িয়া, একবার জ্বলন্ত পুরুষ-কারের আশ্রয় লই না কেন? এতকাল ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম; এত ক্ষমা-ঘৃণা-উপেক্ষা করিলাম,—অভিমান ও মনঃকষ্টে সে ছ-আনারও অংশ লইলাম না;—সে সকলই

কি বৃথায় হইবে?—না, কাল পূর্ণ হইয়াছে;—সুযোগ, সহায় ও সময় উপস্থিত হইয়াছে;—ভাদুড়ী প্রভৃতি পুরাতন কর্ম্মচারীরাও আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে;—এইবার একবার শেষচেষ্টা করিয়া দেখি!

"বিশেষ, সংবাদ পাইলাম, অনেক রাষ্ট্রবিপ্লবের পর, অনেক ঘরোয়া-বিবাদ অন্তে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এখন বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট। তিনি নূতন নবাব;—তাই এখনো সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শুনিলাম, রাজধানী মুরশিদাবাদে নাকি এখন সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা।—কর-আদায়ে নূতন নূতন লোক নিযুক্ত হইতেছে;—বাকী-খাজনার নিলামে একের জমিদারী অন্যের হস্তগত হইতেছে;—নবাব-সরকারে কেবলই নাকি 'দেহি দেহি' রব,—টাকার বড় অনাটন;—এই সময় একবার কল-কাটী চালিয়া ভাগ্যটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না? দত্তকপুত্র, অসিদ্ধ-প্রমাণ করিতে নাও পারি,—দেড়া কি দুনো খাজনা স্বীকার করিয়াও ষোল-আনা রাজসাহীটার মালিকানা-স্বত্ব লইতে পারিব না? টাকার লোভ—বড় লোভ।—তারপর শুনিয়াছি, নবাবেরা নাকি বড় কান-পাত্‌লা;—বাঙ্গালী মুন্‌সীরা তাঁহাদিগকে যেমন শুনায়, তাঁহারা তেমনি শুনেন।—ভালমন্দের বিচার শক্তি

তাঁহাদের বড় একটা নাই। কোনরূপে সন সন খাজ্‌নাটা পাইলেই তাঁহাদের হইল। তবে একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া দেখি।—রামকান্তের বিরুদ্ধে বিধিমতে লাগাইব-ভাঙ্গাইব; সমগ্র রাজসাহী একরূপ অরাজক হইয়া পড়িয়াছে,—প্রমাণ করিব;—মৃত রামজীবন রায়ের ভূসম্পত্তির আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী ও মালিক—সাব্যস্থ করিব; আর তারপর আমার নগদ যাহা কিছু আছে, সমস্তই কুড়াইয়া-কাড়াইয়া নবাব-সরকারে গিয়া নজর দিব;—সরকার হইতে আমার 'রাজ-সনদ' মিলিবে না? এককালে লাখ্ লাখ্ টারার সোনা-রূপা মণি-মুক্তা-হীরা,—নজরের এরূপ আড়ম্বর দেখিলে, আর কাহারও কি আমার মালিকানা-স্বত্বের উপর সন্দেহ জন্মিতে পারিবে?—কখনই না।—তখন নিশ্চয়ই আমার 'রাজ-সনদ' মিলিবে।

"কিন্তু ঘরে বসিয়া, কালনিমের লঙ্কা‑ভাগের ন্যায়,—এ সকল বিষয় কেবল মনে মনে কল্পনা করিলে চলিবে না। কার্য্য চাই। মন্ত্রের সাধন ও শরীর পাতন করিয়া কার্য্য চাই। এখন কিছুদিনের মত গৃহ-মমতা ত্যাগ করিয়া, ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান করিয়া বিদেশবাস করিতে হইবে। রাজধানীতে গিয়া, নবাব-সরকারের লোকজনেদের সহিত ভাব করিয়া, তাহাদিগকে হাত করিতে হইবে। আর জমিদারী-সেরেস্তার কাগজ-পত্র ঠিক রাখিতে,

ভাদুড়ীর মত আরো দুই চারি জন মাথালো-মাথালো লোক জোগাড় করিতে হইবে। কি জানি, কোন্ লাঠীতে সাপ মরে! এইরূপ সব দিক্ আট-ঘাট বাঁধিয়া দেখি,—তারপর কুল আর কপাল!”

এইরূপ, এবং আরও অনেকরূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, রামরতন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী সুশীলা দেবী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া, সতী সহানুভূতিসূচক শীতলকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—“অমন করিয়া একমনে বসিয়া, ও কি ভাবিতেছ,—আমায় বলনা?”

রামতন তখন সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক;—একথা কর্ণেই স্থান পাইল না। কেবল একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“হুঁ।”

সুশীলা আরও নিকটে গিয়া, পুনরায় সেইরূপ ভাবে কহিলেন,—“কিছু অসুক-বিসুক হ’লো নাকি?—একি, তোমার গা-মাথা যে গরম?”

রামরতন এবার অতি বিরক্তির সহিত স্ত্রীর হাত ছুড়িয়া, যেন অত্যন্ত কাতর-ভাব প্রকাশ করিলেন,—“আঃ।”

সুশীলা। কি অসুখ করিতেছে, আমায় বল না?

এতক্ষণে যেন রামরতনের চমক ভাঙ্গিল। ঈষৎ শুষ্ক-হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"অসুখ? কৈ, আমার ত কোন অসুখ করে নাই,—আমি ত বেশ আছি?"

সুশীলা। মা কালী তাই করুন।—কিন্তু তোমার চেহারা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে;—আর আজ কিছু দিন থেকে তোমার কেমন অন্যমনস্ক-অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি।—রাত দিন ও কি ভাব?

রামরতন। ভাবিব আবার কি?—ও কিছু নয়।—তোমার পূজাহ্নিক হ'য়ে গেছে?

সুশীলা। হয়েছে।—সত্য বল, তুমি কি ভাব? দেখ, আমি স্ত্রী,—আমার কাছে লুকাইও না;—আমার কাছে তোমার কোন কথা লুকাইতে নাই।—বল, কি ভাব?

রামরতন। কি আবার ভাবিব? তুমি কেবল আমাকে ভাবিতেই দেখ!

সুশীলা। ভাবিতে দেখি?—ভাবিতেই দেখি! সত্য বলিতেছি, তোমার ভাবনা দেখিয়া, আমার বড় ভয় হইয়াছে। আহারে তোমার রুচি নাই,—কি আহার করিতে কি আহার করিয়া ফেল। তোমার চক্ষে নিদ্রা নাই,—রাত্রে যখনই শয্যায় দেখি,—দেখি, তুমি জাগিয়া আছ ও এ-পাশ ও-পাশ করিতেছ। যদি বা কখন একটু ঘুমাও, ত ঘুমাইতে ঘুমাইতে কি বলিয়া উঠ।—কখন

যেন কাহাকে ভয় দেখাও,—কখন বা যেন নিজে ভয় পাইয়া মাথা নাড়িতে থাক।—এ সব কি দুর্ভাবনার লক্ষণ নয়?

এই কথার মধ্যে রামরতন একবার অন্যমনস্ক ভাবে 'হুঁ' বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনই তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "তার পর? বলিয়া যাও,—থামিলে কেন?"

পতিব্রতা দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন, "দেখ, তুমি বল আর না বল, আমি তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, কোন উৎকট দুশ্চিন্তায় তুমি আচ্ছন্ন হইয়াছ। বল, তোমার এ দুশ্চিন্তা কি? আমি স্ত্রী; তোমার সুখদুঃখে সম-ভাগিনী,—তোমার অৰ্দ্ধাঙ্গী,—বল, কি দুর্ভাবনায় তুমি উৎপীড়িত হইয়াছ? তোমার কথা এলোমেলো, এক কথায় আর্ জবাব দাও,—সব কথা কাণেই প্রবেশ করে না,—কি হইয়াছে, দুটি পায়ে পড়ি, আমায় সব খুলিয়া বল।"

এবার রামরতন উত্তর দিলেন,—"কি আর হইবে? যাও, ঘরের কাজ-কৰ্ম্ম দেখ গে। স্ত্রীলোকের সকল কথা শুনিতে নাই।"

সুশীলা। শুনিতে নাই? কেন নাই? স্বামীর মনের কথা স্ত্রী শুনিবে না ত কে শুনিবে? স্ত্রী কি কেবল স্বামীর

[illegible] সঙ্গিনী ?—স্বামীর দুর্ভাবনা কি মনের কথা শুনিবার অধিকার কি তাহার নাই ? তবে স্ত্রী, 'অর্দ্ধাঙ্গী ও ধর্ম্ম-পত্নী'—তাহার এ আখ্যা কেন ?

রামরতন। মনের কথা তোমরা গোপন করিতে পার না, তাহাতে অনেক সময় অনিষ্ট হইতে পারে।

সুশীলা। স্ত্রীজাতির ঐ নিন্দা কি চিরকাল শুনিয়া আসিব ? কবে কোন্ কথা আমায় বলিয়াছ যে, তাহা গোপন রাখিতে পারি নাই,—আর তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইয়াছে ? যে স্ত্রী মরণাধিক প্রসব-বেদনা সহ্য করিয়া হাসিমুখে স্বামীর কোলে সন্তান দিতে পারে, সেই স্ত্রী কি স্বামীর একটি গোপনীয় কথা মনে রাখিতে পারে না ?

রামরতন। তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলি নাই,—সাধারণতঃ স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ।

সুশীলা। তা সে ধারণা সম্বন্ধে পুরুষই তার দায়ী। সরলা কুলবালাকে পুরুষই সংসারের কুটিলতা শিক্ষা দেয়। যেখানেই লুকোলুকি বা ছাপাছাপি, সেই খানেই কু। কু, মেয়ে-মানুষের ধাতে সয় না;—তাই সে পেটে কথা রাখিতে পারে না।—এখন সে কথা যাক্। তুমি কেন আমায় তোমার দুশ্চিন্তার অংশ দিবে না, তা আমায় বল ? এই আর্শীতে দেখ, তোমার সোনার দেহ কি হইয়া গিয়াছে !

আমি তোমার আশ্রিতা, অনুগতা, শিষ্যা ও দাসী ;—আমায় তোমার মনের কথা বলিবে না? যদি এ বিশ্বাস তোমার না হয়, তবে আমার পত্নীত্বে অথবা সতীত্বে তোমার কি বিশ্বাস রহিল?—পায়ে ধরি, বল, তোমার মনঃকষ্ট কি?

রামরতনের অন্তর এবার গলিল। কিন্তু তথাপি তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। বলিলেন, "সতি, আমায় ক্ষমা কর। যাহা অনুমান করিয়াছ, সত্য। আমার মনের কথা তোমার ন্যায় স্বাধ্বী-রমণীর শুনিবার যোগ্য নহে,—তাই বলিলাম না। বিষয়ের কথা, বিষয়ী-লোকেই শুনিবে ;—আমার মনোদুঃখ তোমায় বলিয়া কোন ফল নাই,—তাই বলিলাম না। দুঃখিত হইও না।—ও কি, চক্ষের ঐ জল মুছিয়া ফেল। যদি কালী কূল দেন, তখন শুনিও। আমি এখন অকূলে ভাসিলাম। কিছু দিন আমায় দেশ-ত্যাগী হইতে হইবে। কোথায় যাইব, জিজ্ঞাসা করিও না। আমার অদৃষ্ট ও নিয়তি আমায় আহ্বান করিতেছে।"

দ্বারে ভৃত্য আসিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল,—বাহিরে দুইটি লোক তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে।

দুশ্চিন্তাপীড়িত রামরতন, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন,—ভৃত্যের সহিত বহির্ব্বাটীতে গেলেন।

তখন সেই স্বামীর সুখে দুঃখে চিরসঙ্গিনী,—স্বামীর

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষিণী সাধ্বী,—সজলনয়নে, যোড়হস্তে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—

"হে অনাথনাথ, হে বিপদভঞ্জন! স্বামীর আমার যেন কোন অমঙ্গল না হয়!—তাঁহাকে দেখিও,—সৎপথে তাঁহার মতিগতি স্থির রাখিও।—এ রক্তশোষিণী দারুণ দুশ্চিন্তা, যেন কোন অসৎকার্য্যের প্রসূতি না হয়, দয়াময়!"

পরে একটু ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন,—"বিষয়ের কথা? বিষয়ীর চিন্তা?—কি এ বিষয়? বলিলেন,—'কিছু-দিন আমায় দেশত্যাগী হইতে হইবে।'—তবে কি, যে গৃহ-বিবাদ এতদিন নিভ-নিভ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই আবার কুচক্রীর কুমন্ত্রণায় জ্বলিয়া উঠিল? ভগবন্! যেন আমার এ অনুমান মিথ্যা হয়;—যেন আমার শান্তিময় সংসার-ধর্ম্ম বজায় থাকে!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যাহা হইবার, তাহা হয়; যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটে। নারিকেল-ফলে জল-প্রবেশের ন্যায়, লক্ষ্মীর আগম নিগম, মনুষ্যবুদ্ধির অতীত।

নবীন রাজা রামকান্ত, বিচক্ষণ মন্ত্রী দয়ারাম রায়ের সুমন্ত্রণায়,—সুশীলা, সুবুদ্ধিদায়িনী, লক্ষ্মীস্বরূপা, ভার্য্যা-ভবানীর সুপরামর্শে,—'অৰ্দ্ধবঙ্গব্যাপী' বিশাল রাজসাহী-রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ করিতেছিলেন; সন সন নবাব-সরকারে নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া, পুত্র-বাৎসল্যে প্রজাপালন করিয়া আসিতেছিলেন;—সৎপন্থায় জমিদারীর আয় বাড়াইয়া, লোকহিতের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া, রাজ-কোষ পরিপূর্ণ করিয়া যাইতেছিলেন,—হঠাৎ সব উলট-পালট হইয়া গেল। নির্ম্মল আকাশ মেঘশূন্য পরিষ্কার;—

খরতাপে রবি-কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে ;—পরিপূর্ণ উৎসাহে ও জ্বলন্ত উদ্যমে লোক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে ;—হিমানীর তুষার বা বর্ষার ঝঞ্ঝাবায়ু কোথাও কিছু নাই ;—কিন্তু হঠাৎ একি ?—প্রকৃতির এ কি বিপর্য্যয় ঘটিল? দেখিতে দেখিতে, সেই অনন্ত গগন ঘোর ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল,—মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুৎ চমকিল,—জলস্থলব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া বজ্রপাত হইতে লাগিল ;—সূর্য্য যেন সভয়ে কোথায় লুকাইল ;—সূর্য্যের সেই জ্বালাময় তীব্র-কিরণ যেন সহসা যাদুমন্ত্রে নিবিয়া গেল ;—লোকের সেই জ্বলন্ত উদ্যম ও উৎসাহ যেন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রঃপূত দণ্ডস্পর্শে চকিতে অবশ, অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল ;—এবং তার পর সেই ঝড়, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত তিনের পূর্ণ-সংযোগে, ধরাবক্ষে যেন পিশাচযুদ্ধ হইতে লাগিল।—প্রকৃতি যেন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীর জীবনে তাঁহাদের অলক্ষ্যে, যে কাল মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, এখন কাল পূর্ণ হওয়ায়, সেই অদৃষ্ট মেঘ সহসা ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হইল ;—তাঁহারা সেই নিরাশ্রয় জীবন রক্ষা করিবার জন্য, সুদূর পর-দ্বারে গিয়া মাথা ফেলিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন,—অথবা রঙ্গস্বামী তাঁহাদিগকে লইয়া এই নূতন খেলা আরম্ভ করিলেন।

কুমন্ত্রণা-দীক্ষিত, ঈর্ষাজ্বালা-জর্জ্জরিত রামরতন পূর্ণ-মাত্রায় জ্ঞাতিবাদ সাধিবার জন্য,— সত্য সত্যই নবাব-দরবারে গিয়া, বিশেষ চতুরতা সহকারে, আপনাকেই মৃত-রাজা রামজীবন রায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিলেন,—এবং 'সমগ্র রাজসাহী এখন অরক্ষিত,—রাজকর আদায়ের কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই'—এইরূপ বুঝাইয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সুকৌশলে 'রাজসনন্দ' গ্রহণ পূর্ব্বক, নবাব-সৈন্য-সাহায্যে, চির-অভীপ্সিত রাজসাহী রাজ্য ও রাজপুরী অধিকার পূর্ব্বক, রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে, কিছুদিনের জন্য, সত্য সত্যই আশ্রয়-হীন করিয়া ফেলিলেন। গ্রহ-বৈগুণ্যে,—কার্য্যক্ষম, সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, প্রভুপরায়ণ দয়ারাম রায়ও সে সময় স্থানান্তরে,—কার্য্যব্যপদেশে নিযুক্ত ছিলেন। যখন এ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন প্রভুকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। *

* এই বিষয় লইয়া ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। অধিকাংশ লেখক, এই দয়ারাম রায়কেই, রামকান্তের রাজ্যভ্রষ্টের একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে দয়ারামের কোন হাত ছিল না;—অপিচ জ্ঞাতিবাদই এই বিষম অনর্থের মূল কারণ।

পত্রপুষ্প-শাখাকাণ্ড-সমুন্নত, শত সহস্র জীবের আশ্রয়-দাতা মহাবৃক্ষ,—হঠাৎ ভূমিসাৎ হইল। অমৃত-মধুর ফল-দানে ও সুস্নিগ্ধ ছায়া-প্রদানে, যে বৃক্ষ এক দিন লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবনাবলম্বন-স্বরূপ ছিল,—কি জানি, কাহার ইচ্ছায়, আজি হঠাৎ সে বৃক্ষ সে স্থান হইতে অপসারিত হইল;—আর তাহার স্থানে একটি ফুল-ফল-ছায়া-বিহীন বিটপী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সে বৃক্ষে বসিয়া সঙ্গীতপ্রাণ পক্ষী আর মধুরস্বরে গান গাহে না; শ্রান্ত-ক্লান্ত-পিপাসিত পথিক, দূর হইতে আর সে বৃক্ষের পানে আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখেনা;—সাধক বা সন্ন্যাসী সে বৃক্ষের তলে আসিয়া আর ইষ্টদেবতার নামগ্রহণে অভিলাষী

সমীচীন ও সম্ভবপর বোধ করিয়া, আমরা মৈত্রেয়-মহাশয়ের মতটিই আংশিক গ্রহণ করিয়াছি। তবে মৈত্রেয় মহাশয় যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই জাতিবাদের কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই জাতিটিকে, এই ষড়যন্ত্রের নায়করূপে নির্ণয় করি নাই। যাইহোক, মৈত্রেয়-মহাশয়ের এই মত গ্রহণে, আমাদের এই কাব্যচিত্রের একটু সুবিধা হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এইরূপ আরও কোন কোন স্থলে, সঙ্গত ও সমীচীন বোধ করিয়া, আমরা এই মৈত্র মহাশয়েরই ঐতিহাসিক তত্ত্ব গ্রহণে বাধ্য হইয়াছি। ফলতঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তর্ক, যুক্তি ও অনুসন্ধান,—ইতিহাসলেখকগণের ভাবিবার বিষয়।

হয় না;—সে বৃক্ষ যেন আপনায় আপনি মস্তক উত্তোলিত করিয়া অবস্থিত।—সকলকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেই যেন সে সদাই সমুৎসুক;—কাহারও সহানুভূতি বা শুভাশীর্ব্বাদের প্রার্থী যেন সে নয়;—যাহার ইচ্ছা হয় যেন সে আসিয়া তাহার পাদদেশে লুটাইয়া পড়ুক;—"আমার তুল্য আর দ্বিতীয় কে আছে, অতএব এ ব্রহ্মাণ্ডে আমিই একমাত্র কল্পতরু"——এমনি,—কি ইহারও অধিক,—একটা গর্ব্ব ও অহমিকাপূর্ণ তীব্র দৃষ্টিতে, অতি হীন-চক্ষে, সে সকলকে দেখিতে লাগিল। তরু উন্নত বটে, কিন্তু তাহার সকল অঙ্গ—সকল শাখা-প্রশাখাই এমনি নীরস, কর্কশ ও মাধুর্য্যহীন দেখিয়া, মনে মনে সকলেই তাহার উচ্ছেদকামনা করিতে লাগিল, এবং সেই স্থানে—পূর্ব্বের সেই শ্যামশোভা-সমাকীর্ণ, পত্র-পুষ্প-ফলামৃত-পূর্ণ, আরামদায়ী স্নিগ্ধ ছায়াশ্রয়ময় মহাবৃক্ষের পুনঃ আবির্ভাব-জন্য, অবিরাম দেবতার দুয়ারে সহস্র সহস্র কণ্ঠের মঙ্গল-প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু মঙ্গল-প্রার্থনাই হউক, আর উচ্ছেদ-কামনাই চলুক,—যার যতদিন ভোগ, তাহা ত হওয়া যাই?—তাই নব রাজ্যেশ্বর, নবীন রাজচক্রবর্ত্তী, সৌভাগ্যশালী-পুরুষ—রামরতন রায়,—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন;—আর তাই সহস্র সহস্র

দীন-দুঃখী অনাথ-আতুরের আন্তরিক শুভ আশীর্ব্বাদ অহর্নিশ মস্তক পাতিয়া লইয়াও, দরিদ্রের পিতা-মাতা-স্বরূপ—চির পুণ্যপ্রাণ মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানী—পথের বাহির হইয়া, অন্যের আশ্রয় অন্বেষণে বাধ্য হইলেন।

রাজলক্ষ্মী আজ রাজপুরী ছাড়িয়া চলিলেন। চারিদিক্ হইতে পাষাণভেদী মা-মা রব উঠিল;—সহস্র সহস্র চক্ষু বাষ্পাকুললোচনে চাহিয়া রহিল;—হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইল;—কিন্তু কৈ, কেহ কি সে করুণদৃশ্যের গতি-রোধ করিতে পারিল?

গ্রহের ভোগ বল, আর নিয়তির লিখন বল,—সংসারে প্রতিনিয়তই এমনি হইতেছে। ইহাঁদের ভাগ্যেও তাই এইরূপ হইল। সুতরাং ইহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভ বিশেষ নাই,—রঙ্গস্বামী এইরূপেই সংসার-রঙ্গ দেখাইয়া থাকেন। বলিয়াছি ত, ইহা একটা প্রকাণ্ড ও বিরাট্ সজীব অভিনয়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিশাল নদীগর্ভে একখানি অর্দ্ধসজ্জিত তরী। সেই তরীতে আরোহণ করিয়া, 'অর্দ্ধবঙ্গ-অধিপতি' মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানী, আজ সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া, পরের দুয়ারে আশ্রয় লইতে চলিয়াছেন।

নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। নৌকার দাঁড়ে ও জলের তোড়ে, একরূপ শব্দ হইতে লাগিল। কূল ছাড়িয়া নৌকা মাঝখানে গেলে, সে শব্দ বড় আরামপ্রদ বোধ হয়। উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে অগাধ জলরাশি, চারিদিক্ নিস্তব্ধ,—চক্ষু বুজিয়া সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে, অতীতের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি বড় মধুরভাবে মন-মাঝে জাগিয়া উঠে। স্মৃতি সহস্র দুঃখময়ী হইলেও,

স্থানমাহাত্ম্যে, তাহা হইতে কেমন একটা প্রশান্ত মধুরতা উপলব্ধ হয়।

সর্ব্বস্ব হারাইয়া, রাজ-দম্পতী সেই নৌকারোহণে চলিয়াছেন। দুইজনে দুই পার্শ্বে শুইয়া আছেন। দুই-জনেই নীরব,—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। নৌকা সেইরূপ ধীরে ধীরে চলিতেছে। নৌকার দাঁড় সেইরূপ জল কাটিয়া তালে তালে চলিয়াছে। সূর্য্যকিরণ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন একটা বিচিত্র শোভা জলে আঁকিয়া যাইতেছে। নদীর জলে কেমন একটা কল্‌কল ছল্‌ছল শব্দ হইতেছে।—তাহাতে কেমন যেন একটা স্বপ্ন-ময় আবেশ ও মধুরতা মিশানো আছে। সেই মধুরতাময় আবেশে ঘুম আসে,—কিন্তু ঠিক ঘুম হয় না;—ঘুমের ঘোরে যেন জাগ্রৎ সংসারের সমগ্র ঘটনাবলী চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া বেড়ায়।

রাজদম্পতীও আজ সেইরূপ চক্ষু বুজিয়া, অর্দ্ধ নিদ্রাচ্ছন্ন —অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায়,—সেই ভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। স্বপ্ন ও জাগরণের অতীত যে অবস্থা, যেন সেই আনন্দময়ভাবে তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বস্তুতই, এমনি অবস্থায় একটা আনন্দ আসে। এ আনন্দে তীব্রতার লেশমাত্র নাই,—অপিচ এ আনন্দ অতি ধীর, অতি মধুর, অতি পবিত্র।

অন্তরের অন্তরে অনুভব না করিলে, এ আনন্দ বুঝানো যায় না।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া, জীবনতোষিণী পত্নী অগ্রে কথা কহিলেন। অমৃতমধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"স্বামিন্! ঘুমাইলে কি? মনে এখন কি ভাবের উদয় হইতেছে বল দেখি?

জাগ্রতে তন্দ্রাভিভূত রামকান্ত, জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে, এ জীবন যেন সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কোথায় ছিলাম,—ঘটনাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিলাম,—আবার সময়ের আবর্ত্তে কোথায় গিয়া পঁহুছিব,—এই সকল কথাই এখন মনে উদয় হইতেছে। মনে হয়, অনন্ত-বিস্তৃত কাল-সমুদ্রে কেবলই সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছি;—জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া যেন কেবলই তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঠেলিয়া চলিয়াছি;—কবে, কোন্ জন্মে যে এ সন্তরণের অবসান হইবে,—কবে যে কূল পাইব,—আদৌ পাইব কিনা,—তাহা কে বলিতে পারে?—তোমার কি কোন কষ্ট হইতেছে?"

ভবানী। তুমি সঙ্গে আছ,—আমার আবার কষ্ট কি? বৈকুণ্ঠ কেমন, তা জানি না; কিন্তু মনে হয়, তুমি সঙ্গে থাকিলে এ সংসার ছাড়িয়া, আমি সে বৈকুণ্ঠও

কামনা করি না।—জন্ম জন্ম যেন তোমার সঙ্গেই থাকিতে পাই।

রামকান্ত সস্নেহে পত্নীর চিবুক ধরিয়া প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে বলিলেন, "প্রাণাধিকে! এমনি পতিব্রতা পুণ্যবতী তুমি! তোমার পুণ্যে, আমি সকল অবস্থাতেই সুখী। গ্রহবৈগুণ্যে এই যে রাজ্যনাশ ও বিদেশবাস সংঘটিত হইতে চলিল, এজন্যও আমি দুঃখিত নহি;—কেন না জীবনসঙ্গিনী—প্রাণের আনন্দদায়িনী তুমি;——তুমি ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে আছ।"

ভবানী। স্বামীর এমন সোহাগ ও ভালবাসা যে রমণী পায়, তার বাড়া ভাগ্যবতী আর কে? জন্মদুঃখিনী সীতা বিনাদোষে বনবাসিনী হইয়াও ভাগ্যবতী ছিলেন;—কেন না তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ভালবাসেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিই তাহার প্রমাণ।—স্বামিন্, এ ভাগ্য কি আমার চিরদিন থাকিবে?—আমি কি আমরণ এমন ভাগ্যবতী থাকিতে পারিব?

সেই স্বভাবসজল করুণাপূর্ণ চক্ষু স্বামীর মুখপানে ন্যস্ত করিয়া, অতি আশাপূর্ণ হৃদয়ে, বড় কোমলকণ্ঠে সতী বলিলেন,—"স্বামিন্! আমি কি আমরণ এমন ভাগ্যবতী থাকিতে পারিব? তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া, এমনি

অনিমেষ নয়নে, তোমার এ মোহনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, চলিয়া যাইতে পারিব? যদি তাহা পারি, তবেই ভাগ্যবতী বটে। নহিলে, রাজ্যেশ্বরীই হই, আর পরাশ্রয়বাসিনী হই,—আমার জীয়ন্তে সমাধি!"

সেই মমতাময় অমৃতপূর্ণ চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা জল রামকান্তের হাতের উপর পড়িল। তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও দেহ কণ্টকিত হইল। অতি যত্নে, বড় আদরে, পত্নীর সে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, রামকান্ত স্মিতমুখে কহিলেন,—"চির আদরিণী,—আমার জীবনের সকল সাধ তুমি;—বড় ভালবাসি বলিয়া কি, এমনি করিয়া সে স্নেহের প্রতিদান দিবে? ভাগ্য অভাগ্য কার কি, জানি না;—তবে তোমা হারা হইলে, আমিই কি এ সংসারে অধিক দিন থাকিতে পারিব মনে কর? তা ওকথা এখন কেন প্রিয়তমে? ভবিষ্যতের ঐ অন্ধকার-ছবি কল্পনায়ও যে দুঃখ আনে?—সাধ করিয়া এ দুঃখের আবাহন কেন কর সুভাষিণি?—এখন এই বর্ত্তমানের অবস্থা কি, ভাব দেখি?"

ভবানী। ভাবিয়াছি,—হৃতসর্ব্বস্ব, রাজ্যনাশ, পরাশ্রয় গ্রহণোদ্দেশ্যে আপাতত এই নৌকায় বাস;—কিন্তু এজন্য আমার এতটুকুও দুঃখ হয় না প্রিয়তম! কেন না, তুমি আমার সঙ্গে আছ,—আর আমি তোমার চরণ-পূজা

করিতে পাইতেছি। কিন্তু যেদিন আমি এই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইব,—আশীর্ব্বাদ করিও নাথ, সেইদিন যেন আমার আয়ুঃশেষ হয়।

রামকান্ত। জগন্মাতা [illegible] তোমার এই পবিত্র পাতিব্রত-ধর্ম্মের সহায় হউন;-তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।—এখন কি হইবে বল দেখি? কুচক্রী রামরতনের করালগ্রাস হইতে কি এ নষ্ট-সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারিব? নবাব-দরবারে কি আমার অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে? হায়, সময়গুণে দয়ারাম দাদাও সঙ্গে নাই!

ভবানী। তা এ সংবাদ তিনি এতক্ষণ পাইয়াছেন নিশ্চয়। সংবাদ পাইয়া তিনি কথনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। আমরাও মুরশিদাবাদ পঁহুছিব,—সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দেখা দিবেন।—এখন ত বরাবর শেঠ-ভবনেই উঠিতে হইবে?

রামকান্ত। তা বৈ কি? মহামতি জগৎ শেঠের আশাই আমার শেষ-আশা। ধনকুবের শেঠ-পরিবারেরা মনে করিলে, রাজসাহীর মত দুইটা জমিদারী আমাদের হইতে পারিবে। স্বর্গীয় কর্ত্তাদের সহিত শেঠদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহারাজ রামজীবন রায়ের পুত্র ও পুত্রবধূ, দুর্জ্জন-কর্তৃক সর্ব্বস্বহারা হইয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে কি সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র—জগৎশেঠ নিশ্চিন্ত

থাকিতে পারিবেন?—যেরূপে হউক, তিনি আমার রাজসাহী, আমায় ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। সেই ভরসাতেই ত এমন বিপদেও নিশ্চিন্ত আছি। তবে বলিতে পারি না,—গ্রহবৈগুণ্যের সময় [illegible] পর হয়।—হয়ত ঐ জগৎ শেঠই এখন রামরতনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

ভবানী। না স্বামিন্, কমলা যাঁর প্রতি চির-সদয়া;—তাঁর অমন দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। ষড়যন্ত্রকারী ও প্রবঞ্চকের পক্ষগ্রহণ করিয়া, তিনি যে জানিয়া শুনিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। আমার বোধ হয়, সরলবুদ্ধি নূতন নবাব আলিবর্দ্দী, [illegible] এ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সেই ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিলেই, তিনি আমাদের সম্পত্তি আবার আমাদের ফিরাইয়া দিবেন।

রামকান্ত। কিন্তু বলিহারি রামরতনের চতুরতা! সহসা যেন যাদুমন্ত্রে নবাবকে বশ করিয়া রাজ-সনন্দ গ্রহণ করিল!—আমরা ইহার বিন্দুবাষ্প কিছুই জানিতে পারিলাম না।

ভবানী। দুষ্টলোকের রীতিই এই। অতি সংগোপনে, সে পাপে লিপ্ত হয়। সময়গুণে, তারি যোগ্য সহচর-অনুচরও কোথা হইতে আসিয়া জুটে। সেই সকলের

সমবেত চেষ্টায় এমনি সব কাজ হয়।—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে মনে হয়।

রামকান্ত। খুবই সম্ভব। চল ত এখন জগদম্বার নাম লইয়া নির্ব্বিঘ্নে মহিমাপুরে—শেঠ-ভবনে পৌঁছি;—তারপর সেই শেঠদিগের কৃপায় সকল রহস্যই অবগত হইতে পারিব।

ভবানী মনে মনে অভয়ার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া বলিলেন, "হে মা সর্ব্বমঙ্গলে! স্বামীর মাঙ্গল্য আবার ফিরাইয়া দাও। এ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের হস্ত হইতে স্বামীকে আমার উদ্ধার কর জননি!"

নৌকা চলিয়াছে। কত গ্রাম, কত অরণ্য, কত নগর অতিক্রম করিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ রাজদম্পতী মনে মনে কত ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিতে করিতে,—অবস্থা-চক্র-নিষ্পেষিত—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কত কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন;—এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে একটা উৎসাহ-উল্লাস-সূচক চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। নৌকার গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া তাঁহারা দেখিলেন,—আর একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, আট দশজন দাঁড়ীর দাঁড়ক্ষেপ সাহায্যে, তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই নৌকার ছাদে বসিয়া একজন উৎসাহশীল অর্দ্ধ-বৃদ্ধ, মাঝিদিগকে বিপুল উৎসাহ দান করিতেছেন।—রামকান্ত

সেই নৌকারোহী ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র চিনিলেন;—তাঁহার "দয়ারাম দাদা" না? পরম পুলকিতচিত্তে তিনি মাঝিদিগকে আপন নৌকা থামাইতে বলিলেন;—পশ্চাদ্বর্ত্তী নৌকা অবিলম্বে আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী নৌকা ধরিল। রামকান্ত সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে, দয়া দাদা! আসিয়াছ? আঃ! বাঁচাইলে।"

দয়ারাম। আমি তোমার পত্র পাইবামাত্র, এই দশ-দাঁড়ের নৌকা করিয়া আসিয়াছি। অনেক কষ্টে তোমাদের ধরিতে পারিয়াছি।—হায়! রাজলক্ষী বধূমাতা আজ এই দশায়? প্রাণ ধরিয়া এ বৃদ্ধকে আজ এ দৃশ্য দেখিতে হইল?

রামকান্ত। দয়া দাদা, এ জন্য দুঃখিত হইও না। এ সকলই ভবিতব্য,—দৈবের ছলনা। যাই হউক, যখন তুমি আসিয়া পঁহুছিয়াছ, তখন মনে হইতেছে, আবার আমাদের সুপ্রভাত হইবে,—এ দুর্দ্দশা আর আমাদের থাকিবে না।

দয়ারাম। ভাই রামকান্ত, স্বর্গীয় মহারাজ যে আমায় তোমাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন,—আমি তাহার কি করিলাম?

রামকান্ত। দয়া দাদা, কাঁদিও না।—কি করিবে বল,—আমাদের অদৃষ্টে এইরূপ ছিল। এখন তোমার

বুদ্ধিবল ও জগৎশেঠের অনুকম্পাই আমার একমাত্র সম্বল। চল, সর্ব্বাগ্রে সেই শেঠ-ভবনে উপনীত হই।

দয়ারাম। আমারও বিবেচনা তাই। নবাব-সরকারে শেঠদিগের প্রবল প্রতিপত্তি। ধর্ম্মাত্মা জগৎ শেঠ সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে, নবাব আলিবর্দ্দী সকল রহস্যই বুঝিতে পারিবেন।—উঃ! পাপিষ্ঠদের কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল!

উভয়ের অনেক কথা, অনেক পরামর্শ হইল। নির্দ্দিষ্ট-দিনে, তাঁহারা মহিমাপুরে—শেঠদিগের আবাস-বাটীতে পঁহুছিলেন। জগৎশেঠ সপরিবারে, পরম সমাদরে রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে গৃহে তুলিলেন। বিধিমতে তাঁহাদিগকে আতিথ্য-সৎকারে সুখী করিলেন। এবং সময়োচিত সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাদের নষ্টসম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

যথাদিনে দয়ারামকে সঙ্গে লইয়া, মহামতি জগৎ শেঠ নবাব-দরবারে উপনীত হইলেন এবং মহারাজ রাম-কান্তের সবিশেষ পরিচয় দিয়া, তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা সকলই জ্ঞাপন করিয়া, রামরতন ও তৎপক্ষীয়গণের দুঃসাহস ও দুঃশীলতার বিষয় আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া আলিবর্দ্দীর যেন চমক ভাঙ্গিল। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব তিনি,—তাঁহার চক্ষে এক হিন্দু-

ভূম্যধিকারী ধূলি দিয়া পলাইয়াছে!—তখনই তিনি মহারাজ রামজীবনের প্রকৃত পিণ্ডাধিকারী, শাস্ত্রসিদ্ধ দত্তকপুত্র রামকান্তকে, তাঁহার প্রাপ্য জমিদারী ফিরাইয়া দিলেন.—এবং রাজসনন্দ এবং রাজক্ষমতা প্রভৃতি সকলই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া, বিশেষ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে পুনরায় তাঁহাকে নাটোর রাজধানীতে পাঠাইলেন। আর বলা বাহুল্য, দণ্ড-স্বরূপ, আলিবর্দ্দী, রামরতনকে তাহার ন্যায্য-প্রাপ্য সম্পত্তি হইতেও, জন্মের মত বঞ্চিত করিয়া, সেই সম্পত্তি রামকান্তকেই অর্পণ করিলেন।

ধর্ম্মের মহিমায় এমনই হয়। ধর্ম্ম, প্রথম প্রথম একটু-আধটু কষ্ট দিয়া, এমনই কৌশলে ধার্ম্মিকের মান রক্ষা করিয়া থাকেন। — এটি ধর্ম্মের পরীক্ষা মাত্র।

রামকান্ত সেই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, আবার পূর্ণোৎসাহে ও পরমসুখে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। আবার সেই পত্রপুষ্প-শোভিত, শ্যামশোভা-সমাকীর্ণ সেই মহাবৃক্ষ যথাস্থানে বিরাজিত হইল। আবার সকলের আনন্দ, আশা ও উৎসাহ,—মঙ্গলধ্বনিতে মিশিয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল। আবার সকলে রামসীতার উচ্চ আদর্শে, রাজা রামকান্ত রাণী ভবানীর গুণগানে প্রবৃত্ত হইল।

ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় দেখিয়া, মানবের সহিত প্রকৃতিও যেন এবার হাসিলেন। আর সে ঘোর ঘনঘটা-পূর্ণ ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্জাবাত এখন নাই ;—এখন দিঙ্মণ্ডল খর-রবিতাপে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

এমনই হইয়া থাকে—প্রকৃতিরও যা, মানবেরও তাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চক্র ঘুরিয়াছে, এবার পরিপূর্ণ মাত্রায় সংসার-সুখ ভোগ হইবে।

সংসার-সুখ কি এতদিন অপূর্ণ ছিল? রামকান্ত ও ভবানীর জীবনে কি কোন দুঃখ ছিল? হাঁ, ছিল বৈ কি? যাহা লইয়া গৃহীর প্রধান সুখ,—যাহাতে গৃহীর সাধ-আহ্লাদের চরম স্ফূর্ত্তি, সে জিনিস তাঁহাদের ছিল না;—তাঁহাদের সন্তানাদি ছিল না। গৃহের সার শোভা, নয়নের অতুল্য আনন্দ, প্রাণের প্রিয়তম প্রতিবিম্ব, জন্মান্তরীণ তপস্থার মোহন বিকাশ—শিশুমুখদর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। সে অমিয়-নিছান মায়ার-পুতলি এতদিন তাঁহাদের ক্রোড়দেশ আলোকিত করে নাই;—সংসার-সরোবরে সে সোনার কমল এতদিন প্রস্ফুটিত হয় নাই;—

দাম্পত্য-জীবনের একটা মহা অভাব—একটা অসীম শূন্যতা,—এতদিন তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন ;—বিধাতার ইচ্ছায় সে অভাব ও সে শূন্যতা আর তাঁহাদের রহিল না ;—জীবনের সকল সাধ পূর্ণ করিয়া, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতৃপ্তি দিয়া, সংসার-নন্দন-কাননে এতদিনে স্বর্গের পারিজাত ফুটিল! পরিজাতের সে সৌরভ ও শোভায় গৃহ পবিত্র, কুল রক্ষা, পিতামাতার জীবন ধন্য হইল। রাজপুরীতে উৎসব ও আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কিশোরী, পরিপূর্ণ যৌবনে, সন্তান-প্রসূতি প্রসন্নময়ী জননী হইলেন। জননীর হৃদয় জন্মাবধিই ছিল ; এইবার সেই হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য, প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।

পুত্রমুখ দেখিয়া রাজা রামকান্তের আর আনন্দের সীমা রহিল না। রাজ্যনাশ হইতে রাজ্য উদ্ধার, তৎপরে এই প্রাণাধিক পুত্রমুখ দর্শন,—জন্মান্ধের চক্ষু লাভ হইতেও অধিকতর আনন্দ তাঁহাকে প্রদান করিল। ভবানীকে পূর্ব্বাবধিই তিনি প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন ;—এখন সেই ভালবাসার সহিত প্রগাঢ় সম্মানবোধ আসিল। পুত্রবতী সহধর্ম্মিণীকে, এখন হইতে তিনি বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। জীবন মধুময় ও সংসার তাঁহার নিকট বড়ই সুখের স্থান বলিয়া বোধ হইল।

আর ভবানী?—এখন হইতে প্রকৃতই তিনি পতিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। পতি-দেবতার চরণে, সম্পূর্ণরূপে তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিলেন। কেননা, এই পতির কৃপায় তিনি এই অমূল্য রত্নের অধিকারিণী হইয়াছেন!

মাতার বিশ্বপ্রসারিণী অপরাজিতা স্নেহে, ভবানী পুত্রধনকে ডুবাইয়া রাখিলেন। সে স্নেহ অনন্ত, অক্ষয় অপরিমেয়। সে স্নেহ আকাশের ন্যায় উদার,—সমুদ্রের ন্যায় গভীর। সেই গভীরতা হইতে রত্ন আহরণ করিয়া তিনি স্বামীর ক্রোড়ে দিয়াছেন;—আজ তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে? পতি-পত্নী দিবানিশি মুখোমুখি হইয়া, অনিমেষ-নয়নে, সে স্বর্গ-শোভা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

রামকান্ত বলিলেন,—"প্রিয়তমে, তোমার কল্যাণেই এ পুরী পবিত্র, জীবন ধন্য হইল। এইবার প্রকৃতই তোমার রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি মানাইয়াছে। জীবিতেশ্বরি! ঐ অমৃতাধার নয়ন-কমলে, এমনি করুণা-দ্যুতি খেলাইয়া, বাপ-ধনকে কোলে লইয়া, আমার সম্মুখে একবার দাঁড়াও দেখি! আ মরি! এত রূপ? এত শোভা?—জগদীশ্বর! এত সুখ অদৃষ্টে সহিবে ত?"

এবার ভবানী স্বামীর ক্রোড়ে শিশুকে দিয়া, সুস্মিত-

বদনে ঈষৎ দূরে দাঁড়াইয়া, সে শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। শিশু-মাতা গজেন্দ্রগমনে স্বামীর নিকটে আসিলেন। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিলেন। ভক্তিভরে স্বামীর পদ-রেণু মাথায় লইয়া জীবন সফলবোধ করিলেন। গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "স্বামিন্! তোমার কৃপায় তোমার ধন তোমার কোলে দিয়াছি;—আজ আমার বাড়া ভাগ্যবতী আর কে? কিন্তু তুমিই আমার ভাগ্য, তুমিই আমার শোভা;—জীবনবল্লভ! যেন শেষ পর্য্যন্ত এ শোভা, এ ভাগ্য থাকে!—আর কি বলিব?"

যথাদিনে মহাসমারোহে রাজপুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইল। দেশ ব্যাপিয়া উৎসব ও দীয়তাং ভুজ্যতাং রব উঠিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের পদধূলিতে পুরী পবিত্র ও দীনদুঃখীর আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক্ উৎফুল্ল হইল। রাজকুমারের নাম হইল—কাশীকান্ত। রাজদম্পতী, কাশীকান্তকে লইয়া কিছুদিন অপার আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সুখ যেন উপচিয়া পড়িল। পৃথিবী তাঁহাদের চক্ষে বড় শোভাময়ী বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! এত শোভা, এত সুখ, এত সাধ, এত আহ্লাদ তাঁহাদের ভাগ্যে সহিল না,—তাই বৎসর পূর্ণ

হইতে-না-হইতে, সেই স্বর্গভ্রষ্ট সোনার শিশু, সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল! পিতামাতার বুকে শোক-শেল দিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মুখ মলিন করিয়া, আশ্রিত-অর্থীর আশা-ভরসা-আলোক নিবাইয়া, সে মায়ার পুত্তলি মহামায়ার ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিল! নবশোক-প্রাপ্ত রাজদম্পতী হতাশ নয়নে শূন্যপানে চাহিলেন,—জীবন শূন্যময় বোধ হইল। বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তথায় যেন কি নাই!—কে যেন তাঁহাদের বুকের ধন বুক ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে! ভগ্নহৃদয়ে কাতর-কণ্ঠে পিতামাতা ডাকিলেন,—"যাদু আমার! কোথায় তুমি?"—শূন্যে প্রতিধ্বনি হইল,—'কোথায় তুমি?'

আর পৃথিবী? পৃথিবীর বুকে আর যেন সে শোভা, সে মাধুরী, সে কোমলতা কিছুই নাই,—এখন যেন সকলই নীরস, কর্কশ ও অতি-পুরাতন কুৎসিত বলিয়া বোধ হইল।—রাজদম্পতী বুঝিলেন, তাঁহাদের হাসি-মুখ মলিন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, পৃথিবীরও যেন এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নীরবে, সজলনয়নে, মর্ম্মচ্ছেদকর গভীর নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু, এ দিনেরও অবসান হইল। তাঁহাদের বুকের ক্ষত একটু একটু করিয়া শুকাইতে লাগিল। আবার, যেন সেই ভাঙ্গা-বুক জোড়া দিয়া, তাঁহারা সংসার-ধর্ম্ম

করিতে লাগিলেন। আবার চিরন্তন নিয়ম অনুসারে, দেঁতোর-হাসি হাসিয়া, সকলের সহিত তাঁহাদের মিলিতে-মিশিতে হইল।

দিনের পর দিন চলিল, বৎসরের পর বৎসর গেল, আবার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল,—প্রকৃতি-রাজ্যের সহিত জীব-রাজ্যেরও কত জুয়ার-ভাটা খেলিল;—ঈশ্বরেচ্ছায় আবার রাজদম্পতী একটি নবকুমার লাভ করিলেন।—আবার দিনকত সেইরূপ আনন্দোৎসব চলিল; আবার দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে আকাশ-মেদিনী প্রতিধ্বনিত হইল; —কিন্তু এবার আর পিতামাতার মনে তেমন উৎসাহ, তেমন আনন্দ, বা তেমন আশা নাই;—থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন;—আবার নিষ্ঠুর কাল কবে বা এ আলোক নিবাইয়া দিয়া তাঁহাদের হৃদয় অন্ধকার করিয়া ফেলে!

সত্য,—তাহাই হইল! আঘাতপ্রাপ্ত পিতামাতার মনের সন্দেহ কার্য্যে পরিণত হইল। এবার অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বেই, দ্বিতীয় রাজকুমারও জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিল। রাজ-দম্পতীর বুক এবার যেন শ্মশান হইয়া গেল।

কিন্তু কিছুদিন পরে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, শ্মশানেও বিদ্যুৎ খেলিল। আবার রাণী ভবানী গর্ভবতী হইলেন। যথাদিনে এক অলোকসামান্যা সৌন্দর্য্যময়ী

কন্যা প্রসব করিলেন। মায়ের যোগ্য মেয়ে!—কন্যার রূপে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইয়া রহিল। রাজদম্পতী কিছুদিনের জন্য জুড়াইলেন। তাঁহাদের বুকের ঘা যেন একটু একটু করিয়া শুকাইয়া আসিতে লাগিল। আবার প্রকৃতি যেন হাসিলেন;—সেই সঙ্গে তাহারাও হাসিতে বাধ্য হইলেন।

অমাবস্যা রাত্রির অসংখ্য তারা-হারের শোভাকেও ম্লান করিয়া, কন্যার রূপরাশি ফুটিতে লাগিল। সে শোভা দেখিয়া পিতামাতা মুগ্ধ হইলেন। দুই বংশধর নয়নমণি হারাইয়াও, এই কন্যাকে লইয়া, তাঁহারা সংসারে যুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! জন্মের মত তাঁহাদের বুক যেন ভাঙ্গিয়া রহিল;—বুকের যেন দুই খানি হাড়, জন্মের মত কে খসাইয়া লইয়াছে!—সে হাড়ের আর পূরণ হইবে না।

তারা-হারের শোভাকেও লাঞ্ছনা দিল,—এই জন্য রাজদম্পতী বড় সাধে, বড় আশাপূর্ণ হৃদয়ে, কন্যার নাম রাখিলেন,—তারাসুন্দরী। এই তারাসুন্দরী বা তারাই তাঁহাদের নয়নতারা হইয়া রহিল।—নয়নের আলো, জীবনের আলো, পৃথিবীর আলো,—যেন এই তারার আলোকেই তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন। অধিক কি, তারা-মায়ের ভক্তসন্তান রাজদম্পতী, এই তারার রূপেই

যেন সেই ত্রিতাপহরা শ্যামা-মায়ের স্বরূপ-নির্ণয়ে সক্ষম হইলেন।--আর সন্তানসন্ততির সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই। একমাত্র তারাই রাজপুরীর শোভা, সম্পদ, শ্রী ও গৌরব অধিকার করিয়া রহিল। কন্যা হইয়াও পুত্রের অধিক সমাদরে, তাহার সুকুমার শৈশব কাটিতে লাগিল।
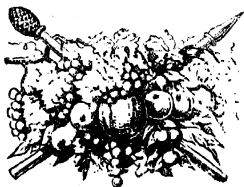
নবম পরিচ্ছেদ।

ভবানীর সেই শৈশব-সঙ্গিনী শিবানীর সংবাদ কি? দুর্জ্জন স্বামীর হস্তে পড়িয়া তাহার সংসার-সুখ যে কতদূর ঘটিয়াছিল, তাহা ত সহজেই উপলব্ধি হইয়াছে;—এখন তাহার জীবনের নূতন সংবাদ কি, তাহাই জানিতে হইবে।

নূতন সংবাদ আর কি? কালীপদ শর্ম্মা, মায়ের-প্রসাদ বলিয়া যে কলস কলস সুরা নিঃশেষ করিতে লাগিলেন, তাহার ফলে ঘোর আচারভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজ-বাড়ীর পৌরহিত্য পদটি তাঁহার গিয়াছিল। তার পর দিনকত রামরতনের সহিত মিলিত হইয়া, বিধিমতে তিনি রাজা রামকান্তের অনিষ্টসাধন চেষ্টায় ফিরিয়াছিলেন। পাঠক পাঠিকা এই পর্য্যন্ত অবগত আছেন;—বাকী কথা এখন আমরা বলিব।

যেদিন নবাবের হুকুমে, নাটোর রাজপ্রাসাদ হইতে রামরতন বিতাড়িত হইলেন, সেই দিন হইতে কালীপদ শর্ম্মারও দুর্দ্দশার একশেষ হইল। পেটে ভাত না থাকিলে ত আর শুধু মদ মারা চলে না? আর সেই মদ জুটিবেই বা কোথা হইতে?

তখন গুণধর, অনন্যোপায় হইয়া, সুশীলা পত্নীর পুণ্যদৃষ্টি আকর্ষণে মনোযোগী হইলেন। তাহাকে বুঝাইয়া-পড়াইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া রাণীর নিকট কাঁদিয়া-কাটিয়া প'ড়,—বল যে, আমার পৌরহিত্যটি আমায় ফিরাইয়া দেন। রাণী মত্ করিলে রাজা মত্ না দিয়া পারিবেন না,—তখন দুই বেলা আঁচাইবার পথ হইবে;—কিন্তু এখন যে একবেলাও সে পথ বন্ধ হয়! আর ঐ মায়ের প্রসাদ,—তা ওতে যদি তাঁদের এত আপত্তি,—তোমারও এত বিরক্তি হয়, তা আমি না হয় উহা আর নাই খাইলাম? বুঝিলে কি?—কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারিবে কি?"

মনে মনে বলিলেন, "তা না হয় একটু আধটু লুকাইয়া-চুরাইয়া খাইলাম? কে আর দেখিতে যাইতেছে? অভ্যাসটা ত একেবারে ত্যাগ করা যায় না?—মাগো, শ্মশানেশ্বরি! এ তোমারি ইচ্ছা।—কি বলিব, রামরতনটা যে হতচ্ছাড়া হইয়া গেল? অমন পোড়া-কপাল জানিলে কি আমি তাহার সহিত মিশি?"

স্বামীর কষ্ট, সংসারের নিতান্ত অসচ্ছলতা,—সাধ্বী শিবানী স্বামীর মনোভাব অবগত হইবামাত্র, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বাল্য-সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, স্থির করিলেন।

ভবানী, শিবানীকে চিরদিন সমভাবেই ভাল বাসিতেন। তাহার স্বামী মদ্যপায়ী ও অনাচারী হওয়ায় এবং কিছুতেই সে স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারায়, বাধ্য হইয়া তাঁহারা কালীপদকে পৌরহিত্য-পদ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিবানীর যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়,—অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাতে তাঁহাদের ভোগ করিতে না হয়, ভবানী স্বামীকে বলিয়া তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি কালীপদ শর্ম্মা—ভবানীর সে দান অগ্রাহ্য করিয়া, তেজের বশে, পিতৃসঞ্চিত অর্থে দিনযাপন করিতে থাকে। পরে কিছুদিনের জন্য রামরতনেরও সঙ্গ লয়। এখন সেই রামরতনই একরূপ নিঃস্ব ও নির্ব্বাসিত,—কালীপদের পিতৃসঞ্চিত অর্থও নিঃশেষিত,—সুতরাং পুনরায় রাজ-অনুগ্রহ লাভ ভিন্ন, শর্ম্মার আর উপায় কি? তাই পত্নীকে বলিয়া, শর্ম্মা এখন সেই পরিত্যক্ত দান, সাধিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।—পেটের দায় যে বড় দায়!

শিবানী গিয়া ভবানীর নিকট ছল ছল চক্ষে সকল

কথা জানাইল;—শুনিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়া রাণী গলিয়া গেলেন। গদগদস্বরে বলিলেন,—"গঙ্গাজল, তোমার এমন কষ্ট? আগে কেন জানাও নাই ভাই?"

শিবানী। কোন্ মুখে আর জানাইব বল বোন্? স্বামীর স্বভাবের কথা ত সকলই অবগত হইয়াছ,—এমত অবস্থায় তোমার নিকট আর কি জানাইতে পারি? বিশেষ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছ,—"স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা কাহাকে বলিতে যাই,—মনের ব্যথা মনেই চাপ উচিত।"—গঙ্গাজল! এখন স্বামী আমার অনুতপ্ত হইয়াছেন,—সংসারেরও বড় কষ্ট হইয়াছে, তাই তাঁহার ইচ্ছাক্রমে, তোমাকে এ কথা জানাইতে আসিয়াছি।

ভবানী। তা বেশ;—আমার কর্ত্তব্য আমি আজ হইতেই করিব। তোমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহার বিহিত ব্যবস্থা হইবে। তুমি গিয়া তোমার স্বামীকে নিশ্চিন্ত হইতে বল।—কেমন, এমত অবস্থায়ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা সমভাবে রাখিতে পারিয়াছ ত?

শিবানী। তাহা আর পাপ্ মুখে কেমন করিয়া বলিব বোন্? তবে তোমার শিষ্যা আমি,—ইহা হইতে যাহা বুঝিয়া লও।

শিবানীর স্বর আর্দ্র হইল। ছল ছল চক্ষে সাধ্বী

বলিলেন, "গঙ্গাজল! তাঁহাকে যদি এইরূপ ভাল দেখিয়া যাই, তবে বড় সুখে আমি মরিতে পারি।"

"সে কি" বলিয়া, অতি সহৃদয়তার সহিত, ভবানী, শিবানীর হাত ধরিলেন। তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "অমন কথা কেন বল বোন্? সময় হইলেই সকলকেই যাইতে হইবে,—তবে সাধ করিয়া ও-নাম কেন কর গঙ্গাজল?"

শিবানী। সাধ করিয়া আমি এ নাম করি নাই বোন্। সত্যই আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমি বেশ বুঝিতেছি, রমণীজন্মের একটা সাধ—আমি পূরাইয়া যাইতে পারিব। আর সেদিন অতি সন্নিকট।—হায়! এই সময়ও যদি তাঁহাকে ভাল দেখিয়া যাই?

খুক্ খুক্ করিয়া শিবানী একটু কাসিল; সেই কাসির সহিত একটু রক্ত বাহির হইল।—"ও কি" বলিয়া ভবানী শিহরিয়া উঠিলেন।

শিবানী একটু হাসিল। দিবালোকে, ছিন্ন মেঘের কোলে, বিজলী যেমন ক্ষীণ হাসি হাসে, সেইরূপ একটু হাসিল। হাসিয়া বলিল,—"বোন্, দেখ আর কি? শিবের অসাধ্য এ ব্যাধি। ক্ষয়কাশ তোমার গঙ্গাজলকে ধরিয়াছে।"

ভবানী। সেকি? কত দিন? কৈ, এ সংবাদ ত কিছুই জানি না?

শিবানী। জানিবে আর কিরূপে? মনের ব্যথা মনে চাপিয়াই আমার এ রোগ। তাই জোর করিয়া বলিতেছিলাম, রমণীজন্মের একটা সাধ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধটা হয়ত মিটাইয়া যাইতে পারিব। হায়, এখনো যদি তাঁহাকে ভাল দেখি?

সাধ্বীর চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল। সেই অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা পড়িয়া ধরাতল নিষিক্ত করিতে লাগিল।

ভবানী সবিশেষ না জানিলেও, অল্পেই বুঝিলেন, কি দুঃসহ মনঃকষ্টে তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী মৃতকল্পা হইয়াছে! বুঝিলেন, মনঃকষ্টেই শিবানীর রোগ, আর সেই রোগই তাহার কালস্বরূপ হইয়াছে।

যতদূর সম্ভব, সহানুভূতিসূচক সান্ত্বনা-বাক্যে ভবানী শিবানীকে আশ্বস্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। তাহার চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত রাজ-বৈদ্য নিযুক্ত করিয়া, ঔষধ-পথ্যের সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে বলিয়া শিবানীর স্বামীকে সেইদিন হইতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সিধা প্রভৃতির সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তবে শাস্ত্রের নিষেধ,—তাই সুরাপায়ী ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্য-পদে পুনরায় বরণ করিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে স্বামীর সহিত তিনিও একমত হইলেন। ভাবিলেন,—"প্রণয় হউক আর যাহাই হউক, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য আমা হইতে হইবে না।"

এ দিকে, সতীর পুণ্যফলেই হউক, আর প্রকৃতির নির্দেশানুসারেই হউক,—অথবা দারিদ্র্যের কশাঘাত-জনিত শিক্ষাতেই হউক,—কালীপদ শর্ম্মার স্বভাব ও সঙ্গদোষ, সত্য সত্যই অনেকটা সংশোধিত হইল। এত-দিনে যেন তিনি পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কুস্বভাবে কাতর হইয়া, প্রবল মনঃকষ্টে, সতী কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বুঝিতে পারিলেন,—তিনিই পত্নীর এই ভীষণ ব্যাধির মূল কারণ। এত দিনে যেন তাঁহার চৈতন্য হইল; এত দিনে যেন তিনি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এখন যে তিনি সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া কিছু করিতে পারেন, এমন বোধ হয় না।

শিবানী সত্যই বলিয়াছিল,—'শিবের অসাধ্য এ ব্যাধি।' ভবানীর বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা সত্ত্বেও, রাজবৈদ্য শিবানীকে আরোগ্য করিতে পারিল না,—বরং রোগ ক্রমেই অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইল;—বৈদ্যগণ সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন কঙ্কালসার শিবানী, উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া, অন্তিমশয্যায় শুইয়া, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিলেন। স্বামীর পাদোদক পান ও চরণ-ধূলিই তাঁহার একমাত্র ঔষধ হইল। সেই মহৌষধি মাত্র সার করিয়া, শেষের

কয়দিন, পরম পুলকিত চিত্তে তিনি অতিবাহিত করিলেন। স্বামীকে এক দণ্ডও তিনি চক্ষের অন্তরাল হইতে দেন না; কালীপদও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে পত্নীর শিয়রে উপবিষ্ট রহিলেন। এই সময়ে তিনি মস্তক-মুণ্ডন পূর্ব্বক, আপন দুষ্কৃতির যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

প্রাতঃসন্ধ্যায় কালীপদ চণ্ডীপাঠ করিয়া পত্নীকে শুনাইতেন; শিবানী একাগ্রমনে তাহা শুনিত;—ভক্তি-ভরে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। চক্ষু কোঠর-প্রবিষ্ট; তবুও এখনো তাহাতে পাতিব্রত্যের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি বিরাজিত। সে মাধুর্য্যপূর্ণ নীরব দৃষ্টি, যেন তাহার অন্তরের অন্তর প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। সে দৃষ্টি যেন প্রতি-পলে পতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,— "আমার জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণাধিক তুমি,—তুমি ভাল হইয়াছ,—ধর্ম্মশীল, পবিত্রচেতা, আচারবান্ গৃহী হইয়াছ, —আর আমার দুঃখ নাই,—এখন আমি সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

এমনি অবস্থায় ধীরে ধীরে সতীর পরমায়ু ক্ষয় হইতে লাগিল। এমনি অবস্থায় কালীপদ নিবিষ্টচিত্তে সতী-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। আর এমনি অবস্থায় স্বয়ং ভবানীও শৈশব-সঙ্গিনীকে মধ্যে মধ্যে দেখিয়া গিয়া,

তাহার কাহিনী আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া, বিরলে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেই শেষদিন উপস্থিত হইল। দীপ নির্ব্বাণের অগ্রে, যেমন একবার উজ্জ্বলরূপে জ্বলিয়া উঠে, তেমনি শিবানীর সেই ম্লান পাংশুবর্ণ মুখ, আজ অনেক দিনের পর যেন হাস্যময় হইয়া উঠিল। সে হাসি—মমতা, সরলতা ও পবিত্রতা মাখা; তথাপি কি জানি কেন, কালীপদ আজ সে হাসি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সতি, গৃহলক্ষ্মী আমার! আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় যাইবে?"

অতি কোমল ও মধুমাখা-কণ্ঠে শিবানী উত্তর করিল, "স্বামিন্, প্রভু, প্রাণেশ্বর! অমন করিয়া চক্ষের জল ফেলিও না,—উহাতে আমার অকল্যাণ হইবে। আজিকের এই আনন্দদিনে হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও। আমি এতদিন কায়মনোবাক্যে, যে প্রার্থনা করিয়া অসিয়াছিলাম, পতিতপাবনী আমার সে সাধ মিটাইয়াছেন,—ইহার বাড়া আমার আর সৌভাগ্য কি?"

উচ্ছ্বসিত-স্বরে, মুক্তকণ্ঠে কালীপদ বলিল,—"কি তোমার প্রার্থনা, পতিব্রতে?"

শিবানী। তোমার পায় মাথা রাখিয়া মরিব, আর—

কালীপদ। 'আর' কি প্রাণাধিকে?

শিবানী। আর তোমাকে ভাল দেখিয়া মরিব।—তা আমার এ দুই সাধই পূর্ণ হইয়াছে।—আজ আমার তুল্য ভাগ্যবতী ও গরবিনী গৃহিণী আর কে? এমন দিনে আমায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া তুমি কাঁদিতে বসিলে? ব’স প্রাণেশ্বর,—আমার সম্মুখে একবার স্থির হইয়া বসিয়া থাক,—আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি!—ওকি, চঞ্চল হও কেন? মুখ অমন মলিন কর কেন?—আজিকের দিনে আমার অনুরোধ রাখ,—স্থির হইয়া ব’স।

কালীপদ আবার উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“গৃহলক্ষ্মী আমার! আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে? এ সংসারে আমি একক,—ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, সকলের উপেক্ষিত;—স্বামীকে এমন অবস্থায় ত্যাগ করা উচিত হয় না প্রাণেশ্বরি! অভিমানিনি, আমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই বলিয়া কি, তুমি সেই প্রতিশোধ দিয়া যাইতেছ?”

শিবানী। ছি, অমন কথা বলিও না, প্রিয়তম! তোমার উপর কি আমি অভিমান করিতে পারি? দেবতার উপর কি অভিমান সাজে? আর সেই অভিমানে কি আমার প্রতিশোধ লওয়া সম্ভবে? না প্রাণাধিক!—আমার দিন ফুরাইয়াছে তাই আমি যাইতেছি। এখন প্রার্থনা এই, যে লোকে আমি যাইতেছি, সেই

লোক হইতে পূজা পাঠাইলে, পদাশ্রিতা দাসীজ্ঞানে, তাহা গ্রহণ করিও। হায়, ইহজীবনে আমার পতিপূজা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল!

কালীপদ। তোমার পূজা অসম্পূর্ণ? না সতি!—আমাকেই তুমি মহাপাতকী করিয়া গেলে।—আমিই তোমার এই অকালমৃত্যুর কারণ হইলাম।

শিবানী। না-না-না, অমন কথা আর মুখে আনিও না। দোহাই তোমার, এ সুখের অন্তিমে আর আমার অকল্যাণ সাধন করিও না। আমার গঙ্গাজল আমাকে সার বুঝাইয়াছে;—তুমিই আমার ঈশ্বর, তুমিই আমার পরকাল। জীবনবল্লভ! আবার জন্মান্তরে যেন ও চরণে স্থান পাই!

এবার সতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্তু হায়! সে অশ্রু বহিবার পথ আর নাই,—সে পথ রুদ্ধ! চক্ষু-কোটরে সে জল নিবদ্ধ হইয়া রহিল। কালীপদ আপন বস্ত্রাঞ্চলে, সযত্নে সতীর চক্ষের সে জল মুছাইয়া দিল।

এবার সতী পতির হাতখানি দুই হাতে ধরিলেন। মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "আর একটি কথা।"

কালীপদ আগ্রহভাবে বলিল, "কি, বল? তোমার কোন্ কাজ করিতে হইবে, নিঃসঙ্কোচে বল,—আমি প্রাণ দিয়াও তাহা সমাধা করিব।—বল কি কথা?"

শিবানী। সাহস দাও,—কোন অপরাধ লইবে না?

কালীপদ। তোমার আবার অপরাধ?—বিশেষ এই সময়?

শিবানী। তুমি আবার বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতিও।

কালীপদ। নিষ্ঠুর, পাষাণ! এই তোমার কথা? তোমার পিতামাতা তোমার শিবানী নাম না রাখিয়া, পাষাণী নাম রাখেন নাই কেন? তাহা হইলেই বোধ হয় ঠিক মানাইত!

শিবানী। তোমার বড় কষ্ট হইবে, তাই——

কালীপদ। আবার?

শিবানী। তবে আমার পূজা লইও? যেমন ভাবে যেথানে থাক, আমার মানস-পূজা গ্রহণ করিও?

অনুতপ্ত কালীপদ, অন্তরে শতবৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় ভবানী, শৈশব-সঙ্গিনীকে শেষ-দেখা দেখিতে আসিলেন। শিবানী স্মিতমুখে তাঁহাকে সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব। দুইজনের চক্ষুই বাষ্পপূর্ণ।

শিবানী ধীরে ধীরে ভবানীর হাতখানি ধরিলেন। ধীরে ধীরে আপন হাত হইতে, নোওা-গাছটি উন্মোচন

করিলেন। ধীরে ধীরে সেই নোঙ্গা-গাছটি—সেই সধবার মাঙ্গলিক নিদর্শনটি,—শৈশব-সঙ্গিনী—রাজরাণীর হস্তে পরাইয়া দিলেন।

ভবানী যেন একটু বিস্মিতা, একটু কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, "একি! এ কি হইল? তোমার হাতের 'নো' আমার হাতে দিলে যে?"

হাসি-হাসি মুখে শিবানী উত্তর দিল,—"ঐটি আমার গুরু-দক্ষিণা। শিষ্যাকে স্বামীভক্তি সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা দিয়াছ,—চিরদিন তাহাকে স্বামীসহ প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছ,—তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়।—তাই এই অন্তিমকালে, শিষ্যা তার জীবন-সম্বল, কোটী মুদ্রা হইতেও মূল্যবান্—এই অমূল্য অলঙ্কার—তার ভালবাসার জনকে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া গেল। ভাই গঙ্গাজল! চিরদিন এটি, আদরে এই হাতে রাখিও। তোমার এই মণি-মুক্তাময় হীরক-বলয়ের পার্শ্বে,—রত্নমণ্ডিত ঐ 'নো'র ধারে, —এটি না মানাইলেও, রাখিও। মার মুখে শুনেছি, এর ফল নাকি বড় শুভ।"

ভবানী আনন্দে, বিস্ময়ে, ভয়-ভক্তি-ভালবাসার আবেশে, এবং পক্ষান্তরে শৈশব-সঙ্গিনীর চিরবিচ্ছেদ আশঙ্কায়, কেমন একরূপ অপরূপ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু আমার এমন জোর-কপাল হইবে কি? সাধ্বি! তোমার

ন্যায় এইরূপে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া যাইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিবে কি? সধবা রমণীর হাতের এই লোহা সত্যই অমূল্য; তুমি স্বেচ্ছায় আজ শৈশব-সঙ্গিনীর হাতে তাহা পরাইয়া দিয়া গেলে!—আমিই তোমার নিকট চির-ঋণী রহিলাম। এখন তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোক হইতে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন তোমার এই চির স্নেহাভিলাষিণীও, এই ভাবে, তোমার অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়। তুমি পথ দেখাইয়া গেলে,—এ অংশে আমিই তোমার শিষ্যা।—ভাগ্যবতি! তোমার মত ভাগ্য কি আমারও হইবে?"

শিবানী এবার বড় পবিত্র মধুর হাসি হাসিয়া, ভবানীর কর-পল্লবে একটি চুম্বন করিল। ভবানীও সে চুম্বনের প্রতি-চুম্বন দিয়া, স্নেহভরে শিবানীর চিবুক ধারণ করিলেন। শিবানী বলিল, "জন্মান্তরে যেন তোমার মত স্নেহময়ী সঙ্গিনী লাভ করিয়া জীবন মধুময় করিতে পারি!"

ভবানী বলিলেন, "সাধ্বি! আমি যেন ইহজন্মেই তোমার মত এইরূপে, পতির পায়ে মাথা রাখিয়া যাইতে পাই।"

ক্ষয়রোগ;—সজ্ঞানে, কথা কহিতে কহিতে, শিবানী মহাকালের কুক্ষিগত হইতে চলিল। মহাকালের মহা আকর্ষণের সকল লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল। সুবর্ণ দীপ নিভ-নিভ হইয়া আসিল।

এইবার শিবানী কি ইঙ্গিত করিল, ভবানী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে কালীপদ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া এই করুণ-দৃশ্য দেখিতেছিল,—পত্নীর ইঙ্গিত বুঝিয়া নিকটে আসিল। শিবানী স্বামীর পাদপদ্মে মস্তক স্পর্শ করিলেন। তার পর যেন আরও হাসি-হাসি মুখে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু হায়! সেই দৃষ্টিই তাঁর শেষদৃষ্টি হইল, সে দৃষ্টিতে আর পলক পড়িল না! সতী নিমেষে নরলোক ছাড়িয়া গেলেন।

"হরিবোল—হরি" বলিতে বলিতে, কালীপদ, শবদেহ আচ্ছাদিত করিল, ভবানীও আশায় ও নিরাশায় তুলারূপে আন্দোলিত হইতে হইতে, শত কথা ভাবিতে ভাবিতে, শিবিকারোহণে, সজলনয়নে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে পরিচারিকা, দ্বারবান্ প্রভৃতি আসিয়াছিল; তাহাদের দুই একজনকে শিবানীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আদেশ দিয়া, তিনি চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শৈশব-সঙ্গিনী শিবানী, স্বামীকে রাখিয়া, সধবা-দশায় কালের মুখে ডঙ্কা মারিয়া চলিয়া গেলেন,—সেই দিন হইতে ভবানীর মনে কেমন একটা ভাবান্তর হইল। তিনি সদাই আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

"আমারও কি এ সৌভাগ্য হইবে না? আমিও কি এইরূপে পতি-দেবতার পাদ-পদ্মে মাথা রাখিয়া যাইতে পারিব না? শুনিয়াছি, সধবা সীমন্তিনীর হাতের এই নোওা বড় সুলক্ষণযুক্ত;—এই নোওা হাতে থাকিলে তার আর বৈধব্য-দশার ভয় থাকে না;—গঙ্গাজল আমার বড় আদরে তার সেই মাঙ্গলিক চিহ্ন, স্বহস্তে আমার হাতে পরাইয়া গেল;—তবে আমিও কি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব--

প্রাণের প্রাণ—প্রত্যক্ষ ঈশ্বর—স্বামীরত্নকে রাখিয়া, হাসিমুখে তাঁহার নিকট বিদায় লইতে পারিব না? কি পুণ্য করিলে এ সৌভাগ্যের সঞ্চার হয়? কোন্ উৎকট তপস্যা করিলে রমণী-জন্মের এ সর্ব্বসার সাধ মিটে? হায়! কে আমাকে এ গূঢ় রহস্য বলিয়া দিবে? কার নিকট আমি এ মহামন্ত্র গ্রহণ করিব? হে শিব, হে সর্ব্বমঙ্গলনিদান! বলিয়া দাও, আমার ইষ্টপূজা সফল হইবে কিনা?—আমার মনের মানস পূরিবে কিনা? কিন্তু, আমার প্রাণ, থাকিয়া থাকিয়া এরূপ কাঁদিয়া উঠে কেন? জাগ্রতে আমি এমন দুঃস্বপ্ন দেখি কেন? কি জানি, অদৃষ্টে কি আছে!"

পতিব্রতা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভবানীর মনে, কি জানি কেন, সহসা এ তরঙ্গ উঠিল। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, এক ঋতুর পর আর এক ঋতুর আবির্ভাব হইল,—তথাপি এ তরঙ্গের নিবৃত্তি হইল না,—তরঙ্গের সহিত ক্রমে তুফানের সম্মিলন ঘটিল;—ভাবনার সহিত ভয় মিশিয়া, সতীকে কেমন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল।

এক একটা দুর্ভাবনা, সত্য সত্যই কেমন ফলিয়া যায়।—ভবানীর ভাগ্যেও বা তাই ফলে?

কোথাও কিছু নাই,—আকাশে বড় ঘন মেঘ উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ চারিদিক্ ছাইয়া ফেলিল। অন্ধকারে আকাশ-মেদিনী এক হইয়া গেল। কিন্তু সে ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ চমকিল না। ভবানী দেখিলেন, এ তাঁহারই হৃদয়ের প্রতিকৃতি। মহাঝড়ের পূর্ব্বে, প্রকৃতি এইরূপ ভীষণা গম্ভীরা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।—তাঁহারই ভাগ্যে বা এই মহাঝড় উত্থিত হয়?

কোথাও কিছু নাই,—রামকান্তের নবীন নধর দেবকান্তি দেহে একটু জ্বর আসিল। সামান্য একটুকু ঘুস্‌ঘুসে মাত্র জ্বর;—কিন্তু হায়! কে জানিত যে, সেই জ্বরই তাঁহার কাল-জ্বর হইবে? কে জানিত যে, প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্য, মধ্যাহ্ন-গগনে থাকিতে থাকিতেই, চির-অস্তমিত হইয়া যাইবে?

সতী-কুল-লক্ষ্মী ভবানী কিন্তু অন্তরের অন্তরে তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। বহুদিন-সঞ্চিত মনের দুর্ভাবনাই যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল,—"এইবার জন্মের মত তোমার কপাল পুড়িবে;—রাজরাজেশ্বরী—রাজকুল-লক্ষ্মী হইলেও, ভাগ্যবতী নামে তোমার আর অধিকার থাকিবে না।"

প্রাণঘাতিনী এই অশুভচিন্তা, শেলসম হৃদয়ে বিদ্ধ হইলেও, সেই মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, সেই অপূর্ব্ব সতী-প্রতিমা, চিরমাধুর্য্যময়ী গম্ভীরা মূর্ত্তিতে, স্বামীর শিয়রে

আসিয়া বসিলেন। স্বামীর মস্তকে পদ্মহস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে, মধুমাখা কণ্ঠে বলিলেন,—“মাথায় কি বড় ব্যথা বোধ হইতেছে?”

রামকান্ত। প্রাণেশ্বরি, তোমার ঐ মনোহারিণী পুণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিলে, আমার কোন অসুখ থাকে না।—তুমি ওখান হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া ব’স প্রিয়তমে!—আমি তোমায় দেখি।

ভবানী, স্বামীর পদতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিয়া স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব সে শোভা!—যেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অনন্তশয্যায়-শায়িত—নারায়ণের পদতলে বসিয়া, স্বয়ং নারায়ণী—মহালক্ষ্মী—স্বামিপদসেবায় নিরতা হইয়াছেন! সত্যই মহারাজ রামকান্ত রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া, অনিমেষ-নয়নে, সে সতী-প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিলেন;—মুহূর্ত্তকালের জন্য বুঝি সে চোখের পলক পড়িল না।

আর ভবানী?—সাক্ষাৎ করুণারূপিণী সে মূর্ত্তি;—আজ যেন সে মূর্ত্তিতে, কি একটা অপরূপ গাম্ভীর্য্য মিশিয়া, সুখদুঃখের অতীত অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়া দিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু, প্রতিমার সে স্বভাব-সজল নয়ন-কমলে এক বিন্দু জল দেখা দিল।

সেই জলবিন্দু দেখিবামাত্র, পীড়িত রামকান্ত, যেন

হৃদয়ে বড় বেদনা পাইয়া, উঠিয়া বসিলেন। পত্নীর মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, বড় মমতাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—"প্রাণাধিকে! কাঁদ কেন? তোমার এই অপরূপ করুণা-পূর্ণ চক্ষু আমি বড় ভালবাসি বটে, কিন্তু এই চক্ষে ঐ জলবিন্দু দেখিলে, আমি বড় ব্যথা পাই;—সংসার আমার চক্ষে অন্ধকার বোধ হয়! ভয় কি?—আমার এ সামান্য অসুখ;—দুই দিনেই আরোগ্য হইবে।—হাঁ, তুমি ঐরূপ স্থিরভাবে, নিশ্চল প্রতিমার মত, আমার সম্মুখে ব'স,—আমি তোমায় দেখি।"

পুণ্য-প্রতিমা ভবানী, স্বামীর মনোভিলাষ বুঝিয়া, মনের ব্যথা মনে চাপিয়া, আবার চিরানন্দময়ী মূর্তিতে, স্বামীর সম্মুখে বসিলেন;—রামকান্ত অনিমেষ দৃষ্টিতে, সে শোভা দেখিতে লাগিলেন। এইবার বালিকা তারা আসিয়া, মার কোল আলো করিয়া বসিল। সেও মায়ের দেখাদেখি, কচি-হাতে, তার পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

হঠাৎ, সেই একদিনেই জ্বর বাড়িয়া উঠিল। দ্বিতীয় দিনে আরও বৃদ্ধি হইল,—চোখ মুখ সব লাল হইয়া উঠিল। তৃতীয় দিনে আরও বাড়াবাড়ি;—রাজবৈদ্যগণ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল; ইঙ্গিতে পরস্পর পরস্পরকে সেকথা বলাবলিও করিলেন।

জনান্তিকে, তাঁহাদের মধ্যে, চরক, সুশ্রুত, নিদানের অনেক কথা আলোচিত হইল,—কিন্তু কোন ফল হইল না।—রাজপুরীতে ভয়-বিভীষিকা-আতঙ্কের করাল-ছায়া নিপতিত হইল। সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিতচিত্তে, প্রতি-পলে, যেন সেই মহাবিপদের—সেই মহা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করিতে লাগিল।

কিসে যে কি হয়,—কোন্ সূত্রে যে কি ঘটে, কে তাহার নিদান নির্ণয় করিবে? অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই,—ইহাই ঠিক। স্ত্রীজাতির সংস্কার যে, মৃতা এয়োর হাতের নোওা হাতে দিতে পারিলে, সে ভাগ্যবতীও এয়ো-দশায়—স্বামীকে রাখিয়া যাইতে পারে। প্রবাদ বল, আর কুসংস্কার বল,—হিন্দুসমাজে আবহমান কাল হইতে, এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অদৃষ্টগুণে কাহারও ফল ফলে, কাহারও বা বিফল হয়। ভবানীর ভাগ্যে তাহা বিফল হইল। বৈধব্য-লগ্নে তাঁহার জন্ম; সেই লগ্ন বা ক্ষণের ফল ত ফলা চাই? দৈবের কৃপায়, বাল্যে না হইয়া যৌবনে তাঁহার সেই দশা হইল,—ইহাই তাঁহার পরম পুণ্য;—তাঁহার পিতামাতার পরম তপস্যার ফল।

তৃতীয় দিনে ঘোর বিকারে, রামকান্ত একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার একটু জ্ঞান

আসিল। রক্তবর্ণ চক্ষু একবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কাহাকে যেন তিনি অন্বেষণ করিলেন। যাহাকে তিনি অন্বেষণ করিলেন, সেই সতী-প্রতিমা সহধর্ম্মিণী, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায়, নিশ্চলভাবে তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছেন।

এইবার একটি মর্ম্মচ্ছেদকর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ভবানী স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। নিশ্বাসের সে তপ্ত-বায়ু রামকান্তের শরীর স্পর্শ করিল। তিনি বুঝিলেন, কি দুর্ব্বহ যন্ত্রণা, সাধ্বী নীরবে সহ্য করিতেছেন! কিন্তু হায়, ইহাপেক্ষাও শতগুণ যন্ত্রণা এখনও আছে;—আমরণ সুদীর্ঘকাল সে যন্ত্রণা নীরবে সহিতে হইবে!—সহিষ্ণুতার অবতাররূপিণী রমণীরই তাহা সম্ভবে। ভবানী সেই রমণী-শিরোমণি হইয়া, দেবীমূর্ত্তিতে তাহা সহিবেন। আমরা তাঁহার সে মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইব।

রামকান্ত ধীরে ধীরে চাহিলেন, ভবানী ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখে গিয়া, স্বামীর সেই নীরব দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইলেন। চারিটি চক্ষুই বাষ্পপূর্ণ হইল। কি বলি-বলি করিয়া, উভয়েরই ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল,—কিন্তু কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না।—অনিমেষ নয়নে, উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

এইবার ভবানীর গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কিন্তু তদবস্থায়ও তিনি নীরব রহিলেন। বুকের অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া, সাধ্বী জন্মশোধ স্বামীকে দেখিয়া লইতে লাগিলেন।—হায়! পরক্ষণে ত এমন দেখা আর দেখিতে পাইবেন না?

রামকান্ত, পতিব্রতার এ মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিলেন। নিজেরও শেষ-অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে তিনি পত্নীর হাতখানি আপন বক্ষে রাখিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "সতি কাঁদিও না। সংসারে তোমাকে আরও সহিতে হইবে। সহিতে তুমি আসিয়াছ, সহিয়াই যাইবে।"

ভবানী এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"প্রভু, আরও সহিব? আর সহিবার বাকী কি?"

রামকান্ত। বাকী আছে বৈ কি? আমি যেন দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, অনেক পরীক্ষা তোমার উপর আছে,—তোমাকে অনেক সহিতে হইবে। সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতেই যেন তুমি সংসারে আসিয়াছ। প্রিয়তমে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

ভবানী, হস্তে মুখ আবৃত করিয়া, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

রামকান্ত পুনরায় বলিলেন, "প্রাণাধিকে, কাঁদিও না। ভাবিয়া দেখ, এ সংসারে যে সহিতে পারে, সেই ধন্য। ধূপ আগুনে পুড়ে, পুড়িয়াও সৌরভ দেয়। সতীলক্ষী সীতা আজীবন সহিয়া—পুড়িয়া গিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মহিমা-সৌরভে জগৎ আমোদিত!"

এবার ভবানী, কি ভাবিয়া, মুখ তুলিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, স্বামীর মুখের পানে, নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

রামকান্ত বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে, শোকে দুঃখে বিপদে—সহিষ্ণুতাই জীবনের সার করিও।—যে সয়, সে অনেক কাজ করিয়া যায়। তুমিও অনেক কাজ করিয়া যাইবে।"

রুদ্ধকণ্ঠে ভবানী এবার বলিলেন,—"প্রভু, তোমা হারা হইয়া আমার আর কি কাজ আছে? কৈ, সে কাজ ত আমায় কেহ শিখায় নাই? তোমার সঙ্গে এ দেহেরও অবসান,—ইহাই জানিয়া আসিয়াছি।"

রামকান্ত। না, সহমরণে তোমার অধিকার নাই। অন্ততঃ, আমার সেরূপ ইচ্ছা নয়। পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তোমায় অবলম্বন করিতে হইবে। যাহারা তাহা না পারে, তাহাদের পক্ষেই সহমরণ বিধি বটে। কিন্তু তুমি তাহা পারিবে,—সে সৌভাগ্য তোমার আছে। বহুদিন পরে

তুমিই আবার এ পুণ্যভূমি ভারতে, নিষ্কামধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইবে। পরসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া, "দীনজননী দয়াময়ী ভবানী" নামে তুমি অভিহিত হইবে,—ইহাই যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।—প্রিয়ে, দেবলোকে আবার আমরা মিলিত হইব।

ভবানী এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "নর-দেব, আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর! তুমি ভিন্ন আমি যে আর নূতন কোন ধর্ম্ম জানিনা?—কে আমায় সে ধর্ম্ম শিখাইবে? কিরূপে আমি সে ধর্ম্ম পালন করিব?"

রামকান্ত। তোমার সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্মবুদ্ধিই তোমার সাধনব্রতের সহায়। বিপুল ধন-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি রহিল;—তোমার যথা ইচ্ছা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া যাইও।—তারার আশা তুমি অধিক করিও না;—এই কন্যাও তোমায় সুখী করিতে পারিবে না।—সুখ-শান্তি তোমার-আমার সেই নিত্যধামে।

ভবানী এবার স্বামীর পদদ্বয়ে মুখ লুকাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "জীবনবল্লভ! তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার শান্তি। তুমি থাকিলে, এই সংসারেই আমি নিত্যধাম রচনা করিতে পারিতাম।—হায়! আমার ইহজন্মের পতি-পূজা সাঙ্গ হইল না!"

রামকান্ত। সেজন্য খেদ নাই,—পূজা পাঠাইও,—

আমি গ্রহণ করিব। আমার দিন ফুরাইয়াছে,—আমি চলিলাম। ইহজন্মের মত চলিলাম। যে পথে গিয়া কেহ কখন আর ফিরে না, সেই পথে চলিলাম। প্রিয়তমে, হাসি-মুখে আমায় বিদায় দাও।—ঐ দেখ, বিমান-পথে দেববালাগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ শুন, কি মধুর শঙ্খধ্বনি হইতেছে! এই দেখ,—পুষ্পবৃষ্টি; ঐ দেখ,—পুষ্পক রথ! দাঁড়াও, আমি যাই—যাই।

ভবানী এইবার যেন পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বহুদিন-সঞ্চিত দুশ্চিন্তা এইবার কার্য্যে পরিণত হয়,—এবং সেই সঙ্গে তাঁহার বড় সাধের আশালতাও চিরদিনের মত ছিন্নমূলা হইয়া যায়!

তাহাই হইল।—সেই দিন অপরাহ্নে, শান্ত-স্নিগ্ধ-গোধূলির সম-সময়ে, পরম প্রীতিপ্রদ পুণ্যময় মুহূর্ত্তে,——হায়! সব ফুরাইল!

মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, ভবানী ভূমে আছাড়িয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন।

সেই বাল্যের সেই মাধুর্য্যময় স্বপ্ন। এবারও যেন জননী, সেই স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে তাঁহার শিয়রে সমুপস্থিত। হাসি-হাসি মুখে মা বলিতেছেন,—

"মা, আবার আত্মবিস্মৃতা হইলে? মোহ দূর কর, জ্ঞান-নেত্রে চাও,—দেখ, আমি কে? এইবার সেই মহাব্রত গ্রহণ কর,—জীবে অন্ন দাও, জননী-অন্নপূর্ণা নামে অভিহিতা হও। কার জন্য শোক কর? এই দেখ, তোমার পতি-পুত্র আমার ক্রোড়ে। এই দেখ, তোমার সাধের শিবানীও এইখানে। তুমিও সময় হইলে এখানে আসিবে। এখন কাজ কর। তোমার অনেক কাজ আজিও বাকী। কাজ শেষ না করিলে ছুটী পাইবে না। কাজ শেষ করিয়া এস' মা! আমিও তোমার জন্য কাতর।"

বহুক্ষণের পর ভবানীর সংজ্ঞা আসিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, পুর-মহিলা ও পরিচারিকাগণ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। তখন প্রায় চারি-দণ্ড রাত্রি হইয়াছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া বিমল জ্যোৎস্নালোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভবানী দেখিলেন, সে গৃহের সব আছে,—কেবল একটি জিনিস নাই। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, যাঁহাকে দেখিয়া, তিনি জন্ম-জন্মান্তরের দর্শন-পিপাসা মিটাইতে ছিলেন,—কেবল সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবমূর্ত্তিটি সেখানে নাই। এই একটু আগে যাঁহার অমৃতময়ী কথা শুনিয়া প্রাণের প্রাণ জুড়াইতেছিলেন,—দেখিলেন, হায়! শয্যা শূন্য;—তাহাতে সেই অমিয়-নিছান মধুর-মনোহর

মুখখানি নাই। তাঁহার মূর্চ্ছিত দশায়,—সেই মুখ, সেই দেবদুর্লভ মূর্ত্তি, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন চিতানলে ভস্মীভূত করিতে লইয়া গিয়াছে!

সকলের ক্রন্দন দেখিয়া, বালিকা তারাও কাঁদিতেছিল। এবার বড় মমতাপূর্ণ কোমলকণ্ঠে, সে, জননীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, বাবা কোথায়?"

ভবানী কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

বালিকা বলিল,—"ও যে আকাশ। অত দূরে বাবা কেমন ক'রে গেল? হাঁ মা, বাবা আবার আস্‌বে?—ও কি, তুমি কাঁদ্‌চ কেন মা?"

একজন পুর-মহিলা তারাকে কোলে লইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার বাবা কোথায়?"

"তিনি স্বর্গে। চল, আমরা স্বর্গ দেখিগে।"

পুরমহিলা বহু চেষ্টায়, বালিকাকে ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিলেন।

ভবানী ভাবিলেন,—"এই বালিকাকে মানুষ করিতে হইবে। ইহার রক্ষা ও পালনের ভার আমার উপর।—মা দয়াময়ি, পরমেশ্বরি! তুমিই সব দেখিও।"

তখন একে একে সকল কথাই ভবানীর মনে

পড়িতে লাগিল। সেই সুকুমার শৈশব, সেই স্নেহময়ী শিবানী, সেই সাধের খেলা-ধূলা, সেই পিতামাতার নৈসর্গিক স্নেহ, সেই পিসীর সভক্তি করুণা, সেই পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার মন্দির, সেই আতুরাশ্রম, সেই অতিথিশালা, সেই বিবাহ—সকলই তাঁহার সুদীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। তার পর রাজগৃহে আগমন, স্বামীর সহিত পবিত্র প্রণয় বন্ধন, রাজ্যনাশ, রাজ্যোদ্ধার, দুই পুত্রের অকাল নিধন, শিবানীর মৃত্যু,—তাহার সেই মাঙ্গলিক উপহার,—উপহার গ্রহণাবধি নানা চিন্তা,—শেষ এই আকস্মিক মহাসধনাশ,—সুদীর্ঘ সময়ের বিবিধ ঘটনাপুঞ্জ যেন চিত্রপটাঙ্কিত প্রতিকৃতির ন্যায় তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। কোথা দিয়া কি ভাবে যে, এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা তিনি ভালরূপ ভাবিয়াও উঠিতে পারিলেন না। অথচ প্রকৃতই এই সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, ভবানী মনে মনে বলিলেন,—

"হায় রে! এই জীবন? ছায়াময় জীবনের এই অভিনয়? এই আছে, এই নাই,—ইহারই জন্য এত? এই ছায়াবাজীতে এত দিন বিভোর ছিলাম? জীবনের এ সুদীর্ঘকাল মধ্যে, কি করিলাম? কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল? যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা

ভাবিয়া, এত দিন পূজা করিলাম,—সময়ে তিনিও বাম হইলেন;—এ দুস্তরে আমায় একাকিনী ফেলিয়া চলিয়া গেলেন! তবে, আর কার জন্য আশা? কার জন্য মায়ার বন্ধন? সুকুমারী তারা? তা তার প্রতিও বেশী আশা করিতে, তিনি আমায় নিষেধ করিয়া গেলেন।—তবে তারাও আমায় ফাঁকি দিয়া যাইবে! কিংবা——যাক্, সে চিন্তা আর করিব না। কিন্তু এ দুঃখের সংসারে, তবে সত্য সত্যই আমি একক হইব? হায়! আমার সেই পুণ্য-প্রাণ পিতৃদেব, পুণ্যবতী মাতৃদেবী,—তাঁহারাই বা আজ সব কোথায়? তনয়ার এ দশা দেখিবার অগ্রেই, তাঁরা ইহ-সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন! তবে, আমার আপনার বলিতে আর কেহ রহিল না? হায়! আমি কাঁদিতেও পারিতেছি না,—আমার শোক ক্রন্দনেরও অতীত হইয়া গিয়াছে! এ হৃদয় শ্মশান; এত দিনে আমি অন্তরে বাহিরে পাষাণ হইয়া রহিলাম। তবুও এই পাষাণে নির্ঝরিণী বহাইতে হইবে।—ইহা তাঁহারও আদেশ,—জননী অন্নপূর্ণারও প্রত্যাদেশ। ভাল, তাহাই হইবে। আমি পাষাণে বুক বাঁধিলাম।—এখন, লও দেব! দাসীর মানসিক পাদ্য-অর্ঘ্য লও! জননি, অন্নপূর্ণে! তাপিতা তনয়াকে কৃপা কর। আর আমার এ রাণীগিরিতে কাজ নাই;—আজ হইতে আমি তপশ্চারিণী—বিধবা।

বিধবা,—সধবার দাসীর যোগ্যাও নয়,—সে বড় দুর্ভাগ্যবতী। হায়, পিসিমা! তুমি এখন স্বর্গে;—আজ তোমার সেই 'বিধবা' কথার অর্থ, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি!"

এমন সময় দূরে কে গান গাহিল। স্বর যেন পরিচিত; কিন্তু ভাল করিয়া ঠাওরিয়া বুঝা যাইতেছে না,—গায়ক—কে? ভবানী সেই শীতল হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, একাগ্রমনে, রোমাঞ্চিত-কলেবরে শুনিতে লাগিলেন, কে যেন গাহিতেছে,——

(মেঘ—একতালা।)

এই ত মা দিন এসেছে তোমার,
বৈধব্য-জীবন ব্যথা সহিবার,
ব্যথা পেয়ে ব্যথা ঘুচাবে ধরার,—
এ সৌভাগ্য কার হয় গো জননি!

যা করেন বিধি মঙ্গল-কারণ,
জেনো পতিব্রতে, মনে অনুক্ষণ,
বিধবা বলিয়ে ভেবনা কখন,
পাষাণ তোমার হ'য়েছে পরাণী।

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দেবত্ব দেখাবে,
দানে ধ্যানে পুণ্যে ভারত মাতাবে,

অন্ন পেয়ে লোকে উচ্চ-কণ্ঠে গাবে,
অন্নপূর্ণা নামে 'জয় মা ভবানী।'

উন্নত-প্রথায় কর লোক-হিত,
মাতৃস্নেহে কেহ না হবে বঞ্চিত,
সমগ্র জগৎ হবে মা স্তম্ভিত,
করুণায় তব, করুণারূপিণি!

শৈশবে এঁকেছ' যে করুণা-ছবি,
হৃদয়ে রেখেছ' যে প্রতিভা-রবি,
বর্ণিতে না পারে কোন ভক্ত কবি,
এমনি মা তুমি মানসমোহিনী।

ত্যেজ' ধরাসন, মেল মা নয়ন,
কে বলে তোমার নিষ্ফল জীবন,
দয়া-ধর্ম্মে কর ব্রত উদ্যাপন,—
হে শুভে, সাধিকে, সুব্রত-ধারিণি!

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

জননী—অন্নপূর্ণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজ-রাণী ভবানীর এখন ব্রহ্মচারিণীর বেশ।—মণি-মুক্তা-রত্নালঙ্কারের লেশমাত্রও অঙ্গে নাই,—পট্টবাস পরিধান, রুক্ষ কেশ, রুক্ষ দেহ, হবিষ্যান্ন আহার,—তথাপি সে দেহের লাবণ্যে দিক্ আলোকিত। তপ্ত কাঞ্চনপ্রভা উজ্জ্বল গৌরবরণ, প্রশান্ত গম্ভীর বদন, নয়নের মাধুর্য্যময় দীপ্তি, সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তির ভাব,—সে মূর্ত্তি দেখিলে মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। সদাই জপ তপ, সদাই পূজাহ্নিক, সদাই ধ্যান-ধারণা, সদাই শাস্ত্রালাপ ও পুরাণ-পাঠ শ্রবণ,—কুশাসন-উপবিষ্টা, নিমীলিতনয়না সে যোগিনী মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ বৈরাগ্য ও মুক্তি,—রাজগৃহে বিরাজ করিতেছেন।

অতিথি-অভ্যাগত ও পোষ্য-পরিজন সকলকে বিবিধ

উপাদানে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া,—বেলা আড়াই প্রহর গতে স্বহস্তে হবিষ্যান্ন পাক,—প্রতিদিন দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে আপন হাতে রন্ধন করিয়া খাওয়ান,—নিজের সেই একবার মাত্র অতি সামান্য আহার,—'অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী' মহারাণী ভবানী,—সর্ব্ববিধ বিলাস ও ভোগ, জন্মের-মত বর্জ্জন করিয়া, এই ভাবে হিন্দু-বিধবার দৈনিক নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। অন্যূন দেড় কোটী টাকা যাঁহার জমিদারীর আয়,—যাঁহার অধিকার-ভূমি পরিভ্রমণ করিতে পঁয়ত্রিশ দিন সময় লাগে,—(তদানীন্তন রাজসাহী জেলা এত বড় বিস্তৃত ছিল) যাঁহার মুখের 'রা' শব্দ শুনিবার জন্য অসংখ্য দাসদাসী প্রতিনিয়ত যোড়হস্তে দণ্ডায়মান, তাঁহার এই দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা,—এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালন! আর মানসিক কষ্ট?—তাহা সেই সতী-সাধ্বী অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন!—সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় স্বামি-বিয়োগ, দুই-দুই পুত্রের বিয়োগে চির-দিনের মত বংশলোপ,—অতুল ধনসম্পদভোগের লোকা-ভাব,—হিন্দু-বিধবার পক্ষে এ কষ্ট তুষানলদহন তুল্য। পরন্তু এ দহনও, সেই সতী-লক্ষ্মী অম্লানবদনে সহিতে লাগিলেন। সহমরণে একবার মাত্র পুড়িতে হইত; বাঁচিয়া থাকিয়া, জ্বালাময়ী স্মৃতি লইয়া, রহিয়া-রহিয়া পুড়িতে-ছেন;—তাহাও ক্রমে সহিয়া গেল। কেন না, তাঁহার

পতিদেবতা অন্তিম-শয্যায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাকে আরও সহিতে হইবে,—সহিয়া-পুড়িয়াও তাঁহাকে সৌরভ বিলাইতে হইবে!—বেদ-বাক্যের ন্যায়, স্বামীর সে উপদেশ সতীর অন্তরে জাগরূক আছে।

এখন ভবানী শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্মেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বঙ্গের নানাস্থানে জলাশয় খনন, পুষ্করিণী ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ, সাধু-সন্ন্যাসী ও মহান্তগণের জন্য ধর্ম্মশালা স্থাপন, অনাথ ও পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য আশ্রম নির্দ্দেশ,—তাহাদের চিকিৎসা, পথ্য ও ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়,—এইরূপ নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত পথ-ঘাট প্রস্তুত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বৃত্তি ও ভূসম্পত্তি দান, সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত, দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দায়োদ্ধার, অক্ষম ও দুঃস্থ গৃহস্থ-পরিবারবর্গকে নিয়মিত সাহায্য,—এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ পুণ্যকর্ম্মে, তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতে লাগিল।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে,—ইতর-ভদ্র সকলকেই, ভবানী দুই হস্তে দান করিতেন। তাঁহার নিজ অধিকারে বা অধিকারের বাহিরে, কাহারও কোনরূপ অভাব, ক্লেশ বা দুঃখ-দৈন্যের কথা কাণে শুনিলে তাঁহার প্রাণ

কাঁদিয়া উঠিত,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবিলম্বে তিনি তাহা মোচন করিয়া দিতেন। তিনি একবার যে দানের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেন, তহবিলে টাকা না থাকিলে, ঋণ করিয়া—এমন কি, সময়বিশেষে আপন অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়াও, তাহা সম্পন্ন করিতেন। কেননা, তিনি জানিতেন, কাহাকেও একবার আশা দিয়া,—যে কোন কারণে হউক, সেই আশ্বাসিত ব্যক্তিকে নিরাশ করিলে, মহাপাতক হয়,—সেই দুর্ভাগার নীরব নিশ্বাস ও অন্তর্নিহিত কষ্টের ফলভোগ,—কোন-না-কোন প্রকারে, কখন-না-কখন, তাঁহাকেই করিতে হইবে। এমন ভাবে পর-ব্যথা-বোধ ও আত্মপ্রসাদের অনুভূতি যাঁহার থাকে, নরলোকে তিনিই দেব-পদবাচ্য হন। রাণী ভবানীও তাই, মানবী হইয়াও দেবী-পদে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন।

দিবা-রজনী অধিকাংশ কাল দেবার্চ্চনা ও জপ-তপ প্রভৃতিতে আপনাকে নিযুক্ত থাকিতে হয়,—এমত অবস্থায় পাছে কোন অর্থী বা অভাজন, অথবা কোন দায়গ্রস্ত ব্যক্তির—বিলম্বহেতু কষ্ট বা কার্য্যের ক্ষতি হয়, এই জন্য পরদুঃখকাতরা দয়াময়ী ভবানী, দানের বড় একটি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দান-ভাণ্ডার একের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, পদ ও যোগ্যতা অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীকে তিনি এই দৈনিক দানের প্রতিভূ নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। পোদ্দার, তহবিলদার, নায়েব ও দেওয়ান, —পর্য্যায়ক্রমে এই চারিজনের হস্তে তিনি এই ক্ষমতা দিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারী চতুষ্টয় স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিতেন। ভিক্ষা বা প্রার্থনা করিতে আসিয়া,—সে ব্যক্তি যে-ই হউক,—মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া না যায়, ইহাই রাণীর বিশেষ আদেশ ছিল। এই আদেশ অনুযায়ী এক টাকা হইতে একশত টাকা পর্য্যন্ত দান চলিতে পারিত। যে কোনও ব্যক্তিকে,— পোদ্দার ইচ্ছা করিলে এক টাকা,—তহবিলদার পাঁচ টাকা,—নায়েব দশ টাকা,—এবং দেওয়ান একশত টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিতেন। এজন্য আর রাণীর স্বতন্ত্র অনুমতি লইবার আবশ্যক ছিল না। পরন্তু ইহার অধিক কাহাকে দিবার প্রয়োজন হইলে, কর্ত্রীর আদেশ অপেক্ষা করিতে হইত। বলা বাহুল্য, সে আদেশও তাঁহার কর্ণ-গোচর সাপেক্ষ মাত্র—কানে শুনিয়া তিনি কাহাকে 'না' বলিতেন না।—বুঝুন, দানের ব্যাপার!

ইহা ব্যতীত পর্ব্ব ও পূজার দানের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তখন একেবারে অবারিত দ্বার। দেশ দেশান্তর হইতে শত শত লোক, শত শত প্রকার অভাব ও অভিযোগের কথা বলিয়া, 'জয় মা ভবানী' বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইত,—আর তদ্দণ্ডেই তাহাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া

যাইত। সদাব্রত—অন্নসত্রের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র থাকিলেও, কাঙ্গালী-ভিখারীগণের এ সময়ে আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সহস্র সহস্র অনাথ ও আতুর, সুস্বাদু মিষ্টান্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া, নববস্ত্রে ভূষিত হইয়া, রজত মুদ্রালাভে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, দুই বাহু তুলিয়া, উচ্চৈস্বরে—"জয় মা ভবানী অন্নপূর্ণা" বলিয়া, আকাশ-মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিত। আর সে দৃশ্য দেখিয়া, —সে প্রাণস্পর্শিনী মা-মা ধ্বনি শুনিয়া, দীন-জননী দয়াময়ীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত,—তাঁহার চক্ষে অমৃত-বারি বিগলিত হইতে থাকিত। তখন তিনি মনে মনে বলিতেন,—"এই আমার স্বর্গ, এই আমার তপস্যা। প্রাণবল্লভ! তুমি ঐ নিত্যধাম হইতে আমার এই নয়ন-বারি দেখ,—আমার মানস-পূজা লইয়া আমাকে ঋণ-মুক্ত কর দয়াময়!"

দীন-দুঃখীকে যেমন দয়া, জীব-জন্তুর প্রতিও করুণা-ময়ী রাণীর সেইরূপ স্নেহের টান্। সেই বাল্যের সেই খেলা-ধূলার বয়সে—যেমন সেই পিপীলিকা-গর্ত্তে শর্করা ও মিষ্টান্ন দান,—চড়ুই পারাবত প্রভৃতি পক্ষিকুলকে তণ্ডুল-ছোলা-জল দান,—রাজ্যেশ্বরী হইয়া—এই প্রৌঢ়েও তাঁহার —জীবজন্তুর প্রতি সেইরূপ স্নেহানুরক্তি। গবাদি পশু ও বিভিন্ন জাতীয় পক্ষিগণের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন আহার—

তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিতরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এইরূপ, ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গটি পর্য্যন্ত তাঁহার এই মাঙ্গলিক ব্যবস্থায় বঞ্চিত হইত না। এ সকলের যথা-যোগ্য দৈনিক আহার তিনি যোগাইতেন। জীবের আহার যোগাইয়া, মহা মাতৃভাবময়ী, অন্নপূর্ণারূপিণী ভবানী ভাবিতেন,—

"ঈশ্বরের রাজ্যে সকল জীবই সমান। সকলকেই অন্নজল-দানে সমান ভাবে শীতল করিতে হইবে। মা-অন্নপূর্ণার রাজ্যে, আমার জ্ঞাতসারে, কোন জীব না অভুক্ত থাকে,—আহারাভাবে মৃতকল্প না হয়,—আমার জীবনের এ বড় সাধ। মা শক্তিরূপিণি, শুভঙ্করি! তুমিই আমার প্রাণের এ সাধ পূর্ণ করিও।—মাগো, তোমার তহবিল-ভাণ্ডার আমার জিম্মায় রাখিয়াছ মাত্র,—আমি যেন ইহাতে কোনরূপে তঞ্চকতা না করি;—এ গচ্ছিত ধনে আমার যেন লোভ না আসে মা!—তোমার তহবিল যেন তোমার অর্থেই খরচ করিয়া যাইতে পারি;—আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর জননি! এই রাজ্য, রাজসম্পদ,—এই ধন-দৌলৎ,—কিছুই আমার নয়,—সকলই তোমার;—এই ধারণা ও বিশ্বাস যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে ব্রহ্মময়ি!—তাহা হইলেই এ কারাগারে মুক্তি পাইব বোধ হয়,—কেমন মা?"

এই ভাবেই রাণীর চিন্তা ও আত্ম-নিবেদন ;— সর্ব্বান্ত-র্য্যামিনী চিণ্ময়ীর চরণে এই ভাবেই সতী আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভবানী নিজে বিধবা হইয়াছেন, আর অতি শৈশবেই সেই বিধবা পিসীর দুঃখে আন্তরিক দুঃখিতা হইয়া এতকাল পর্য্যন্ত সেই ভাব অতি যত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতে-ছেন,—সুতরাং বিধবাদের প্রতি এক্ষণে তাঁহার মনোভাব কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়।—পতিহীনা সতীনারী তাঁহার চক্ষে দেবীসমা গরীয়সী। তাই যেখানে যত বিধবা ছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন পুরীতে আনাইতেন, এবং সমাদর করিয়া স্বহস্তে তাঁহা-দিগকে খাওয়াইতেন,—তাঁহাদের সুখ-দুঃখ অভাব-অনাটনের কথা স্নেহসূচক কণ্ঠে খুঁটিয়া-খুঁটিয়া—জিজ্ঞাসা করিতেন ;—অপিচ সর্ব্বত্যাগিনী ও অন্তরের অন্তরে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী দেখিলে, তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতেন! এ সংসারে প্রাণের সহানুভূতি নাকি বড় বিরল, তাই সেই সম-অবস্থাপন্ন বিধবাও, রাণীর সহিত নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

ভবানীর কৃপায় এই সকল বিধবাকে কখন কোনরূপ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। সচ্ছলে যাহাতে তাঁহাদের ভরণ-পোষণ হয়, এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের ইচ্ছামত

ধর্ম্মকর্ম্ম ও তীর্থদর্শন প্রভৃতির সুবিধা হইতে পারে,—পরহিতব্রতা রাণী তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। পক্ষান্তরে যে সকল রমণী সহমরণের পক্ষপাতিনী ছিলেন, যাঁহারা—স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া মৃতপতির অনুগমন করিতেন, তাঁহাদিগকেও ভবানী অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। সহমরণে-গমনোদ্যতা সতীসাধ্বীর পদধূলি তিনি মস্তক পাতিয়া লইতেন। আবশ্যক হইলে, সেই সতীর শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি, সমারোহে সম্পন্ন করিতেন, এবং তাঁহার বংশাবলীর মধ্যে যদি কোন অক্ষম স্ত্রী বা পুরুষ থাকিত, তাহাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বৃত্তি বা মাস-হারার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এইরূপ সহানুভূতিসূচক কল্যাণকর কার্য্যে,—বিধবাগণের দুর্ব্বহ জীবন-ভার কথঞ্চিৎও লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছেন ভাবিয়া, ভবানী মনে একটু শান্তি পাইতেন এবং তখন সেই পিসীকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার চির-মুক্তি কামনা করিতে করিতে, নীরবে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিতেন। মনে মনে বলিতেন,—

"পিসী মা, তুমি চির-জীবন কি কষ্ট সহিয়া আসিয়াছিলে, তাহা আমি পূর্ব্বেও বুঝিয়াছি,—আর এখন তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি। তুমিই আমার জীবনে প্রথম এই দুঃখের ছবি অঙ্কিত করিয়া

দিয়াছিলে ;—সহিয়া-সহিয়া আমি মানুষ হইয়াছি,—তাই দুঃখকে এখন ভালবাসিতে শিখিয়াছি ;—এবং সেই জন্যই তোমার পুণ্যেই এ কঠিন ব্রত পালন করিতে এখন আর আমার কষ্ট হয় না।—তোমার জন্য আমি আর কি মঙ্গল কামনা করিব পিসী মা?—কেবল এই প্রার্থনা করি, আর যেন তোমায় জন্মগ্রহণ করিতে না হয়,—পতিসনে অনন্ত-কাল যেন তুমি ঐ বৈকুণ্ঠে স্থান পাও!—আর তোমার সহিত, আমিও যেন মা এই পরমা গতি লাভ করিতে পারি।"

পক্ষান্তরে, সধবা ও কুমারীগণের প্রতিও ভবানীর অচলা নিষ্ঠা। সধবা—পতির অর্দ্ধাঙ্গী ; আর কুমারী—ভাবী পতির গৃহলক্ষ্মী। এক সময়ে তিনি যেরূপ আদরিণী ও স্নেহানন্দদায়িনী ছিলেন, এই ভাগ্যবতীগণও এক্ষণে সেইরূপ। এমন যার ভাগ্য ও লক্ষণ, তাহাকে পূজা করিতে হয়। বিশেষ শাস্ত্রের উক্তি,—সধবা ও কুমারী-পূজায় জন্মান্তরে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়,—তাহাকে আর তুষানল-দহন-তুল্য বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তাই সতীলক্ষ্মী ভবানী, পর্ব্বে ও নির্দ্দিষ্ট দিনে, আন্তরিক অনুরাগ ও [illegible]-সহকারে, শত সহস্র সধবা ও কুমারীকে পূজা করিয়া, অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র পট্টবস্ত্র, শঙ্খ-বলয় ও সুবর্ণ-নথ সধবাগণের মধ্যে

বিতরিত হইও,—আর প্রতি দুর্গোৎসবের সময়, প্রতিপদ হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত, একশত কুমারীকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে—কায়মনোবাক্যে তিনি পূজা করিতেন। পূজা সমাপনান্তে, মৃতপতির উদ্দেশে, সতী বলিতেন, "প্রাণবল্লভ! এ জন্মে ত এ জীবন শ্মশান হইয়া আছে;—এ ছাই-ভরা বুকে কি তুমি আবার বসিবে? আবার কি হায়! এ শ্মশানে ঐ সোনার পারিজাত ফুটিবে?"

অশ্রুজলে বুক প্লাবিত হইয়া যাইত; সতী ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। পরে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া, এ মর্ম্মান্তিক জ্বালা একটুকু উপশম করিতে চেষ্টা পাইতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এত পারমার্থিকী চিন্তা ও এত পূজার্চ্চনার মধ্যেও ভবানী কেমন একটু সময় করিয়া, বৈষয়িক কার্য্যাদিও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়া লইতে পারিতেন। ব্যাপার বড় সাধারণ নয়,—তদানীন্তন রাজসাহী জেলার মত অত বড় একটা জমিদারী,—বার্ষিক আয় যার দেড় কোটী টাকা,—সেই জমিদারীর কার্য্য,—তাহার হিসাব-নিকাশ, আয়-ব্যয় ঠিক করা,—সন-সন নবাব-সরকারে নির্দ্দিষ্ট কর দেওয়া,—কোন্ কর্ম্মচারীকে কি কার্য্যের ভার দিলে সহজে হইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করা,—কোন্ সংপন্থা অবলম্বন করিলে জমিদারীরও আয় বাড়ে, প্রজারও হিত হয়,—দেওয়ান-গোমস্তাদিগকে সেই সব পরামর্শ দেওয়া,—ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার

সূক্ষ্ম বৈষয়িক কার্য্য তিনি অতি অল্প সময়ে অনায়াসে সমাধা করিতে পারিতেন। ইহা ব্যতীত প্রজাগণের বিবাদ-নিষ্পত্তি, সালিসী করিয়া দুই পক্ষকে মিটাইয়া দেওয়া, অপরাধীর বিচার ও ন্যায়-অন্যায় অবধারণ করা,— সকল কার্য্যেই ভবানীর অমানুষী প্রতিভা ও অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয় যে, একজন অন্তঃপুরবাসিনী, অমন কোমল-প্রকৃতি ও ধর্ম্মময়-জীবন হিন্দুবিধবার এমন অসামান্য বিষয়-বুদ্ধি থাকিতে পারে! স্ত্রীলোক ত স্ত্রীলোক,—অনেক কূটবুদ্ধি পুরুষও তাঁহার নিকট বৈষয়িক নীতি শিখিয়া মানুষ হইতে পারে। অন্যে পরে কা কথা,—সেই পাকা-হাড় ঝুনো বুড়া দয়ারাম রায়ও এক এক সময়, তাঁহার নিকট হারি মানিতেন। অথচ সমগ্র দিবসের মধ্যে চারি পাঁচ দণ্ডের অধিক সময়, রাণী এজন্য ব্যয় করিতেন না। তাহাও আবার সম্পূর্ণ অনাসক্তির ভাবে। বৈষয়িক বিচার-বুদ্ধির উদ্ভাবন করিতেন, আর মন ও লক্ষ্য থাকিত—পারমার্থিক বিষয়ে।—তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মব্রতা সর্ব্বত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণীর যেমন বিষয়ে লক্ষ্য থাকা সম্ভবে, সেই বিষয়েই লক্ষ্য থাকিত। একাধারে এইরূপ দুইটি বিরোধী ভাবের সমন্বয়,—ধর্ম্ম ও বিষয়-বুদ্ধির একত্র সমাবেশ,—যে একজন পুরমহিলা হিন্দুবিধবায় সম্ভবে, তাহা হঠাৎ কাহারও

কাহারও অসম্ভববোধ হইতে পারে।—বস্তুতঃ একই আধারে এরূপ কোমলতা ও কঠোরতার সম্মিলন,— এরূপ নারী ও পুরুষোচিত ভাব ক্বচিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয়ের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে থাকা,—তদবস্থায় সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া,—ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে মানব-মানবীকে পর্য্যন্ত প্রীতি-নেত্রে দর্শন করা,—ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ ভিন্ন, অন্যের পক্ষে একরূপ অসম্ভবই বটে।—রাজর্ষি জনকের কথা শুনিয়াছি, আর এই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পুণ্য-চরিত্র চিত্রিত করিতেছি,—কাহার প্রাধান্য অধিক, নিরূপণ করা কঠিন।

দিবা আড়াই প্রহরের পর, সেই একাহার হবিষ্যান্ন সেবন হইলে, ভবানী দেওয়ান-দপ্তরের একাংশে গিয়া, এক নির্দ্দিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট হইতেন। সে স্থানটি অর্দ্ধ-অন্দর—অর্দ্ধ-সদর—এমনিভাবে গঠিত। রাণীর আসনের সম্মুখে, আবরণ-স্বরূপ একটি পর্দ্দা থাকিত। বাহিরের লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হইলে, ভবানী সেই পর্দ্দার অন্তরাল হইতে একজন লোককে খাড়া রাখিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। আর দয়ারাম প্রভৃতি প্রাচীন ও পুরাতন কর্ম্মচারীগণ রাণীর সম্মুখে গিয়াই বৈষয়িক কাগজ-পত্র বুঝাইয়া দিতেন। ভবানী প্রতিদিনের কার্য্য প্রতিদিনই সম্পন্ন করিতেন—'কাল হইবে' বলিয়া কোন

কাজ ফেলিয়া রাখিতেন না। যে দিনের যে ব্যয়, মুন্সী তাঁহা পাঠ করিয়া শুনাইলে, ভবানী তাহা মঞ্জুর-স্বরূপ, স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। দেবসেবাই হউক আর অতিথি-সেবাই হউক, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াই হউক আর ভৃত্যাদির বখ্সিস বা বেতনাদির ব্যবস্থাই হউক,—তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রধান অমাত্যকেও চলিতে হইত,—নিম্ন-কর্ম্মচারীগণের ত কথাই নাই। তবে, কার্য্যের সুবিধার জন্য, তিনি কতক কর্ম্মচারীকে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্টকার্য্যের ভার ও ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছিলেন বটে।—যেমন পোদ্দার হইতে দেওয়ান পর্য্যন্ত তাঁহার বিনা অনুমতিতে,—এক হইতে একশত টাকা পর্য্যন্ত লোককে দান করিতে পারিতেন। অবশ্য সেই সকল বিষয়ের হিসাবাদি, তিনি একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া, বুঝিয়া-পড়িয়া লইতেন। তৎপরে, কোন্ দিন ও আগামী দিন কি কি করিতে হইবে,—তিনি বলিয়া যাইতেন, একজন মুহুরী তাহা লিখিয়া লইত। রাণী যাহাকে যে কার্য্যের ভার দিতেন, তাহাকেই সেই কার্য্য করিতে হইত,—সে আর অন্যের প্রতি সেজন্য হুকুমজারী করিতে পারিত না। তজ্জন্য কোন বিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ঘটিত না;—অত বড় রাজ্যটা যেন কলে চলিয়া যাইত।

ভবানীর বিচার-পদ্ধতি বড় সুন্দর ছিল। তদানীন্তন

রাজা ও প্রধান প্রধান জমিদারগণ, আপন অধিকারস্থ ব্যক্তিবর্গের অভিযোগের বিচার, আপনারাই করিতেন। অপরাধীকে সমুচিত দণ্ড দিয়া এবং নিরপরাধের মনঃকষ্ট দূর করিয়া, তাঁহারাই আপন আপন অধিকারের শান্তি ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন। সর্ব্বদর্শিনী—অপূর্ব্বত্বময়ী ভবানী, এই বিচার-কার্য্যেও একটু অপূর্ব্বত্ব দেখাইতেন।—তাহাতে অনেকের অনেক শিক্ষা হইত, দেশের প্রকৃত উপকার হইত,—লোকে বিস্ময়ে, পুলকে, ভক্তিতে অভিভূত হইয়া, উদ্দেশে তাঁহার চরণে প্রণাম করিত। এইরূপ অভিনব বিচার-প্রণালীর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এক সময়ে একযোগে তিনটি লোক অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া, রাণীর দরবারে আনীত হয়। প্রথমটির অপরাধ—ব্যভিচার; দ্বিতীয়টির অপরাধ—দাঙ্গা; তৃতীয়টির অপরাধ—চুরী। দয়ারাম রায় এই মর্ম্মের এক লিখিত বর্ণনা-পত্র রাণীকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সেই বর্ণনা-পত্রে অভিযোক্তার নাম, বংশ-পরিচয়, অপরাধের বিস্তৃত বিবরণ, সাক্ষী প্রভৃতির সবিশেষ কথা উল্লিখিত ছিল। পর্দ্দানশীন রাণী,—অথচ তাঁহার বিচার-দরবার। রাণী সেই পর্দ্দার আড়ালে অবস্থিত, কিন্তু তাঁহার আহ্বানক্রমে, সেই দিন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেই বিচার-মণ্ডপে উপস্থিত। এই শ্রেণীর বিশেষ অপরাধের বিচারে, রাণী সকলকে

আহ্বান করিতেন ;—তাই আজ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছেন। দয়ারামের লিখিত বিবরণীতে রাণী সকল কথা অবগত হইলেন। পরে দয়ারাম সেই সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকেও সকল কথা শুনাইলেন। অপরাধীত্রয় যোড়করে, অবনত মুখে দাঁড়াইয়াছিল ;—সাক্ষী-সাবুদ প্রমাণ প্রভৃতি চূড়ান্তরূপ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, তাহারাও কিছু অস্বীকার করিতে পারিল না,—ভাল-মানুষটির মত, ম্লানমুখে আপন আপন অপরাধ-স্বীকারে বাধ্য হইল।

তখন তীক্ষ্নদর্শিনী ভবানী, সেই যবনিকা-অন্তরাল হইতে, নিমেষমধ্যে, একবার সেই অপরাধী ত্রয়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। সেইরূপ চকিত দৃষ্টি-মাত্রেই, চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখিয়া, তিনি মানুষ চিনিতে পারিতেন। তাই অপরাধী ত্রয়কে সেই চকিতে দেখিয়াই, তিনি তাহাদের প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন, এবং সেই প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রত্যেককে ভিন্নরূপ দণ্ড দিতে, মনস্থ করিলেন।

প্রথম অপরাধী,—যে, ব্যভিচার অপরাধে আনীত, সে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র ; কুলীন কায়স্থ-সমাজে তাহার পিতৃ-পিতামহের যথেষ্ট সম্ভ্রম আছে, নিজেদের একটু জমি-দারীও আছে, ক্রিয়া-কলাপ ও করণ-কারণে ঘরাণা-ঘরে

তাহাদের বিশেষ একটু নামও আছে,—এ-হেন ঘরের ছেলে ব্যভিচার-অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইল, দেশের গণ্য-মান্য সকল ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের বংশাবলীর মাথা হেট হইল;—প্রখর অন্তর্দৃষ্টিশালিনী রাণী ভবানী সেই ব্যক্তির মনের তদানীন্তন ভাব যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইলেন; তাই তাহার প্রতি কোনরূপ কায়িক বা আর্থিক শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া, দয়ারামের দ্বারা কেবল-মাত্র একটু শাসাইয়া দিয়া, ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সতর্ক হইতে বলিয়া দিলেন। পরন্তু সেই সঙ্গে তাহার পিতৃ-পিতামহের নাম ও বংশের মান-সম্ভ্রমের উল্লেখ করিয়া, রাণীর আদেশমত, মন্ত্রী দয়ারাম রায়, সেই দশের মাঝে বলিতে লাগিলেন,—"ছি, বাপু, ছি! অমন বাপের বেটা হইয়া, তোমার এই কাজ! যাও, রাণী-মার আদেশ,—গৃহে গিয়া, একটি সৎ-ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা লইয়া, রীতিমত একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, শুদ্ধ হও গিয়া।"

এইবার দ্বিতীয় অপরাধীর বিচারের পালা। সে ব্যক্তি দাঙ্গার আসামী;—মার-পিট করিয়া একজনের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে।—এক বিবাহে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে বিবাদ হয়, বিবাদ শেষে দাঙ্গায় পরিণত হয়; এই ব্যক্তি মধ্যস্থ হইতে গিয়া, নিজের দলস্থ এক লোকেরই মাথা ফাটাইয়া দেন! সে বেচারীর অপরাধ,—ইঁহার

"আঁক্ আঁক্" চীৎকার শুনিয়া, ইহাকে ষাঁড় বলিয়াছিল! এই ষাঁড় মহাশয়—জাতিতে ব্রাহ্মণ;—একজন নামজাদা অধ্যাপক-পণ্ডিতের সন্তান;—তাহার বাপের টোলে স্মৃতি-ন্যায়-দর্শন পড়িয়া কত লোক মানুষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে হতভাগা কিছুই করিতে পারে নাই,—কেবল পৈত্রিক রাগ টুকু সুদসমেৎ ষোল আনা দখল করিয়া বসিয়াছে;—তাহার ফলে এই কীর্ত্তি! রাণী এই ব্যক্তির প্রতিও বিশেষ কোন দণ্ড বিধান করিলেন না,—ইহাকেও ঐ প্রথম অপরাধীর ন্যায়, দয়ারামের দ্বারা, তীব্র-মধুর ভৎর্সনা করিয়া, ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে বলিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন,—"বাপু হে, ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিয়াছ,—অত বড় ভট্টাচার্য্য-অধ্যাপকের সন্তান,—তা এমনি করিয়া কি পিতৃকীর্ত্তি বজায় রাখিবে?—রাগের বশে একেবারে একজনের মাথা ফাটাইয়া বসিলে? রাগ যে চণ্ডাল! এমন চণ্ডালকেও প্রশ্রয় দেয়? যাও,—বনে গিয়া, ফল মূল খাইয়া, এ দুরন্ত রিপুকে বশ কর, তোমায় আর লোকালয়ে থাকা সাজে না!"

অধ্যাপক-পুত্র, সেই দশের মাঝে, একেবারে মরমে মরিয়া গেল। ধিক্কার ও আত্মানুশোচনায় সে যেন কেমন হইয়া গেল।

এইবার তৃতীয় অপরাধীর পালা। এ অপরাধীটি—

চোর। নাপিতের ছেলে, নেশাটা-ভাংটা করে,—পয়সার অভাব হইলেই লোকের ঘটিটা-বাটিটা চুরী করিয়া বেড়ায়। তাহার উপদ্রবে গৃহস্থগণ অতি উত্যক্ত,—কাহারও স্বস্তি পাইবার যো নাই।—রাণী তার আস্থন্ত বিবরণ শুনিয়া, এবং তার আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া, হুকুম দিলেন, —ছয় মাস তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে!

ছয়-ছয় মাস এই কঠিন দণ্ডভোগের কথা শুনিয়া নাপিত-পুত্র একেবারে হাপুস্-নয়নে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হতভাগা, একবার দয়ারাম রায়ের পা দুটা জড়াইয়া ধরে,—একবার মাতব্বর দর্শকগণের নিকট গিয়া, 'হে বাপ্ সকলেরা রক্ষা কর' বলিয়া ধড়াস্ করিয়া পড়ে,—আর-বার বা বিকটকণ্ঠে "দোহাই রাণী-মা গো" বলিয়া তাঁহার বস্ত্রাচ্ছাদিত মণ্ডপ ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য যে, সে মণ্ডপের দুই পার্শ্বে দুইজন খাড়া-পাহারা ভোজপুরী, অমনি—'তফাৎ যাও বদমাস্' বলিয়া হুম্‌কী দিয়া উঠে, আর দুই ধাক্কায় নাপিত-পো ঢিট্ হয়।—তার এই বজ্জাতি-বুদ্ধি দেখিয়া, রাণী দয়ারামকে দিয়া দৃঢ়তার সহিত বলাইলেন,—"যদি পুনরায় এখানে এরূপ বেয়াদবি ভাব দেখাও, তবে ছ-মাসের জায়গায় পূরা-পূরি এক বৎসরকাল এ কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সাবধান,—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক।" পরে দয়ারাম,

রাণীর আদেশমত, কারা-রক্ষীকে আহ্বান করিয়া, তাহার হস্তে এই তৃতীয় অপরাধীকে সঁপিয়া দিলেন;—রাণীর হুকুম তাহাকে জানাইলেন। কারারক্ষীও অমনি—"যো হুকুম মহারাণী" বলিয়া, অভিবাদন করিতে করিতে, উৎসাহভরে নাপিত-পুত্রকে হাত-কড়ি পরাইয়া লইয়া গেল। রক্ষী, এর আগে নবাবের কয়েদখানায় কাজ করিত; সুতরাং এ সকল বিষয়ের কায়দা-কানুন তার বেশ জানা ছিল।

তিন ব্যক্তির বিচার সাঙ্গ করিয়া, রাণী সেদিনকার মত দরবার ভঙ্গ করিতে, দয়ারামকে আদেশ দিলেন।

এখন, ভবানীর এই বিচার-ফল লইয়া, সমাগত সভ্যবৃন্দের মধ্যে একটু কানা-ঘুসা—একটু ফুস্‌ফাস আলোচনা চলিল। একজন বলিলেন, "তা যদি সত্যি কথা বল, ত বলি,—পরামাণিকের পোটিকেও অমনি ঐ সঙ্গে ধমক-ধামক দিয়ে ছেড়ে দিলে হ'তো,—এ যেন কেমন এক-যাত্রায় পৃথক ফল হ'লো।"

(চোর পরামাণিকটি, এই সভ্যেরই পায় আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলেন!)

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমারও কতকটা ঐ মত্ বটে। তবে রাণী-মার হুকুম,—অবশ্য উনি ভালই বুঝে থাক্‌বেন।"

তৃতীয়।—হাঁ, তা বল্‌চ বটে, তবে কি জানো—যতই হোক্, উনি স্ত্রীলোক,—বিচারের সূক্ষ্ম মীমাংসা,—ও নিক্তির ওজন,—পুরুষ নইলে ঠিক রাখিতে পারে না।

চতুর্থ।—ঠিক ব'লেছ। এই দেখ না,—এক বেটা লম্পট, আর একটা খুনে,—তাদের কিনা 'মিষ্ট-মুখে তুষ্ট-করা-গোছ' দুটো ফাঁকা নীতি উপদেশ দিয়েই বিদায় ক'রে দিলেন,—আর নাপ্‌তের ছেলেটা ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে,—কি একটা কার ঘটী না বাটী নিয়েছিল,—তা তার কিনা হ'লো ছ-ছমাস শ্রীঘর-বাস!—তা ভাই যাই বল,—রাণী-মাকে আমি দেব্‌তার মত ভক্তি কর্‌লেও এ বিষয়ে তাঁর প্রশংসা কর্‌তে পার্‌লেম না।

পঞ্চম।—হাঁ, এ সব ফৌজদরী-ফরেব্বাবাজী মাম্‌লা,—রাণী-মার এ সকল ভার, আর কারো হাতে দেওয়াই ভাল। এতে ওঁর মাথা তেমন খোলে না। যতই হোক্, স্ত্রীলোক ত? এ রকম মাম্‌লা, গেল-মাসেও একটা হ'য়ে গেছে।—সেই যে, জান না?—যে মার খাইল, সে দু-ঘণ্টা কয়েদখানায় আটক থাকিল, আর একশত টাকা মুচলেকা লিখিয়া দিল; আর সেই পাগ্‌লোটা,—যে ঢিল ছুড়িয়া মারিয়া কপাল ফাটাইল,—সে কিনা রাজার হালে সরকারী-খরচে খাইয়া-মাখিয়া বেড়াইতেছে;—আবার

রাণী-মা সেইদিন থেকে তার পিছনে একজন পাহারাও মোতায়েন্ ক'রে দিয়েছেন।—বুঝ, ব্যাপারখানা।

(ঘটনাটি এই :—এক পুত্রশোকাতুর অৰ্দ্ধ ক্ষিপ্তকে পুনঃ পুনঃ ক্ষেপাইয়া এক ব্যক্তি মজা দেখিত, আর তার-দেখাদেখি আর দশজনও সেই কার্য্যে প্রশ্রয় পাইত ;—তার ফলেই সেই দুর্ভাগা অৰ্দ্ধ ক্ষিপ্তটি, শীঘ্রই পূর্ণক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ;—তখন সে, কে জানে ইট্ আর কে জানে পাথর, যা পায়, ছুড়িয়া মারে ;—সেই মার্ খাইয়া, সেই মজা-দেখা লোকটি রাণীর দরবারে অভিযোগ করে ;—বিচারে ভবানী সবিশেষ তদন্ত লইয়া, প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া, অভিযোগকারীকেই দণ্ড দেন,—আর দয়া ও সহানুভূতি-বশতঃ, পাগলকে প্রকৃতিস্থ করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ সাধু ব্যবস্থা করেন। তাহার ফলে, সেই পুত্রশোকাতুর অৰ্দ্ধক্ষিপ্তটি, প্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিয়াছে।)

যাহা হউক, অদ্যকার ঘটনাটিতে যখন অধিকাংশ সভ্য এক-মত হইলেন, এবং বিচক্ষণ দয়ারাম রায়ের গুপ্তচরও যখন সে সংবাদ গিয়া তাঁহার মনিবকে জানাইল, তখন দয়ারামের মনেও কেমন একটু খট্‌কা লাগিল। খট্‌কাটা আগেই লাগিয়াছিল, তবে ভবানীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বশতঃ তাহা বেশীক্ষণ মনে বসিতে পায় নাই ; পরন্তু

এখন যখন তাঁহার সেই গুপ্তচর আসিয়াও, আর পাঁচজনের মনের একইরূপ ভাব তাঁহাকে জানাইল, তখন তাঁহার সেই লুপ্তপ্রায় খট্‌কাটি আবার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল;—এবার যেন সেটি একটু জিনিয়া বসিল। দয়ারাম মনে মনে বলিলেন,—"না, এক বিষয়ে এত লোকের কখনই এমন ভুল হইতে পারে না,—আজিকার বিচারে রাণীমা-ই তবে ভুলিয়া থাকিবেন;—ঐ দুটো লোককে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই;—আর ঐ চোরটার ওরূপ কান্না-কাটী সত্ত্বেও, ছ-ছমাস কারাদণ্ড দেওয়াটাও যেন কেমন-কেমন হইয়াছে।—তা রাণী-মাকে, আমি সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারিব। তিনি আজিও এ বুড়াকে ভৃত্য বলিয়া মনে করেন না।"

পরদিন যথাসময়ে ভবানী সেই দেওয়ান-দপ্তরে আসিয়া যথাভাবে বসিলে, দয়ারাম আপন সঙ্কল্পমত, তাঁহাকে বিনীতভাবে একথা জানাইলেন। শুনিয়া রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "এখন এ কথার উত্তর আমি দিব না,—সময়ে তোমরা বুঝিবে,—আমার এ বিচার ঠিক ন্যায়মতই হইয়াছে।"

দয়ারাম আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ভাবিলেন, "মা আমার যখন এরূপ বলিলেন, তখন অবশ্যই সুবিচার হইয়াছে।—আমি বৃদ্ধ, কি বুঝিতে কি বুঝিয়াছি।

আর সভ্যগণও মার আমার অন্তরের কথা ধরিতে পারেন নাই।”

ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে,—এ কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, রাণী ভবানী একদিন সেই দেওয়ান-দপ্তরে বসিয়া, কি ভাবিয়া, দয়ারামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন;—তিনি আসিলে বলিলেন,—“এইবার একবার সেই অপরাধী তিনজনের সন্ধান লও দেখি? তাহারা কে কি ভাবে আছে, একবার খবরটা আনিয়া আমায় দাও দেখি?”

দয়ারাম।—কোন্ অপরাধী মা?

ভবানী তখন সেই পূর্ব্বোল্লিখিত অপরাধীত্রয়ের কথা, দয়ারামকে সবিশেষ স্মরণ করাইয়া দিলেন।

দয়ারামের আদেশক্রমে তখনই তিন চারিজন লোক ছুটিল। তাহারা সেইদিন রাত্রেই যে সংবাদ আনিয়া দিল, তাহা শুনিয়া দয়ারাম স্তম্ভিত হইলেন। যাই হউক, পুনরায় তিনি ঐ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, আরও দুইজন বিশেষ বিশ্বস্ত চর নিযুক্ত করিলেন,—তাহারাও সবিশেষ সন্ধান লইয়া, ঐ একই সংবাদ জানাইল। তখন যেন দয়ারামের চমক ভাঙ্গিল এবং সম্পূর্ণ চৈতন্য আসিল। তিনি ভাবিলেন,—“ছি, ছি, আমি এ কি নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিয়াছিলাম? অমন

মায়ের বিচারের উপরও আমার সন্দেহ জন্মিয়াছিল? কিন্তু রাণী ভবানী, এ কি অদ্ভুত শক্তি ধারণ করেন? সত্যই কি ইনি অন্তর্য্যামিনী?—তাই মানুষের মন বুঝিয়া এরূপ বিহিত ব্যবস্থা দেন?”

পরদিন আবার ভবানী যথাসময়ে সেই দেওয়ান-দপ্তরে আসিয়া উপবেশন করিলে, দয়ারাম যেন অতি অপরাধীর ন্যায়, আবেগভরে ছুটিয়া আসিয়া, ভবানীর পায়ের কাছে গিয়া পড়িলেন, এবং নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “মা, মা, তুমি কে মা? সত্যই তুমি রাজকুল-লক্ষ্মী!”

তার পর মনে মনে বলিলেন, “হায় হায়! এমন মহালক্ষ্মীর কপালেও এমন হইয়া গেল? মা আমার জন্মের মত সিঁথীর সিঁদূর মুছিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া রহিলেন?—হা ঈশ্বর!”

দয়ারামকে তদবস্থায় দেখিয়া, ভবানী যেন কিছু বিব্রত হইয়া, অতি স্নেহকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—“একি! কি হইয়াছে? তুমি এমন অবস্থায় কেন?—কৈ, সে অপরাধী তিনজনের সংবাদ আমায় আনিয়া দিলে না?”

“মা, তাই বলিতেই আমি আসিয়াছি। আমি একেবারে মূক হইয়া গিয়াছি। কি বলিয়া তোমায় সম্বোধন করিব, ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

দয়ারাম বলিতে লাগিলেন,—"মা, সত্যই আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না,—তুমি কিরূপে, এমনভাবে মানুষের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পার? মা, বলিব কি, তোমার কি সূক্ষ্ম সুবিচার,—সেই দুইজন অপরাধীকে,—যাদের প্রতি তুমি কোন দণ্ডবিধান না করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলে,—আর আমরা মূর্খতাপ্রযুক্ত যেজন্য তোমার প্রতি মনে মনে অনুযোগ করিয়াছিলাম,—তাদের একজন—সেই প্রথম আসামী,—আহা, সেই [illegible] পুত্রটি,—কাহাকে আর মুখ না দেখাইয়াই—সেই দিন রাত্রেই, অপমানে ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে!—আর সেই দ্বিতীয় আসামী—সেই অধ্যাপক-পুত্রটি, সেই বিচারের দিন হইতেই কেমন হইয়া গেল;—তাহার মনে কেমন একটা বিকার আসিল,—সে আর গৃহমুখী হইল না,—বিবাগী হইয়া কোথায় চলিয়া গেল;—এখন শুনিতে পাই, সেই অতি-বড় ক্রোধী—যেন ঋষি-তুল্য শান্তশিষ্ট ও সাধুস্বভাব হইয়াছে;—সে ব্যক্তি এখন তার পিতার নিকট অতি সংযতভাবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন করি-তেছে।—তাই বলিতেছিলাম, মা, তুমি দর্পণে প্রতিবিম্ব-দর্শনের ন্যায়, লোকের মনের ভিতর এমন প্রবেশ কর কিরূপে?—অপরাধীর প্রকৃতি বুঝিয়া, তাহাকে তদনুযায়ী শাস্তি দাও কেমন করিয়া?"

এই সময় অদূরে কি একটা কোলাহল উত্থিত হইল। দয়ারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটা লোককে পাচ সাতজনে পড়িয়া, পিছ্-মোড়া করিয়া বাধিয়া লইয়া আসিতেছে,—আর তার পিছনেও কতকগুলি লোক হৈ হৈ করিতেছে। দয়ারাম একটু ইঙ্গিত করিবামাত্র, সেই গোলমাল থামিয়া গেল;—বাজে লোকও সব সরিয়া পড়িল; কেবল দুইজন রক্ষী,—সেই বন্ধনদশাগ্রস্ত লোককে সেখানে আনিয়া হাজির করিল। একজন রক্ষী, দয়ারামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! এই ছিঁচ্‌কে চোরটার উৎপাতে পল্লীর লোক সকল তিষ্ঠিতে পারিতেছে না,—এর যা হয় একটা ব্যবস্থা আপনারা করুন। এইবার লইয়া পাঁচ-পাঁচবার এর চুরী ধরা পড়িল;—আর কতবার যে কত রকমে চুরী-চামারি করিয়া, ধরা না পড়িয়া, এ সাধু সাজিয়াছে,—তার সংখ্যা নাই। গৃহস্থের যার যে জিনিস চুরী যায়, এরি উপর সকলে সন্দেহ করে। হুজুর! বলিব কি, তে-রাত্রি পেরোয় নি,—হতভাগা এই ছ-ছমাস কয়েদ খেটে গেছে,—আবার এরি মধ্যে এই চুরী!—এই দেখুন হুজুর, ও-পাড়ার ময়রাদের একটি দু-বছরের ছেলের গলা টিপে এই হেঁসো নিয়ে পালাচ্ছিল।"

রাণী সেই যবনিকার অন্তরাল হইতে এই দৃশ্যটি আদ্যন্ত

দেখিলেন, এবং রক্ষীর মুখেও সকল কথা শুনিলেন ;—এইবার সেই চোরকে নির্দ্দেশ করিয়া, জনান্তিকে দয়ারামকে বলিলেন,—"দেখ দেখি, এই লোকটি কে ?—ইহাকে চিনিতে পার কি ?"

বৃদ্ধ দয়ারাম, চোরের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া, কট্‌মট করিয়া খানিকটা দেখিয়া, যেন বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ মা, এ যে সেই পুরোণো পাপী—নাপ্‌তে বেটা ? হাঁ, তাই ত ?—বেটা বদ্‌মায়েস, চোর ! উঃ ! তোমার এই ধড়িবাজী ? সেবার না ছ-মাসের কয়েদ-দণ্ড শুনে, কেঁদে ফুটি-ফাটা হ'য়েছিলে ?—মার বেটাকে !"

রক্ষিদ্বয় আবার প্রহারের উপক্রম করিল, রাণী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিষেধ করিলেন। তৎপরে হুকুম দিলেন,—"আজ এ অপরাধীকে হাজতে রাখ,—কাল এর বিচার হইবে।"

চোরকে লইয়া রক্ষিগণ চলিয়া গেল।

দয়ারাম স্তম্ভিত হইয়া রাণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "কি, দেখ কি ?"

দয়ারাম। মা, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর কথা কহিবার সাহস হয় না ! এমন অপরূপ বিচার দেখিয়াও আবার আমাদের মনে দ্বিধা বোধ হইয়াছিল ? এই

মহাপাপিষ্ঠের মায়া-কান্নায় ভুলিয়া, আমরা এর শাস্তি কঠিন হইয়াছিল বুঝিয়াছিলাম? মা, সত্যই তুমি বলিয়াছিলে, —'সময়ে তোমরা বুঝিবে,—আমার এ বিচার ঠিক ন্যায়-বিচার হইয়াছে।'—সত্যই মা, ন্যায়-বিচার হইয়াছে। তা তুমি যে মা ন্যায় ও ধর্ম্মের অবতাররূপিণী!—তোমার কাছে কি কখন অবিচার হয়?

"হাঁ, তা হয় বৈ কি?"

অতি কোমল-করুণ-কান্নার-স্বরে ভবানী বলিলেন, "হাঁ, তা হয় বৈ কি? হায়, কেন আমি সেই প্রথম অপরাধীকে কায়িক কোন দণ্ড দিলাম না? তার প্রতি সেই মিষ্ট-ভর্ৎসনাই বোধ করি অতি গুরুতর দণ্ড হইয়াছিল;—সেই দুঃখেই বুঝি বা সেই হতভাগ্য আত্মঘাতী হইয়াছে!"

দয়ারাম উত্তর করিলেন,—"তা মা, তাহাকে কি কোন কায়িক দণ্ড দিলেই সে বাঁচিত মনে কর? না মা, তা নয়,—তার দিন ফুরাইয়াছে,—ঐ ভাবেই সে যাইবে;—তোমার সাধ্য কি যে, তা নয় কর!"

ভবানী মনে মনে বলিলেন,—"সে কথা শতবার! জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,—ইহা 'নয়' করিতে দেবতাদেরও বেগ পাইতে হয়,—মানুষ কোন্ ছার! তবে ব্যবহারিক হিসাবে, একটা কথা থাকিয়া যায় বটে।"

দয়ারাম পুনরায় বলিলেন, "যা হোক মা, তোমার

এই অভিনব বিচার-পদ্ধতি, দেশাধিপতি নবাবের—এমন কি, স্বয়ং দিল্লীশ্বরেরও অনুকরণীয়।”

ভবানী। অন্যের অনুকরণীয় কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয়, সকল স্থলে এক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, দণ্ডবিধি পরিচালনা করাটা ঠিক নয়। পাত্র এবং প্রকৃতিভেদে—বিচারভেদের একটু ব্যবস্থা করিলে, আমার বোধ হয়, ভাল হয়। কেন না, এমন অনেক লোক আছে যে, তাহাদিগকে ধরিয়া মারিলেও লজ্জা বা অপমান বোধ করে না;—আবার এমনও অনেক আছে যে, একটু চক্ষু রাঙ্গাইয়া, ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক একটু দৃষ্টি করিলেই, যথেষ্ট হয়।—মারা ত দূরের কথা,—মুখে কোন কথা বলারও প্রয়োজন না।—তাহাতেই তাহারা মরমে মরিয়া যায়। এমন স্থলে কায়িক কি আর্থিক দণ্ডও, আমার মতে ঠিক নয়।

দয়ারাম। তা ত মা, তোমার এই বিচার-ফল হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি করিলাম? বলিবে, একজন আত্মঘাতী হইয়াছে; কিন্তু তৎসঙ্গে একথা বলিয়াও ত গৌরব করিতে পারি যে, আর একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ-সন্তান, দস্যু-গুণ্ডা-চোর-ধড়িবাজের সঙ্গে একত্রে বাস না ক’রে, জন্মের মত জাহান্নমে না গিয়ে,—চিরদিনের মত ভদ্র ও সাধু হইয়া গেল!—মা, বিচারকের পক্ষে এ কি কম পুণ্য?

ভবানী অন্য কথা পাড়িবার উপক্রম করিলেন,—দয়ারাম তথাপি বলিতে লাগিলেন,—"আর মা, এই নাপ্‌তেটার ছ-মাস কারাদণ্ড দেওয়া যে অতি ঠিক হইয়াছিল, এখন যেন তাহা আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি। ও হতভাগা স্বভাব-চোর,—ওর সাত-পুরুষ ঐ ক'রে কাটালে,—ওর কি ও-রকম মিষ্ট-ভৎসনায় কোন ফল হ'তো? এই দেখ না, কয়েদ-খেটে বেরিয়েই, হতভাগা আবার চুরী ক'রেছে! চুরীই ওর পেশা;—ওর ঐ রকম শাস্তিই ঠিক।—মা, তোমার কথাই সার; প্রকৃতিভেদে দণ্ডভেদই প্রশস্ত।"

ভবানী মনে মনে বলিলেন,—"কি যে প্রশস্ত, আর কি যে নয়,—তা ত বড়ই বুঝি!—মুখে আগুন এ বুঝা-পড়ার!—নহিলে ঐ চোরই বা কে, আর আমিই বা কে, এটা ভাবিতাম না? দূর হউক, এ রাণীগিরি চাকরি ঘুচিলেই বাঁচি!—আর কতদিনে এ আপদ দূর হবে মা? কতদিনে এ মায়ার বন্ধন সমূলে কাটিয়া, আমায় ছুটা দিবে জননি?"

ভবানী মনে মনে তখন—শৈশবের সেই গানটি আবৃত্তি করিলেন;——

"মাগো, আর কত কাল এ ভব-যন্ত্রণা।
যাতায়াত-ক্লেশ, হ'বে নাকি শেষ,
জনমে জনমে আর যে পারি না॥"

চোখে একটু জল আসিল,—'তারা' 'তারা' বলিতে বলিতে, তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সেদিন আর জমিদারীর কাজকর্ম্ম কিছু দেখা হইল না।

এমন ঘটনা মধ্যে মধ্যে দুই একদিন হইত। তাই ইতিপূর্ব্বে একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, অমন আত্মচিন্তানিরতা রমণীকু[illegible]র,—কূট বৈষয়িক-নীতি আয়ত্ত হইয়াছিল কিরূপে?

বলিয়াছি ত, রাজর্ষি জনক ও রাণী ভবানীকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়? তবে, মধ্যে দুই যুগ বহিয়া গিয়াছে,—ভবানী চোখের সামনে,—ইহাই যা বল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারী তারা, আঁধার-ঘরের মাণিকস্বরূপ, একালাই রাজগৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। দুই-দুই ভাই গিয়াছে, বাপ গিয়াছে, মা ত জপ-তপ দান-ধ্যান পূজা-আহ্নিক লইয়াই আছেন;—এক বেলা এক-মুষ্টি হবিষ্যান্ন আহার,—এই তাঁর প্রাণধারণার্থে ব্যয়,—দু'দিন বাদে এত বড় রাজ্যটা সুতরাং তারার বরাতেই আসিবে;—তারাই তার ভোগ-দখল করিবে।— তা এতটা ভাগ্য, এতটা জন্মান্তরীণ তপস্যা, তারার আছে কি? কি জানি, তারার পুণ্যবল কেমন?

পূর্ণিমার শশিকলা যেমন দিনে দিনে বাড়ে, বালিকা তারাও সেইরূপ বাড়িতে লাগিল। চন্দ্রমা-রশ্মি-সমুদ্ভাসিত ফুটন্ত মল্লিকার মত রূপ,—সে বালিকা-দেহে

যেন উথলিয়া পড়িল। নবনীত-কোমল শরীর যেন থুল্-থুল্ ঢুল্-ঢুল্ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। মায়ের যোগ্য মেয়ে বটে। বাপ সুন্দর, মা সুন্দর—দুই সৌন্দর্য্যের রাসয়নিক সংযোগে, কোন্ অদ্বিতীয় কারিকর, যেন ইচ্ছা-মাত্রেই, এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সৃজন করিয়াছেন! প্রতিমার অলোক-সামান্যা শোভা ও শ্রী দেখিয়া, সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

বিজন-বনে বনদেবীর মত, ভবানীর হৃদয়-শ্মশানে এ প্রতিমা আলো করিয়া রহিল। রাজা বিহনে, রাজ-কুমারদ্বয়ের চির-অন্তর্দ্ধানে, রাজপুরীর শোক-মলিন ভাব—বালিকা তারাই যেন হাসিয়া জাগাইয়া রাখিল। আলোকে যেমন অন্ধকার নাশ করে, রূপের মনোময়ী মূর্ত্তিতে তেমনি নূতন আনন্দ আনিয়া দেয়। আনন্দের সহিত আশাও ধীরে ধীরে আসিয়া থাকে। স্বামী গেল, পুত্র গেল, প্রকৃত উত্তরাধিকারী অভাবে রাজ্যপাট যেন নীরবে—বিষাদিত মনে কাঁদিতে লাগিল,—ভবানী অন্তরের অন্তরে এ ছবি অবলোকন করিতে লাগিলেন;—তেমন বিষম অবস্থায় একমাত্র কুমারী তারাই ভবানীর একটুকু মাত্র সান্ত্বনার স্থল হইল। অপরূপ রূপের সহিত তারার সেই ফুটন্ত হাসি, যেমন সেই বিষাদ-নীরব রাজপুরীকে জাগা-ইয়া তুলিল,—তেমনি সেই সঙ্গে বিধবা রাণীর সেই শোক-

দগ্ধ অন্তর, আশার স্নিগ্ধ হিল্লোলে, একটু একটু সরস হইয়া আসিতে লাগিল। তবে, এ সরসতায় তেমন প্রাণপোরা উৎসাহ, উল্লাস, কিংবা সজীবতা নাই। এবং এ আশাও অতি ক্ষীণ;—শিবরাত্রির একটি সলিতা মাত্র।—তৈলাভাবে এ সলিতাটিও না পুড়িয়া যায়!—মায়ের প্রাণ এই ভাবেই থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে। এমন অবস্থায় ভবানীর হৃদয়ে সুখ কি দুঃখ, উৎসাহ কি অবসাদ—কোন্ ভাবের তরঙ্গ উঠিতে পারে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। না ভাবিয়া, ভুক্তভোগী হইয়াও বুঝা যাইতে পারে।

যাই হউক, পরম সমাদরে—আদরের পূর্ণ মাত্রায়, তারা লালিত-পালিত হইতে লাগিল। 'একালা ঘরের থাথ্‌লা' হইয়া,—কন্যা হইয়াও পুত্রের অধিক সমাদরে, তাহার সুকুমার শৈশব কাটিতে লাগিল। একে সেই অনিন্দ্যসুন্দর অতুল্য রূপ, তার উপর অসীম ঐশ্বর্য্য-সম্পদ,—ভোগের বা ভাগের আর দ্বিতীয় জন নাই, সুতরাং যতদূর সম্ভবে,—আদরে, আনন্দে ও গৌরবে তারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মায়ের বুক-ভাঙ্গা প্রাণের স্নেহ খুব গভীর হইলেও, বাহিরে তাহার বড় বেশী বিকাশ ছিল না; না থাকুক,—পোষ্য-পরিজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সহৃদয়তার সম্যক্ স্নেহানুরাগে, নয়নানন্দরূপিণী তারা-

ফুল, আপন গৌরবে আপনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ফুলের সৌরভ, শোভা ও সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ হইল। ভবানী মনে মনে বলিলেন,—"ভগবন্! এ শোভা সার্থক হইবে কি? এ ফুল যোগ্যতর স্থানে গিয়া, সৌরভে ও গৌরবে, সংসার চির-আমোদিত করিয়া রাখিতে পারিবে কি? এ অভাগীর অদৃষ্ট বড় মন্দ; তাই সূচনাতেই এ আশঙ্কা হয় প্রভু!"

পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই, ভবানী কন্যাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাজকন্যার যেরূপ শিক্ষা শোভনীয়া, সেইরূপ শিক্ষাই তারা পাইতে লাগিল। মোটামুটি বর্ণ-পরিচয়াদি শিক্ষা দিয়াই, ভবানী যোগ্যতর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, প্রাচীন আদর্শে, কন্যাকে চিত্র, শিল্প, সঙ্গীত—এই সব কলা-বিদ্যাও একটু আধটু শিখাইলেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মেধা অধিক কিনা, ঠিক জানিনা,—তবে রাজকুমারী তারা, দুই বৎসর মধ্যেই এই সকল বিদ্যা, দিব্য একটু-আধটু আয়ত্ত করিল। ভবানী-সুতা তারা;—মায়ের ধার ত একটু পাইবে বটে?

সাত বৎসর বয়সেই তারার রূপে, রাজপুরী যেন নৃত্য করিতে লাগিল। এই অপরূপ রূপের সহিত আবার চিত্তরঞ্জিনী কলাবিদ্যার সংযোগ;—একাধারে যেন মণি-কাঞ্চন মিলন হইল। কি-জানি-কেন, এইবার যেন ভবানীর

বড় আনন্দ হইল। নির্ব্বাপিত সুখ-সাধ, আশা আকাঙ্ক্ষা—যেন পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। বহু দিন বন্ধের পর, যেন কোন পুরাতন বনিয়াদী বাড়ীতে, পুনরায় দুর্গোৎসবের আনন্দ-বাজনা বাজিয়া উঠিল। ভবানী সজল নয়নে গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"এ সময় কোথায় তুমি প্রাণের প্রাণ জীবনবল্লভ! এ শোভা তুমি দেখিলে না? তোমার প্রাণাধিকা তারার এ হাস্যময়ী লাবণ্যমূর্ত্তি, আমার এক-চক্ষে দেখিতে হইল?"

এক চক্ষু! অর্দ্ধাঙ্গিনী সতীলক্ষ্মী পতি-দেবতাকে হারাইয়া এক-চক্ষুই হন বটে! ভবানী মনে মনে বলিলেন, "তারা আমার সাতে পা দিয়াছে,—এইবার মার আমার দুই-হাত এক করিয়া, মাকে পরের করিয়া দিয়া, আমি বিদায় লই। আমার এ ভাঙ্গা বরাৎ;—বাছাকে পরের করিয়া দিলে যদি বাঁচিয়া থাকে! অন্য পক্ষে,—তারার জন্যে আমার পরকালের কাজও হইতেছে না। এ গঙ্গাহীন নাটোরে বসিয়া, আমার তীর্থধর্ম্ম সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। না, আর এ বন্ধনে থাকিতে সাধ নাই। মা অন্তর্য্যামিনি! তনয়ার সাধ পূর্ণ কর;—তারার-আমার একটি যোগ্য বর মিলাইয়া দাও;—আমি বিদায় লই।"

সপ্তম, অষ্টম ও নবম—এই বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া, তখনকার রীতি ছিল। 'গৌরীদানের ফল' হিন্দু

অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিতেন। 'করিতেন' বলিতেছি কেন,—এখনও প্রকৃত আস্থাবান্ হিন্দুতে করেন ;—তবে নানাকারণে কার্য্যে পারিয়া উঠেন না।

হিন্দুকুললক্ষ্মী রাণী ভবানী, বিজোড়-বৎসরে—সাতেই কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। পাত্রের অনুসন্ধানে ঘটককুল চারিদিকে ছুটিল। নাটোর রাজদুহিতার বিবাহ ;—নাটোর-রাজসম্পত্তির ভাবী অধিকারিণী,—তার উপর একাধারে অত রূপ ও গুণ ;—বড় সোজা ব্যাপার নয়। যে ভাগ্যবান্ এই কন্যারত্ন লাভ করিবেন, তাঁর কত-বড় জোর-কপাল হওয়া চাই, একটু ভাবিতে হইবে। যাই হউক, পাত্র মিলিল। রাজসাহী জেলার অধীন খাজুরা গ্রাম নিবাসী লাহিড়ী বংশোদ্ভব এক সম্ভ্রান্তব্যক্তির পরম রূপবান্ তরুণ পুত্রের সহিত শ্রীশ্রীমতী তারাসুন্দরীর বিবাহ-কথা ধার্য্য হইল।

নাটোরে মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। সমারোহে পথ ঘাট, হাট মাঠ নৃত্য করিতে লাগিল। রাজবাড়ী ইন্দ্রপুরী তুল্য শোভা ধারণ করিল। ভবানী বড় আশ্বাসে, মহা মহোৎসাহে, শুভদিনে, বিশেষ সাবধানে, কন্যার শুভবিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু হায়, তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার এই বড় আশার উপর, অদৃষ্ট অলক্ষ্যে থাকিয়া, বড় নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়াছিল!

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল; বরকন্যা বিদায়ের দিনে, ভবানী প্রচুর ভূসম্পত্তি সহ মণি-মুক্তা-হীরা-জহরৎ এবং বহু স্বর্ণমুদ্রাসম্ভারে জামাতাকে যৌতুক দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী ও চিরসুখী হইয়া ধর্ম্মপথে থাক। তোমার হস্তে এই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, যেন আমি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিতে পারি।"

অতঃপর কন্যাকে কহিলেন,—"মা আমার! তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ করিব,—যেন তুমি চির-এয়োস্ত্রী থাকিয়া, পতিপুত্র রাখিয়া, নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে পার;—ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

অদূরে সুবর্ণমণ্ডিত শিবিকা সজ্জিত ছিল। সকল মাঙ্গলিক কার্য্য যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বরকন্যা বিদায় হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এইবার ভবানী মনে মনে বলিলেন,—"নাথ! আজ তোমার বড় আদরের তারা—স্বামীর-ঘর করিতে যাই-তেছে;—উপর হইতে একবার দেখ,—তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর,—সে যেন চির-ভাগ্যবতী হইয়া, জন্ম জন্ম এই ঘর করিতে পায়!"

টিক্-টিক্-টিক্,—মাথার উপরে একটা শব্দ হইল। ভবানী ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতে-না-করিতে—ও কি ও! একটা

হাঁচিও যে পড়িল না? কম্পিত-বক্ষে ভবানী বলিয়া উঠিলেন,—"একি, আবার!"

মর্ম্মচ্ছেদকর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, ভবানী সজল-নয়নে, সজলনয়না তারার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন;—শিবিকাগমনোদ্যতা—স্বয়ং তারাই সে হাঁচি হাঁচিয়াছে!

কি জানি কেন, হঠাৎ তারা বড় দুঃখের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা, আমার আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা নাই,—আমি তোমার কাছেই থাকিব।"

ভবানী, কন্যার চিবুক ধরিয়া, স্নেহচুম্বন করিয়া, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"ছি মা, অমন কথা কি বলিতে আছে? ঘরের লক্ষ্মী ঘরে যাও মা,—স্বামীর ঘর গিয়া উজ্জ্বল কর।"

মুহূর্ত্তকালের জন্য ভবানী, যেন কেমন হইয়া গেলেন। পরে সে ভাব সাম্‌লাইয়া, কন্যা ও জামাতাকে, ধীরভাবে বলিলেন,—"একটু বসিয়া যাও।"

বর-কন্যা পুনরায় পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। পুরোহিত আবার আসিয়া, শুভযাত্রার শুভমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, মাতা জয়কালী দেবীর প্রসাদী জবা-বিল্বপত্র তাঁহাদের হাতে দিলেন। চারিদিকে আবার মাঙ্গলিক ধ্বনি উঠিল। বর-কন্যা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিবিকায় গিয়া উঠিলেন। বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে লইল। কিন্তু হায়!

বরের শিবিকা, যাই দুই-চারি-পা অগ্রসর হইয়াছে,—ক'নের শিবিকা হইতে অমনি পুনরায় সেইরূপ একটি হাঁচির শব্দ হইল।

"একি, আবার! না, আর ভাবিব না;—যা কর মা জগদীশ্বরি!"—ভবানী মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরগম্ভীরভাবে শিবিকাপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঘোর রোলে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু বাদ্য-ভাণ্ডের আড়ম্বরে,—বাহিরের জাঁক-জমকে, দৈব ভুলে না; অতি-সতর্ক, চারি-চক্ষু বিষয়ীর সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশে নিয়তির লেখা মুছে না। অসীম সাগরের অনন্ত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় কর্ম্মসূত্র অনন্ত—হিসাব-নিকাশে তাহার কতটুকু আয়ত্ত করিবে? এই জন্য প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি দৈবের আশ্রয় লয়। দৈববলে, কালবিশেষে অদৃষ্টকেও জয় করা যায়। কিন্তু সব সময়ে নয়।

প্রখর অন্তর্দৃষ্টিশালিনী, ভক্তিমতী ভবানী ইহা জানিতেন। জানিতেন যে, দৈববলই জীবের পরম সহায়। যাহার তাহা নাই, তাহার সকল থাকিয়াও কিছুই নাই। এই জন্যই, দৈবের সাধনা প্রয়োজন। দৈবই পুরুষকারকে

জাগাইয়া তুলে। তখন, প্রভু যেমন ভৃত্যের দ্বারা ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করেন, দৈবও তেমনি পুরুষকারকে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া স্বকার্য্য সাধিয়া লন। এ হিসাবে, প্রভুহীন ভৃত্য আর দৈবহীন পুরুষকার একই কথা—উভয়ের ক্ষমতা কতটুকু?

জামাতা-কন্যাকে বিদায় দিয়া, ভবানী যেন বুঝিতে পারিলেন, এই দৈব, তাঁহার প্রতি অনুকূল নন।—বুঝি বা তাঁহার অদৃষ্টে কি হয়!

"হাঁচি, টিক্‌টিকি, বাধা,—যে মানে সে গাধা"—এমনি একটা কথা, আজকাল, বড় বেশী-বেশী শুনিতে পাই। লেখক সত্য-কথা লিখিয়া 'গাধা' আখ্যা পাইতেও প্রস্তুত; তথাপি 'মনে মানি অথচ মুখে মানি না' বলিয়া, মিছা বাহাদুরী লইবার লোভে, ভেড়ার পালে মিশিতেও রাজী নয়!

ভবানী উচ্চসংস্কারসম্পন্না, আদর্শ হিন্দু-রমণী;—তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জিনিস হইতেই সারগ্রহণ করিতে জানেন,—সারগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই চির-প্রচলিত প্রবাদের মূলে যেটুকু সত্য আছে, তাহা তিনি মনের সহিত মিলাইয়া, আত্মজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া, আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বুঝিয়াছেন, এই সামান্য ঘটনা গুলিতেও, অবস্থা ও সময়বিশেষে, অতি গুরুতর

ফল সংঘটিত হয়। তাই, জামাতা-কন্যার বিদায়কালে, হাঁচি-টিকটিকির বাধাটা, তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না,—উপরন্তু যেন বুঝিলেন, কালের এই অস্পষ্ট আভাস, পরিণামে বা কি অশুভ-ফল সংঘটন করিয়া দেয়!

ফলে, হইলও তাই।—বিবাহের সাতদিনের মধ্যেই সেই রূপের নিখুঁৎ ছবি—ভবানীর জীবনাবলম্বন বালিকা তারা—বৈধব্যের কণ্টকাকীর্ণ মুকুট মাথায় পরিয়া চির-অবনতমুখী হইয়া রহিল!—সে মুখ ইহজন্মে আর উঠিবে না!

বালিকার কচি-মুখের হাসিরাশি ভাল করিয়া ফুটিতে-না-ফুটিতে, মুখেই মিলাইল। শরতের শোভাময়ী জ্যোৎস্না, ধরা-বক্ষে প্লাবিত হইতে-না-হইতে, কালমেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। জগতের আলোকরাশি, সহসা যেন কি যাদুমন্ত্রে চির-নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কেন, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে,—হায়! কে বলিবে?

ভবানী এ ভীষণ সংবাদ শুনিলেন। পাষাণীর ন্যায় স্থির, অবিচলিতা হইয়া শুনিলেন। চক্ষে একবিন্দু অশ্রু ঝরিল না,—নির্ব্বাক্, নিষ্কম্পা, স্থিরনেত্রা হইয়া, রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন, সেই মুহূর্ত্ত, তাঁহাকে শোক, দুঃখ বা কান্নার অতীত অবস্থায় লইয়া গিয়াছে!

কিন্তু অধিকক্ষণ আর তাঁহাকে এ অসহ্য যন্ত্রণা সহিতে হইল না;—একটা মর্ম্মচ্ছেদকর গভীর উষ্ণনিশ্বাসের সহিত—"মা, তারা" বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

সেই মূর্চ্ছিতাবস্থায় এক স্বপ্ন দেখিলেন।—সেই শৈশবের ও যৌবনের সেই বৈরাগ্যময় স্বপ্ন।—দেখিলেন, এবারও যেন মা-অন্নপূর্ণা, শান্ত-প্রসন্ন বদনে, ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—ও বড় স্নিগ্ধ করুণাপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ তিনি সেই ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন। উভয়েই উভয়কে দেখিতেছেন;—সে চারি-চক্ষুই যেন মিলিয়া-মিশিয়া অভেদ—এক হইয়া গিয়াছে;—দৃষ্টি পলকহীন। অনেক-ক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল;—মুখ দিয়া কাহারও বাক্যস্ফুরণ হইল না।

এইবার যেন জীব-জননী জগন্মাতার সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যময় মুখে একটু লাবণ্যময় হাসি-রেখা দেখা দিল। সে হাসিতে যেন ব্রহ্মাণ্ডের একটা মহারহস্য ফুটিয়া বাহির হইল। ভবানীও যেন মায়ের সে নীরব হাসির মর্ম্ম বুঝিলেন। তিনিও যেন তন্মুহূর্ত্তে ব্রহ্মময়ীর পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শোকতাপ সব বিদূরিত হইল। তিনি যেন নূতন মানুষ হইলেন। প্রথম তিনি কথা কহিলেন।

মধুবর্ষিণী পবিত্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি আদেশ মা? কন্যাকে কোন্ কার্য্যের ভার দিতে আসিয়াছ?" এবার মার মুখেও যেন কথা ফুটিল। কিন্তু সে কথা ব্যক্ত করিব, সে ভাষা কৈ? মা, তোমার ভাষা, তুমিই ফুটাইয়া লও!

মা বলিলেন, "বৎসে! এইবার—এতদিনে আমার সাধ মিটিয়াছে! তোমাকে যে ভাবে, যেমন অবস্থায় পাইবার আশা আমি করিতেছিলাম, সেই ভাবে, সেই অবস্থায়, সম্পূর্ণরূপে এখন তোমাকে পাইলাম। মা আমার! আরও কিছুদিন এই ধরাধামে, আমার কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। তুমি জন্মান্তরে, অনন্য-কামনায় এ বর চাহিয়াছিলে, আমি তাহা তোমায় দিয়াছি। এখন, বর পাইয়া পিছাইলে চলিবে কেন? এ বরের ইহাই নিয়ম। যে আমাকে চায়, তাহাকে সর্ব্বস্ব খোওয়াইতে হয়;—তবে আমি তার হই।—ঠিক্ তার মনের মত হইয়া রই। সে ভাবে—আমিই সেই; আমি ভাবি সেই আমি। দু'য়ের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। নরলোকও ক্রমে এ ভাব উপলব্ধি করে। তবে, সে বড় জোর-কপালের কাজ। তুমি আমার হইয়াছ, এখন আমিও তোমার হইলাম। তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব;—তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, আমি কোথায় নাই, আর কোথায় আছি। মা,

এইবার তবে পূর্ণরূপে ব্রত উদ্‌যাপন কর। এতদিন যাহা পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছ, এইবার তাহার পরিণতি দেখাও।

"দাও মা, জীবে আরও অন্ন দাও। ভব-ক্ষুধায় সে বড় কাতর, তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি কর। তোমার পরিপূর্ণ ভাণ্ডার,—কিছুরই অভাব নাই;—যা আমি দিয়াছি, তা আমার সন্তানগণ মধ্যে বিতরণ কর। দানে, ধ্যানে, ধর্ম্মে, তীর্থে, পুণ্যে, বৈরাগ্যে যথন যেরূপে ইচ্ছা হয়, আমার গচ্ছিত ধন আমার কার্য্যেই ব্যয় কর;—তোমায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

"মনে কর, তোমার সেই শৈশবের সেই ধূলা-খেলার দিন। শ্যেন্‌-কপোত লইয়া আমি যে মায়ার খেলা খেলিয়াছিলাম,—তাহাতেই তোমার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ;—এতদিনে তোমার সকল পরীক্ষারই শেষ। তুমি জয়লাভ করিলে। এই বিশ্ববিজয়িনী শক্তি লইয়া, তুমি যথন যেথানে যে ভাবে থাকিবে, দেবী বলিয়া আমার নামে পূজা পাইবে। জীবকে অন্নদানের সঙ্গে সঙ্গে,—শিব-পূজা, গঙ্গাস্নান ও সাধুদর্শন এই তিন কাজ এথন তুমি অনন্তকর্ম্মা হইয়া করিতে পারিবে। স্বর্গতুল্য বারাণসী ধামে, তোমার এ মহাকার্য্যের মহামিলন হইবে।

"জীব-জন্মের চরম সাধ, তুমি ইহজন্মেই মিটাইতে

পারিলে। 'জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে',—এই যে মহান্ ধর্ম্ম তুমি মানবজীবনের সার বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা তোমার সার্থক হইবে। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী হইয়া আছি।—সাংসারিক হিসাবে সকলই তোমায় পরিপূর্ণ মাত্রায় দিয়াও, জীবহিতার্থে আমিই আবার একে একে তাহা কাড়িয়া লইয়াছি। কেননা, সকলের হিতেই তোমার হিত। তাই তুমি পতি-পুত্রে বঞ্চিত হইয়াছ;—তাই তোমার শেষ আশাটুকুও ভাঙ্গিয়া দিলাম। কন্যার সংসার-মোহে পাছে তুমি লক্ষ্যভ্রষ্টা হও; পাছে অর্থের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্রও মায়া বসে;—এই জন্য এই কচি-বয়সেই তোমার তারার বৈধব্য-দশা ঘটাইলাম। তোমার ও তারার একত্রে অবস্থান, বিশেষ আবশ্যক বলিয়া, আমি তারাকে রাখিলাম,—নচেৎ তাহাকেও সঙ্গে লইতাম। তারার মলিন-মুখ দেখিতে দেখিতে, তুমি দ্বিগুণ উৎসাহে জীবের মলিনমুখ মুছাইতে পারিবে;—তারাও তোমার সেবা করিয়া, সংসারে মাতৃসেবার মাহাত্ম্য দেখাইবে,— এইজন্য তারাকে রাখিলাম। যাহা হউক, তারার জন্য তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই;—তোমার কন্যা—তোমার আদর্শই গ্রহণ করিবে।

"এখন উঠ বৎসে,—চৈতন্য লাভ কর।—চৈতন্যময়ী হইয়া জীবের মুক্তির পথ প্রসারিত করিয়া দাও। বলিয়াছি

ত, আমি নিজে কিছু করি না—যোগ্যপাত্র পেলে তার হাত দিয়াই আমার কাজ করিয়া যাই? মা আমার! তুমিই আমার সুযোগ্যা কন্যা;—তোমার দিয়াই আমি সকল কাজ করিয়া লইব। এখন উঠ বৎসে, চৈতন্যরূপিণি! জননী-অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া, তুমিই কিছু দিন জীবের পালন ও রক্ষা কর।—তোমার মহামাতৃরূপিণী মানবী-মূর্ত্তির সম্যক্ সাধ আমি মিটাইব। সাধ মিটিলেই তোমার মুক্তি;—আমি নিজে আসিয়া তোমায় কোলে লইব!"

ভবানী, ভবানীর মস্তকে করপদ্ম স্পর্শ করিয়া আশী-র্ব্বাদ করিলেন। কন্যা যেমন মাতার চরণে প্রণতা হয়, রাণী ভবানী তেমনি ভবের ভবানীর চরণে প্রণতা হইয়া, তাঁহার অমৃতশীতল পাদপদ্ম বক্ষেঃ ধারণ করিলেন। আহা-হা! বুক চির-জন্মের মত জুড়াইয়া গেল!

চৈতন্যসঞ্চারে ভবানী উঠিয়া দেখেন, মা আর নাই।——তিনি কি অন্তর্ধান হইলেন,—না, ভক্তের অঙ্গে মিলাইলেন?

মুহূর্ত্তকাল ভবানী নির্ব্বাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রতীক্ষায়, পুরমহিলাগণ ম্লানমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ভবানী একটি

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দয়ারামকে কেহ খবর দাও,—আজই তারাকে এখানে লইয়া আসিবার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

যথাদিনে তারা আসিল।—ম্লানমুখী কোমল-কলিকা, মলিন-বসনে, নিরাভরণা মূর্ত্তিতে, মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হায়! কে নির্ম্মম-কঠিন-পাষাণ-হস্তে, জন্মশোধ তাহার সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া দিয়াছে! সে শোভাময়ী সুখ-তারা, ভবানীর হৃদয়াকাশে আর উদয় হইবে না!

অবনতমুখী তারা, কাঁদ-কাঁদ মুখে, মায়ের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ভবানী, তখন প্রকৃত ভবানীর ন্যায়, কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সাহস দিয়া বলিলেন,—"ভয় কি মা! আমি তোমার আছি!"

তারার চোখ দিয়া তখন ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া, এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা! সেই জন্যই ত আমি তখন ব'লেছিলাম, আমার আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা নাই,—আমি তোমার কাছেই থাকিব।"

"তাই থাকিও মা। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্ব তীর্থে ফিরিব।"

"তীর্থ কেমন মা? আমার তীর্থ দেখিবার বড় সাধ।"

"তোমার সঙ্গে আমারও সে সাধ মিটিবে।"

আশ্চর্য্য! —ভবানীর চক্ষে, কেহ এক বিন্দু জল দেখিল না! শোকে জলও এমন জমিয়া যায়?

তা যায় বৈ কি? শোকে চোখের জলে কেহ নদী বহাইতে পারে; আর কেহ বা শোক সহিয়া-সহিয়া অগস্ত্যের সমুদ্র-গণ্ডূষের ন্যায় আপন উত্তপ্ত-বুকে, শোকের সপ্ত-সমুদ্রও শোষিয়া লইতে সমর্থ হয়!—প্রকৃতি ও অবস্থাভেদে এটি হইয়া থাকে। পরন্তু, যে কাঁদিতে পায়, তুলনায় সে অনেক সুখী।

দিনের পর দিন গেল,—শোক একটু পুরাতন হইয়া আসিল। রাজ-সংসার, বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম—আবার যথা-নিয়মে চলিতে থাকিল।

কিন্তু এইবার ভবানী ভাবিলেন,—"না, আর না।—আর মায়ায় মুগ্ধ হইলে চলিবে না। কেনই বা আর? সকল আশার ত অবসান;—তবে এইবার মায়ের আদেশ পালন করি। তারার মলিন-মুখ মুছাইতে মুছাইতে, জীবের মলিন মুখ মুছাইয়া দিই। আর কেন,—ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ফেলি!

"কিন্তু যে অবধি দেহ ধারণ করিতে হইবে,—ইহার রক্ষার জন্য একজন যোগ্যতর লোক চাই বটে। বিশেষ, এ রাজবংশের একেবারে উচ্ছেদ যাহাতে না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

"তবে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করি। বংশের নাম ও মান, সে-ই রাখিবে। সদ্বংশজাত একটি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-সন্তান পাইলেই তাহাকে শাস্ত্রসম্মত পুত্ররূপে গ্রহণ করিব। হাঁ, সেই ঠিক। তাহাতে সকল দিকই রক্ষা হইবে।"

বৃদ্ধ দয়ারামের সহিত এ বিষয়ে ভবানীর অনেক পরামর্শ হইল। দয়ারামও রাণীর মতে মত্ দিলেন। অনেক অনুসন্ধানে, ভবানীর পছন্দ-সই একটি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ-সন্তান মিলিল। এই বালকের নাম রামকৃষ্ণ।

ভবানী, বালক রামকৃষ্ণকে যথাশাস্ত্র দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মচারিণী রাণী, তাঁহাকেই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, বিষয়-কার্য্যের সহিত নিঃসম্পর্কা হইয়া, শেষজীবন পর্য্যন্ত গঙ্গাবাসিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণও ধার্ম্মিকের সন্তান ;—বিশেষ রাণী ভবানীর ন্যায় জননীর স্বর্গীয় আদর্শ সম্মুখে পাইয়া, তিনি যৌবনেই সংসারে বীতরাগ হন। তাই 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিপতি রামকৃষ্ণ' * নাম অপেক্ষা, 'রাজযোগী রামকৃষ্ণ' নামই তাঁহার অধিক খাটে। পুণ্যবতী দীর্ঘায়ুষ্মতী রাণী ভবানীর দেহাবসানের পূর্ব্বেই, তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এ সকল ঘটনার পূর্ব্বে, ভবানীর পুণ্য

* The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders, &c. By Loke Nath Ghose.

চরিত্রের আরও কয়েকটি চিত্র আমাদিগকে অঙ্কিত করিতে হইবে;—নহিলে তাঁহার দেবী ভবানী নামের সার্থকতা আমরা দেখাইতে পারিব না।

কন্যার বৈধব্য সংঘটন ও দত্তকপুত্র গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, ভবানী গঙ্গাহীন নাটোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যেখানে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কুলু কুলু তানে প্রবাহিতা হইয়া জীবকে স্বর্গের শোভা দেখাইতেছেন,—সাধিকা, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণা—অন্নপূর্ণারূপিণী রাণী,—বিধবা কন্যাকে লইয়া, সেইখানে প্রশান্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত—বর্ত্তমান আজিমগঞ্জের সন্নিকট—বড়নগর গ্রামের কথাই আমরা উল্লেখ করিতেছি। দ্বিতীয় বারাণসী তুল্য এই পবিত্র স্থান এক্ষণে জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। নাটোর গঙ্গাহীন স্থান বলিয়াও বটে,—আর মুর্শিদাবাদ—নবাব-বাটীর খুব নিকট হয় বলিয়াও বটে,—এই বড়নগরে নাটোর-রাজপরিবার—তাঁহাদের সৌভাগ্য-সূচনার সম-সময়ে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। আজিও লোকে তাহাকে 'বড়নগর রাজবাটী' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। স্থানটি অতি রমণীয়। ভবানীর দত্তকপুত্র সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ এই রমণীয় স্থানেই চির-সমাধি লাভ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী,—পুণ্যবতী মা আমার,—কুলু কুলু তানে আপন মনে চলিয়াছেন। জীবের নিস্তারের জন্যে মায়ের এ দ্রবময়ী মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যে আগমন। মা পতিতপাবনী; তাই দিন নাই—রাত নাই,—বড় দুঃখী জীবকে আপন তীরে আসিয়া জুড়াইতে ডাকিতেছেন। মায়ের সে প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিলে প্রকৃতই পুণ্য হয়। যাঁকে চোখে দেখিলে পুণ্য, তাঁর স্পর্শে যে মুক্তি, তার আর কথা কি? হিন্দুপুরাণে তাই গঙ্গার এত মাহাত্ম্য; আস্থাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু তাই গঙ্গাকে পতিত-পাবনী পরমেশ্বরী বলিয়া স্তব করে।

বড়নগরে, ভবানী যেখানে গিয়া বাস করিলেন, সে স্থানের গঙ্গার দৃশ্যটি, তখন অতি মনোহর ছিল। গঙ্গা

অতি বিস্তৃত, স্রোত পরিপূর্ণ। কাক-চক্ষের ন্যায় নির্ম্মল জল ঢল-ঢল করিতেছে। উভয় তীরে ঘন বৃক্ষশ্রেণী; একটু দূরে নিবিড় জঙ্গল। পবিত্র, প্রশান্ত, নির্জ্জন সে স্থান। সাধনার পুণ্যভূমি বটে।

নিজ গঙ্গার গর্ভ হইতে বড়নগরের রাজবাটীর ভিত্তি উত্থিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সুদৃশ্য বাঁধা-ঘাট। চারিদিকে মন্দির ও দেবালয়। পুণ্যভূমি বারাণসীর পুণ্য-আদর্শে, দেবালয় গুলি গঠিত ও তাহাতে নানা দেব দেবীর পুণ্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-নিনাদে ও বেদমন্ত্র উচ্চারণে দিক্ পুলকিত ও মুখরিত হয়। নগরের প্রান্তদেশে সন্ন্যাসী, সাধু ও মহান্তগণের মঠ, ধর্ম্মশালা ও আখ্ড়া। সে সমুদয়ের যাবতীয় ব্যয় ভবানী দিয়া থাকেন। সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া, পুণ্যবতী ভবানীর পুণ্য-আকর্ষণে, সেই গঙ্গাময় স্থানে, দেশ দেশান্তর হইতে অতিথি, ভিক্ষু, ও বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারিগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন,—এবং গঙ্গাস্নানে, দেবদেবীদর্শনে, ও ভজনসাধনে আপন আপন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিয়া ধন্য হন।

প্রকৃতির এই শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্রময় স্থানে, ভক্তিমতী ভবানী জন্ম-জন্মার্জ্জিত ভক্তিরাশি লইয়া, প্রাণ ভরিয়া, নিত্য নির্জ্জনে, শিবপূজা, গঙ্গাস্নান ও সাধুদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনিও ধন্যা হইলেন, বাল-বিধবা

কন্যা তারাকেও প্রকৃত ভক্তিমতী করিতে পারিলেন। তারা, জননীর আদর্শে, ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণা হইয়া, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ক্রমেই সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল,—সেও মাতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া দেবপূজায় ও ধ্যান-ধারণায় জীবন সফল করিতে সমর্থ হইল। এই বড়নগরে, তারারও ৺গোপালজীউর মন্দির প্রভৃতি অনেকগুলি দেবালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ফলতঃ, মাতাকন্যায় এই স্থানে কিছুকাল পরম শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দেবী ভবানী, এখানে প্রকৃত দেবীজনোচিত পুণ্যানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়া চলিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের যতগুলি কঠিন নিয়ম, হিন্দুবিধবার যতগুলি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য,—সে সকলই তিনি আশ্চর্য্য মানসিক বলে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। রাণী প্রতিদিন রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গাত্রোত্থান করেন। শয্যা হইতে উঠিয়াই, কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে জপ করেন। পরে সযত্ন-সংস্থাপিত পুষ্প-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে পুষ্পচয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তখনও রীতিমত অন্ধকার থাকায়, অগ্রে পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য মশালের আলোকে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়,—তিনি সাজি ভরিয়া পুষ্পচয়ন করেন। দেবপূজার ফুল—নিজে পূজা করিবেন,—তাই তিনি নিজেই পবিত্র মনে

পুষ্পচয়ন করেন,—লোকজনের উপর এ ভার অর্পণ করা উচিত মনে করেন না। পুষ্পচয়ন কার্য্য শেষ হইলে, শুদ্ধ অন্তরে রুক্ষদেহে গঙ্গাস্নান। স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে অন্যূন আড়াই দণ্ডকাল সেই ঘাটে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ; পরে সেই গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাপূজা—সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয় না যে, কোন মানবী জলে দাঁড়াইয়া আছে,—যেন সাক্ষাৎ রুদ্রাণী বা ব্রহ্মাণী করযোড়ে কাহার পূজা করিতেছেন! তৎপরে পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবালয়-সমূহে গমন ও প্রত্যেক দেবদেবী দর্শন পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি দান; তৎপরে নিবিষ্টমনে শিবপূজা। এ সময় রাণীর বাহ্যজ্ঞান এককালে বিলুপ্ত হয়; তাঁহার আত্মা যেন তাঁহার দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। পূজান্তে, সমাগত সাধু-সন্ন্যাসী সন্দর্শন। প্রতিদিন দুই একটি প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসী, যেন সে সময় কোথা হইতে আসিবেই আসিবে। সাধুসন্দর্শন কার্য্য সমাধা হইলে, গৃহে আসিয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মুখে পুরাণ শ্রবণ। পুরাণ শ্রবণান্তে, আপন কন্যাকে ও আশ্রিতা পুরনারীগণকে নানারূপ সদুপদেশ দান; তৎপরে সেই যথানিয়মে স্বহস্তে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া, বেলা আড়াই প্রহর গতে সেই একাহার—হবিষ্যান্ন গ্রহণ। তার পর একটু বিশ্রাম অন্তেই, বৈকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পুনরায় নিবিষ্টমনে পুরাণ পাঠ,

শ্রবণ ও উত্তমরূপে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ। অতঃপর সন্ধ্যা হইবামাত্রই গঙ্গা দর্শন; স্বহস্তে গঙ্গাকে ঘৃত-প্রদীপ প্রদর্শন; তার পর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধান; পরে চারি পাঁচ দণ্ডকাল মালা জপ। এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হই-বার পর, তারাকে আপন কাছে ডাকিয়া নানারূপ সদুপদেশ দান; তারারও জননীর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ; তৎপরে আশ্রিতা পৌরস্ত্রীগণের তত্ত্বাবধারণ—কে কোথায় কি ভাবে আছে ও কি করিতেছে, তাহা দেখিয়া, রাত্রি দেড়প্রহরের পর শয়ন। আবার সেই রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে যথানিয়মে উত্থান।—প্রতিদিন এই ভাবে রাণীর দিন কাটিত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—বার মাস—সকল ঋতুতেই প্রতিদিন যথাভাবে তিনি এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। ইহাতে এতটুকু আলস্য বা বিরক্তির ভাব ছিল না;—পরন্তু প্রকৃত উৎসাহ ও আনন্দের ভাব তাহাতে পরিদৃষ্ট হইত। অপিচ ইহাতে রাণীর স্বাস্থ্য এত ভাল থাকিত যে, এক দিনের জন্যও কেহ তাঁহাকে অসুস্থাবস্থায় দেখিতে পায় নাই। তাঁহার এই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া,—ধর্ম্মময় জীবনের এই কঠোর সংযম দেখিয়া, তাঁহার আশ্রিতা পৌরস্ত্রী,—এমন কি পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত, সদাচারসম্পন্না ও সদনুষ্ঠানরতা হইল;—তারার ত কথাই নাই।

গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য, ভবানী প্রকৃতই অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই বড়নগর অধিকারস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও উপবীতধারী ব্রাহ্মণকুমারকে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিতে হইবে। প্রাতঃস্নানের পর নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন ও তাহার চিহ্নস্বরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও রাখিতে হইবে। এ নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে, শাস্তিস্বরূপ, ভবানী সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকুমারকে গঙ্গাপার করিয়া দিতেন; তাঁহাদের বৃত্ত্যাদি সব বন্ধ হইয়া যাইত। ফলতঃ, সদাচারের প্রতি রাণীর এমনি প্রখর-দৃষ্টি ছিল। তিনি সার বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুর পক্ষে, সর্ব্বপ্রথম আচার-রক্ষা,—তার পর অন্য ধর্ম্মকর্ম্ম।—আচার-রক্ষা না হইলে, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই ভাসিয়া যায়। তাই দেবী ভবানী আত্মজীবনে সদাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেন এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিক সকলকেই সেই পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। ফলতঃ, এই বড়নগর, রাণীর সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অতি উচ্চতম স্থান। এই স্থান হইতেই তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি-কথা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এ হেন জননীর নিকট, তারা ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা পাইল; সুতরাং তাহার জীবনও ধন্য হইল। ফলতঃ তারাও অল্লাধিক পরিমাণে, মাতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সক্ষমা হইলেন।

বালিকা ক্রমে যুবতী হইলেন। তারার দেহে রূপ আর ধরে না। উৎকট ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতেও রূপের শিখা নিভে না। বরং সে শিখা আরও বর্দ্ধিত হয়। সংযম ও সাধনায়, দেহের লাবণ্য ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সে লাবণ্যে তখন যেন এক স্বর্গীয় আভা বিকসিত হয়। বস্তুতঃ, পুণ্যপ্রবৃত্তি ও সুচিন্তার অনুশীলনে, মুখেও কেমন একটা পবিত্রতার ছাপ্ পড়ে। রূপ-প্রতিমা, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রতিকৃতি তারার মুখেও এইরূপ একটা পবিত্রতার ছাপ্ পড়িয়াছে। তারার সে মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিলে, সাক্ষাৎ দশমহাবিদ্যার সেই অপূর্ব্ব ভৈরবী মূর্ত্তি মনে পড়ে। দেহের এই অতুল্য রূপ, মনের ঐ পুণ্যপ্রবৃত্তি,—বস্তুতঃ মাতার ন্যায় তারারও ভিতর বাহির সুন্দর।

কিন্তু হায়! এ হেন সৌন্দর্য্যেরও শত্রু আছে! এ স্বর্গীয়া শোভা কলঙ্কমলিন করিতেও লোকের প্রবৃত্তি হয়! ধাতার সৃষ্টি-রহস্য ও বিধান কিছুই বুঝি না,—তাই মনে হয়, দেবতা ও দানব—দুই পাশাপাশি থাকিয়া, প্রতিনিয়তই যেন যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে! এ সংগ্রামের অবসান যে কবে হইবে,—আদৌ হইবে কি না, তাহা সেই ভবিতব্যতাই জানেন!

তারার এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপেরও শত্রু হইল। সে শত্রু সামান্য শত্রু নয়,—সে শত্রু বড় প্রবল। ভাবী

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব—কলঙ্কময় জীবন—পাপিষ্ঠ সিরাজউদ্দৌলা তারার রূপের শত্রু হইল। সে পাপিষ্ঠ একদিন কথাপ্রসঙ্গে, অনুচর-মুখে, ভবানী-দুহিতার অলোকিক রূপ-লাবণ্যের পরিচয় পাইল। কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত পিশাচের নাকি এ বিষয়ে দিগ্বিদিক্ বোধ ছিল না,—তাই সেই ভারতবিখ্যাতা, দেবীসমা পূজনীয়া, দ্বিতীয় অন্নপূর্ণার বিধবা কন্যা হরণের কল্পনা করিতেও তাহার হৃদয় কম্পিত হইল না। কল্পনা শেষে ক্ষিপ্রকারিতার পথে অগ্রসর হইল। পাপিষ্ঠ কয়েকজন সৈনিক পাঠাইয়া, তারাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিতে অনুমতি দিল। কিন্তু সিংহীর গহ্বরে প্রবেশ, শৃগালের পক্ষে অসাধ্য হইল। দৈব যাহার সহায়, মানুষ তাহার কি করিবে? হউক না সে নবাব-দৌহিত্র বা রাজ্যেশ্বর সম্রাট? দৈবের নিকট সে কতটুকু? বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠের সে পাপবাসনা পূর্ণ হইল না,—দৈবের নিকট,—দৈবভাবময় কার্য্যের নিকট,—সে পরাভব মানিল।

যাই হউক, কথাটা গিয়া ভবানীর কানে উঠিল। তখন, অকস্মাৎ ভীষণ ব্যাঘ্র সম্মুখে দেখিলে, নিঃসহায় পথিকের মনে যে ভাবের উদয় হয়,—পাপকথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, ভবানী সেইরূপ ভীতা ও বিচঞ্চলিতা হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সাহস, চিত্তের দৃঢ়তা ও

ধর্ম্মপ্রাণতা কোথায় চলিয়া গেল,—তিনি থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। সেই কম্পিত দেহে, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আকুলতায় তিনি ডাকিতে লাগিলেন,—"কোথায় তুমি অগতির গতি, বিপদভঞ্জন মধুসূদন! এ বিপদে ত্রাণ কর দয়াময়! তুমিই সেই পাপ কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর লজ্জারক্ষা করিয়াছিলে,—আজি আমার দুর্ভাগ্যবতী কন্যারও লজ্জা রাখ—লজ্জানিবারণ!—হে মা নৃমুণ্ডমালিনী, ভীমা, ভৈরবী, রুদ্রেশ্বরি! এ সময় তুমি হৃদয়ে পূর্ণরূপে আবির্ভূতা হও,—আমায় বল দাও,—আমি নিজেই এ মহাশত্রু নাশ করি,—তারার ধর্ম্মরক্ষা করিয়া নিষ্কণ্টক হই!—হায়, এই মহাপাপই একদিন বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিবে?—ওহো, ধর্ম্ম!"

প্রার্থনায় বুকে বল আসিল।—আর্য্যরমণী সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সতীর সেই করুণাপূর্ণ নয়ন ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। সম্মুখে পাইলেই, যেন তিনি সেই মহাপাপিষ্ঠকে, তন্মুহূর্ত্তেই, কটাক্ষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন!

ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। রাণীর আশ্রিত বহু বহু কৌপীনধারী মহান্ত ও সাধু, বড়নগরে বাস করিতেন। তাঁহারা এ পাপ-কথা শুনিবামাত্র, কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া 'রাম রাম' শব্দ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কোপ-প্রজ্বলিত হৃদয়ে হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া, উচ্চকণ্ঠে ভবানীর নাম লইয়া,

একরূপ নিঃসম্বলেই, সিরাজ-সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তার পর সতী-মাহাত্ম্যে ও দৈবপ্রভাবে, একরূপ বিনা আয়াসেই, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন। সৈন্যগণ বলপ্রকাশ করিবে কি,—সহসা যেন তাহারা দাবানলে পড়িয়া, কোনও রূপে প্রাণ লইয়া পলায়নের পথ্ দেখিতে লাগিল। তাহারা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল,—মহা মেঘপ্রভা, ঘোরা, নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামামূর্ত্তি,—একখানি সদ্য-রক্ত-রঞ্জিত খড়্গ লইয়া, শূন্যে, তাহাদের মস্তকোপরি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যেন কি মোহমন্ত্রে, তাহাদিগকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন! পুনঃ পুনঃ এই ভাব দেখিয়া, সৈন্যগণ পলাইল,—সাধু-মহান্তগণ তখন জয়নাদ ছাড়িতে ছাড়িতে ভবানীকে এ সংবাদ দিলেন।

প্রার্থনার ফল ফলিয়াছে বুঝিয়া, ভবানী তখন ঘোর ঘটায় কাপালিনীকে পূজা দিলেন এবং মায়ের সেই মহাপ্রসাদ, পরম পবিত্রহৃদয়ে, সেই শত শত মহান্ত-সাধুগণ-মধ্যে বিতরিত করিয়া ধন্য হইলেন।

প্রধান মহান্ত তখন আর এক বিহিত ব্যবস্থা করিলেন। মহাপাপ সিরাজের পাপেচ্ছা সমূলে বিনষ্ট করিতে এবং পলায়িত সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস করিতে, তিনি এক অভূতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা, অবিলম্বে সর্ব্বত্র, ভবানী-দুহিতা তারার মৃত্যু-

সংবাদ রটনা করিয়া দিয়া, তিনি পথ এককালে নিষ্কণ্টক করিতে যত্নবান্ হইলেন। পাপিষ্ঠগণ আর না আসিয়া সে শান্তিধামের শান্তি-সুখ নষ্ট করিতে পারে,—তজ্জন্যই তিনি এই প্রকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করিলেন। শুধু তারার মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, নিকটস্থ অধিবাসীবর্গের সম্যক্ বিশ্বাস উৎপাদন জন্য, তিনি এক রাত্রে, বড়নগরের গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে এক মহা অগ্নিক্রিয়া সমাধান করিলেন। রাশি রাশি কাষ্ঠ ও সুরভিত ঘৃত-চন্দন সংযোগে চিতাগ্নি প্রস্তুত করিয়া, তিনি দলে দলে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। নিশীথ কাল,—চিতার আগুন ধূ ধূ জ্বলিতেছে,—তৎসহ খোল-করতাল-সংযোগে গগনভেদী হরিধ্বনি হইতেছে,—লোক-সাধারণ ভীতি-বৈরাগ্য-পূর্ণ অন্তরে শুনিল, ভীষণ বিসূচিকা রোগে, ভবানী-দুহিতা তারা, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন! চারিদিকে হায় হায় রব উঠিল,—ভবানী-ভক্ত অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল,—অবিলম্বে তারার মৃত্যু-সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। পলায়িত সিরাজ-সৈন্যগণ ছদ্মবেশে গ্রামের আস্-পাশেই লুক্কায়িত ছিল; সুবিধামত আবার একদিন আসিয়া সহসা রাজপুরী আক্রমণ করিবে ভাবিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল;—আজি লোকমুখে ভবানী-দুহিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া,তাহারা স্বয়ং স্বচক্ষে সেই চিতাগ্নি দেখিয়া

আসিল, ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সেই কল্যাণকর সঙ্কীর্ত্তনও শুনিয়া গেল, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহাদের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহই রহিল না; তাহারা নিশ্চিন্ত মনে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পিশাচ-প্রভুকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। বলা বাহুল্য, সেই প্রধান মহান্ত-মহারাজও, কৌশলপূর্ব্বক ইতঃপূর্ব্বেই সিরাজের নিকট এ সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। তার পর সিরাজের বিশ্বস্ত অনুচর ও সৈন্যগণ গিয়াও তাহাই বলিল; —আরও অনেকের নিকট পাপিষ্ঠ এ সংবাদ পাইল;—তখন অগত্যা মহাপাপীর উদ্দাম লালসা মন্দীভূত হইয়া গেল।

যাই হউক, 'আপাতত কিছুদিনের জন্য বড়নগর ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ' বিবেচনায়, ব্রহ্মচারিণী দেবী, কন্যাকে লইয়া নাটোর যাত্রা করিলেন। নৌকায় উঠিবার সময় মনে মনে বলিলেন,—

"হায় মা পতিতপাবনি, গঙ্গে! তোমার পুণ্যতীরে বাস, কি এ পোড়া অদৃষ্টে আর সহিল না? যদি মা এখানে লইয়া আস, ত আবার আসিব, নহিলে এই শেষ। না, এ সময় রাজধানীর এত নিকটে থাকাটা কিছু নয়।—কোন কাজে অহঙ্কার করিতে নাই।"

তারা মনে মনে বলিল,—"হায় রূপ! কবে এ রূপ ছাই হইবে? কবে ইহা মাটিতে মিশিবে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু নাটোরে আর দেবী ভবানীর মন বসিল না; অল্পদিন সেখানে থাকিয়াই তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন।

সকল তীর্থের সার বারাণসী। সেই বারাণসী ধামে, আনন্দকাননে, ভবানী যাত্রা করিলেন। 'অৰ্দ্ধবঙ্গেশ্বরী' অতুলনীয়া দানশীলা রমণী যে ভাবে যাত্রা করেন, সেই ভাবে করিলেন। অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে, সেই মহা আনন্দধামে—যেখানে জীব মরিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়,—তাহাকে আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না,—সেই পরম পুণ্যতীর্থে যাত্রা করিলেন। অন্যূন সতের শত নৌকা নানারূপ দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া, রাণীর সহিত গেল। অনেক লোক-লস্কর, অমাত্য-কর্ম্মচারী, ও তীর্থদর্শনাভি-

লাষী স্ত্রী-পুরুষ ভবানীর সমভিব্যাহারী হইল। সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি—'অসি-বরুণা' কথিতা—গঙ্গাগর্ভ-সমুত্থিতা—মর্ত্ত্যের গোলকপুরী—পরম পুণ্যভূমি,—দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণাকে পাইয়া, যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেশ দেশান্তর হইতে অনেক কোটীপতি রাজা, মহারাজা, জমীদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি আসিয়া, কাশীধামে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দেবী ভবানীর আগমন যেন প্রকৃতই একটু বিস্ময়কর।—তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্ম বিস্ময়কর, দান ধ্যান বিস্ময়কর, অন্নদান ও জলদান আরও বিস্ময়কর। অভূতপূর্ব্ব নিয়মে, অন্নদানে ও জলদানে, তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে জননী-অন্নপূর্ণা নামে অভিহিত করিল।

যে দিন তিনি কাশীতে প্রথম বাহির হইলেন,—যেদিন পঞ্চক্রোশী কাশী তিনি প্রদক্ষিণ করিলেন, সেদিন জানিতে পারিলেন, এই 'এরণ্ড পত্রাকৃতি' কাশীর ঠিক সীমা নির্দ্দেশ নাই। তিনি আরও দেখিলেন, দেশদেশান্তরের বিস্তর যাত্রী, বাসস্থানের অভাবে বড় কষ্ট পায়। একটু দেখিয়াই দয়াবতী রাণী বুঝিতে পারিলেন, সহস্র সহস্র পথক্লান্ত পথিক, ভারবাহী শ্রমজীবী, নিত্য-আগত নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষ—বৃদ্ধ, রুগ্ন, অনাথ, আতুর—আশ্রয়াভাবে, মাথা ফেলিয়া একটু থাকিবার অভাবে, বড়

অসুবিধা ভোগ করে। তথায় অন্যান্য রাজা বা জমিদার-দিগের যে সকল ধর্ম্মশালা বা পান্থভবন ছিল, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে,—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অতিথি, ভিক্ষু ও সাধু-সন্ন্যাসীতেই তাহা পূর্ণ হইয়া যায়,—আপামর সাধারণের জন্য—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে দরিদ্র সংসারী পর্য্যন্ত—সর্ব্বশ্রেণীর লোক সমান ভাবে থাকিতে পায়, এমন আশ্রম বা অতিথিশালা তথায় নাই। পরদুঃখকাতরা, দীন-জননী ভবানী, একে একে, কাশীর সেই সকল অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমতঃ তিনি পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমানির্দ্দেশের সহিত, একটু অভিনব পন্থায়, পথশ্রান্ত পথিক ও ভারবাহী-গণের শ্রম লাঘবের জন্য একটি সুন্দর উপায় করিয়া দিলেন। তাহা এইরূপ ;—"কাশীর চতুর্দ্দিকে পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, এক একটি 'ধর্ম্মঢোকা' নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে এক এক পিল্‌পা, এক এক বৃক্ষ ও এক এক কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত লোক, বা যাহারা আপন মস্তকে দ্রব্যাদি বহন করে তাহারা, শ্রান্ত বা পিপাসাযুক্ত হইলে, বিনাসাহায্যে, ঢোকার উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া, বৃক্ষ-মূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জলপানাদি করিত ; পরে ঢোকার উপর হইতে অক্লেশে মোট আপন মস্তকে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিত। মোট নামাইয়া বা তুলিয়া দিতে কাহারও

সহায়তার আবশ্যক হইত না। ঐ সকল ধর্ম্মঢোকা অদ্যাপি (স্থানে স্থানে) বর্ত্তমান আছে। ইহা ভিন্ন ঐ পঞ্চক্রোশের মধ্যে এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক পুষ্করিণী, ও স্থানে স্থানে তড়াগ, বাপী ও কূপ খনন করা ছিল। সেই সকল স্থানে পথিক লোক বিশ্রামাদি করিত এবং তাহাদের রন্ধনের জন্য প্রস্তরে খোদিত আখা, বাটী, জলপাত্র, তণ্ডুলাদি, ও ফল মূল প্রস্তুত থাকিত। স্থানে স্থানে পথিকেরা, সচ্ছন্দে আহার ও বিশ্রাম করিত।" *

প্রকৃত পরবাৎসল্য না থাকিলে,—দয়ার শরীর না হইলে, কি কেহ এমন কাজ করিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, তীর্থযাত্রীগণের স্নানের ও পূজার সুবিধার্থ, অসি হইতে বরুণা পর্য্যন্ত বিস্তর ষাণ্-বাধা ঘাট—ভবানী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সে সকল ঘাট দিব্য প্রশস্ত—আজিও তাহা বর্ত্তমান আছে।

তৃতীয়তঃ, আতিথ্য সংকার। ভবানীর আতিথ্য-সংকার, কাশীতে প্রবাদের মত কথিত। এমন যত্ন, এমন সুবন্দোবস্ত, এমন আহারের পরিপাট্য,—আর কোন অতিথি-শালায় ছিল না। ভবানীর আশ্রয়ে আতিথ্যগ্রহণ করিতে

* নবনারী। ৺নীলমণি বসাক প্রণীত। বসাক মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে, রাণী ভবানী সংক্রান্ত, কাশী ও গয়াধামের দুই চারিটি ঘটনা ও অন্য দুই একটি সংবাদ সংগৃহীত হইল।

পারিলে, লোকে সহজে আর কোনও অতিথিশালায় যাইতে চাহিত না। এইরূপ অতিথিশালার ন্যায় অনেক-গুলি অন্নসত্রও ছিল। কাঙ্গালী-ভিখারীগণ সেই সকল সত্রে অন্নজলগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া উচ্চ-কণ্ঠে,—'জয় মা ভবানী-অন্নপূর্ণার জয়' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিত। এক আধটি নহে,—তিন তিন শত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী ভবানী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল বাড়ী সাধারণতঃ ধর্ম্মশালা বলিয়া কথিত। দু'মাস, দু বছর বা দশ বছরের জন্য নয়, যাহাতে চিরদিন,—রাণীর অবর্ত্তমানেও ঐ সকল ধর্ম্মশালা নিয়মিত রূপে চলে, ভবানী এমন পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।—বুঝুন, তাহার ব্যয় কত! এই তিন তিন শত ধর্ম্মশালায় প্রতিদিন কত লোক সেবা ও আশ্রয় পাইত, তাহাও ভাবিয়া দেখুন।

পুণ্যবতী দয়াময়ী ভবানীর সর্ব্ববিষয়েই দৃষ্টি ছিল। যে সকল দরিদ্র বা ধর্ম্মভীরু লোক, আপনাদের অন্নহীনতা বা ধর্ম্মশীলতার জন্য, শেষদশায় কাশীবাসের ইচ্ছা করিত, ভবানী সেই সকল লোককে সপরিবারে সযত্নে আশ্রয় দিতেন, এবং যাবজ্জীবন তাহাদের ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয় প্রসন্নমনে বহন করিতেন। অধিক কি, তাহাদের মৃত্যুর পর, তাহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয় হইতে শ্রাদ্ধ-

শান্তির খরচ পর্য্যন্ত, অকুণ্ঠিত ভাবে দিয়া থাকিতেন। পক্ষান্তরে, পথের পথিক আসিয়াও কাহারও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয় চাহিলে, বা তদনুরূপ কোন দায় জানাইলে, ভবানী অকাতরে তাহা দিতেন,—এক দিনের জন্যও এতটুকু বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না,—বা কখন কোন-রূপ কার্পণ্যও দেখাইতেন না।

মুষ্টিভিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ভবানীর সুন্দর ছিল। কয়েকটি পাথরের চৌবাচ্চাতে, প্রতিদিন আটমণ করিয়া ছোলা ভিজান হইত। যাহারা মুষ্টিভিক্ষা লইতে আসিত, তাহারা ভিক্ষার সহিত এই ভিজান-ছোলা ও একটু একটু গুড় পাইত। ভিক্ষার চা'ল কটি সঞ্চয় করিয়া রাখিত; আর এই ছোলা-গুড় খাইয়া তাহারা তৃষ্ণা নিবারণ করিত। তাহাদের তৃষ্ণানিবারণের সহিত ভবানীরও যেন ভব-তৃষা নিবারণ হইত!

তার পর দেবদেবী প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের সেবা-ভোগ। এ পক্ষে ভক্তিমতী ভবানী, যেমনটি করিতে হয়,—করি-তেন।—কাশীর নানাস্থানে, শত শত শিবলিঙ্গ ভবানী-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, দুর্গা, তারা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ইতস্ততঃ স্থাপিত হইয়া, ৺কাশীধামে ভবানীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

ভবানীর নিজ-প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর যেমন নিত্য সেবা-ভোগ হইত, জননী-অন্নপূর্ণার মন্দিরেও ভবানীর সেইরূপ অদ্ভুত সেবা-ভোগের ব্যবস্থা ছিল। তথায় নিত্য পঁচিশমণ করিয়া তণ্ডুল বিতরণ হইত, এবং নানাবিধ সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনে দণ্ডী, কুমারী, সধবা—প্রতিদিন ১০৮ জন ইচ্ছা-ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। ইহাঁদের ভোজন-দক্ষিণা এক এক মুদ্রা করিয়া দেওয়া হইত। এই সকল দেবদেবীর ভোগে, প্রতিদিন অন্যূন চারি পাঁচ সহস্র লোক উত্তমরূপে ভোজন করিতে পারিত। সে ভোজনে ভবানী আত্ম-ভোজন-সুখ অনুভব করিতেন। এই কাশীধামেও ভবানী পক্ষ্যাদি কীট-পতঙ্গের আহারদানের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থায় প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইলেন।

একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-সন্ন্যাসী, বর্ষাকালে, চাতুর্ম্মাস্য-মানসে, ৺কাশীধামে উপনীত হন। সঙ্গে তাঁহার এক সহস্র শিষ্য ছিল। সেই সহস্র শিষ্যসহ, প্রথমতঃ তিনি এক পশ্চিমদেশীয় ধনবান্ জমিদারের ধর্ম্ম-শালায় গমন করেন। যে কারণেই হউক, সেই সন্ন্যাসী, সাধারণ হিসাবে সেবাগ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া, প্রতি-শিষ্যের প্রতি এক টাকা হিসাবে, প্রতিদিন এক হাজার টাকা করিয়া খরচ চাহিলেন। এমনি চারিটি মাস সমভাবে

দিতে হইবে বলিলেন। তাহা হইলে চারিমাসের খরচ দাঁড়াইল—এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। ধনবান্ জমিদারের সাহসে বা প্রবৃত্তিতে কুলাইল না,—তিনি অসম্মতির ভাব জানাইলেন। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, এই কাশীধামে বসিয়া, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে আসিয়া, এই টাকাটা খরচ করে, এমন ভাগ্যবান্ কেহ নাই। তবে যাই,—কাশী ছাড়িয়া অন্য তীর্থ দেখি,—যদি কেহ এ নিয়মে সম্মত হন।"

কথাটা রাণী ভবানীর কর্ণগোচর হইল।—"কাশী হইতে অভুক্ত দণ্ডী সশিষ্যে ফিরিয়া যান" শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ—এতটুকুও কালবিলম্ব বা ইতস্ততঃ না করিয়া, সাগ্রহে সেই সন্ন্যাসীকে আপন আশ্রমে আনাইলেন, এবং পরম সমাদরে ও বিশেষ ভক্তিসহকারে, সেই সন্ন্যাসীরই অভিপ্রায়মত, প্রতিদিন হাজার টাকা হিসাবে ব্যয় দিতে লাগিলেন। দণ্ডী বুঝিলেন, টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া, টাকাকে খোলার-কুচির-মত দেখিতে পারে, এমন লোকও কাশীতে আছে!

তার পর, সেই জমিদার যখন শুনিলেন, রাণী ভবানী, সেই সন্ন্যাসীকে সশিষ্যে আশ্রয় দিয়া, সন্ন্যাসীরই ইচ্ছামত, নিত্য নগদ টাকা গণিয়া দিতেছেন, তখন যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল,—সন্ন্যাসীকে প্রত্যাখ্যান করাটা ভাল হয়

নাই বুঝিলেন। অধিকন্তু সেই সঙ্গে এই অভিমান টুকুও আসিল যে,—"আমি এ অঞ্চলের একজন এত বড় ভূস্বামী; আমাকে উঁচাইয়া বাঙ্গালা দেশের কে একজন ক্ষুদ্র রাণী না জমিদার, কাশীতে নাম লইয়া যাইবে?—না, তা হইবে না।"—তখন সেই ধনবান্ ব্যক্তি, একটু ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবে, অথচ একটু ভক্তি ও বিস্ময়-অন্তরে, কৌশলে, রাণীকে সেই টাকাটা দিয়া, সুস্থির হইতে মানস করিলেন। তিনি ভবানীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, একটি সিধা পাঠাইয়া দিলেন। সেই সিধার মধ্যে কতকগুলি মণি-মুক্তা-স্বর্ণমুদ্রা পূরিয়া, ভবানীর সেই এক লক্ষ কুড়িহাজার টাকাটা পূরণ করিয়া পাঠাইলেন। ভবানী অবশ্যই মাতৃসম্বোধনকারী জমিদারটিকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু সিধাটি ফেরং দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"কাশীতে বসিয়া আমি কাহারও দান গ্রহণ করিব না, মানস করিয়াছি;—এমত অবস্থায় এ সিধাটি ফেরং পাঠাইতে বাধ্য হইলাম—এজন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না।" বুদ্ধিমতী ভবানী বুঝিয়াছিলেন, এই সিধার মধ্যে নিশ্চয়ই ধন-রত্ন লুক্কায়িত আছে,—জমিদারটি সিধার অছিলায়, সশিষ্য সন্ন্যাসীর সেই চাতুর্ম্মাস্যের খরচটা, তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কৌতূহলী কর্ম্মচারীবৃন্দ, রাণীর এই অনুমান, পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। পরীক্ষায়, তাঁহাদের

অনুমান মিলিয়াও গেল। অবশ্য, রাণীর ইচ্ছাক্রমে ইহা হইয়াছিল। *

এইরূপ, কাশীতে ভবানী সম্বন্ধে যে কতরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। একবার রাজসাহী হইতে রাণীর,—৺কাশীধামের খরচ পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বৎসর বৎসর এক সহস্র করিয়া নৌকা নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট আসিত, সেই সঙ্গে নগদ টাকাও আসিত। এবার যথাসময়ে নৌকাগুলি আসিল, কিন্তু নগদ টাকা পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। কাশীর দৈনিক খরচ,—যথানিয়মে যেরূপে হউক সম্পন্ন হওয়া চাই ;—এমত অবস্থায় খরচ পঁহুছিতে বিলম্ব হওয়ায়, ভবানী কিছু চিন্তিত হইলেন। সে সময় কাশীতে কেশবরাম নামে এক মহা ধনশালী বণিক্ বাস করিতেন। ভবানী সেই বণিকের নিকট, অতি অল্পদিনের জন্য, এক লক্ষ টাকা ঋণ চাহিয়া পাঠাইলেন। বণিক্, রাণীর লোককে উত্তর দিল,—"বাঙ্গালা দেশের রাজা বা রাণীদিগকে আমি জানি ; দুই দশ সহস্র টাকা বিষয়ের মুনাফা থাকিলেই লোকে ঐ সকল ব্যক্তিকে রাজা বা রাণী

---

* একজন কাশীবাসী সুব্রাহ্মণের নিকট এই ঘটনাটি শ্রুত হইয়াছিলাম।——লেখক।

আখ্যা দেয়।—না বাপু, আমা হইতে এ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে না।—কে রাণী ভবানী, তাঁর আয় কত, আমি এ সব কিছুই জানি না। সুতরাং অত টাকা আমি ধার দিতে পারিব না।" বলা বাহুল্য, বণিক সাধ করিয়া স্থাকা সাজিল, সুদ-খোর সুদের সবিশেষ বন্দোবস্ত ও বিশেষ বাধাবাধি না করিয়া, সুধু-হাতে টাকা দিতে রাজী হইল না,—সেইটিই আসল কথা।

ভবানী ইহা শুনিলেন, কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট বা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন না;—বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় সেইদিনই সন্ধ্যার পর, শান্তি-পাহারা-লোকজনসহ, তাঁহার জমিদারী হইতে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা আসিয়া পঁহুছিল। নৌকার পথ,—নৌকা পঁহুছিতে দিনকয়েক বিলম্ব হইয়াছিল।

এদিকে, সেইদিন রাত্রে, সেই অতি-হিসাবী সুদখোর বণিক স্বপ্ন দেখিল, যেন জননী অন্নপূর্ণা তার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"ওরে অজ্ঞান, করিয়াছিস কি? কাকে ঋণ দিতে অসম্মত হইয়াছিলি? রাণী ভবানী তোর নিকট টাকা ধার চাহিয়াছিল,—সে তোর পরম পুণ্য! যা, এখনি গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্‌,—নহিলে তোর সর্ব্বনাশ হইবে,—সব যাইবে! আরে মন্দভাগ্য!—ভবানীকে চিন না?—ভবানী আর আমি যে এক!"

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেই, বণিক ধড়ফড় করিয়া শয্যা

হইতে উঠিয়া পড়িল, এবং বিশেষ ভয়-ব্যাকুলভরে, প্রভাত হইতে-না-হইতে, পুণ্যবতী রাণীর দ্বারে গিয়া উপনীত হইল। পরে, রাণীর সেই কর্ম্মচারীকে,—যিনি রাণীর হইয়া পূর্ব্বদিন টাকা ধার চাহিতে গিয়াছিলেন, —তাঁহাকে, বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিল,—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন, রাণীমাকেও আমায় ক্ষমা করিতে বলুন,—আমার সহস্র অপরাধ হইয়াছে,—আমি জানি নাই যে, তিনি কে? ভবানী—সত্যই মা-ভবানী। আমি মূঢ়, আমার চৈতন্য হইয়াছে,—মাকে গিয়া এ কথা বলুন। বলুন, লক্ষ টাকা আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি,—আরো যদি টাকার দরকার হয়, তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলেই আমি দিব। এখন, মাকে আমি একবার দেখিয়া যাইব; —তাঁর চরণ-রেণু লইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইব।—কৃপা করিয়া মাকে এ সংবাদটি দিন।"

কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন,—"টাকার আর প্রয়োজন হইবে না,—কেন না, টাকা কল্য সন্ধ্যার পরই আসিয়া পঁহুছিয়াছে। তবে রাণীমাকে দর্শন,—তা আমি সংবাদ দিতেছি, তিনি যেরূপ আদেশ করেন, পশ্চাৎ বলিতেছি।"

ভবানীর নিকট এই সংবাদ গেলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—"এখানে এমন সময় দেখা করার সুবিধা হইবে না;—যখন আমি মা-অন্নপূর্ণার পূজা করিতে

যাইব, সেই সময় মায়ের মন্দিরে গেলে দেখা হইতে পারিবে।"

বণিক অগত্যা, তাহাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া, যথাসময়ে অন্নপূর্ণার মন্দিরে উপনীত হইল।

সোনার অন্নপূর্ণা; মায়ের সে দিব্যমূর্ত্তি সিংহাসনে উপবিষ্টা; সে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপে মন্দির আলোকিত; সেই মন্দির মধ্যস্থলে, মায়ের সম্মুখে,—ধ্যাননিমীলিতনেত্রা, কৃতাঞ্জলিপুটা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা,—যোগিনী মূর্ত্তি,—কে ইনি? অপরূপ রূপা, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্যা, দিব্য করুণামাখা মুখ-মণ্ডল,—কে এ মা? সর্ব্বাঙ্গে অলৌকিক দীপ্তি, হস্তপদমুখে বিভূতি-চিহ্ন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসম অপূর্ব্ব তেজোময়ী মূর্ত্তি,—কে এ বামা? দেবী না মানবী? না আর কেহ?—এরূপ অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মাতৃপদ অর্চ্চনা করিতে বসিয়াছেন? আহা-হা! ঐ দুই রূপ যে এক হইয়া গিয়াছে? ঐ মা, না, এই মা?—ঐ অন্নপূর্ণা, না এই অন্নপূর্ণা? চিন্ময়ী, স্বর্ণময়ী, না মায়াময়ী,—কে ইনি? ইনিই কি রাণী ভবানী?—হায় মা! কবে আবার তুমি এ পতিত ভারতে আবির্ভূতা হইবে?

বণিক—তাহারও সময় হইয়া আসিয়াছিল,——বণিক জ্ঞাননেত্রে ভবানীকে চিনিতে পারিল,—ভবানী ও অন্ন-পূর্ণাকে প্রকৃতই অভেদ দেখিল। দেখিয়া, ভক্তি ও বিস্ময়ে

অভিভূত হইয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, ভবানীর পাদতলে আছাড়িয়া পড়িল।

কোটীপতি বণিক—কাশীর তদানীন্তন একজন ধন-কুবের,—আজি শুভক্ষণে, জাগ্রৎ সুপ্রভাতে, জননী-অন্নপূর্ণার মন্দিরে,—অন্নপূর্ণারূপিণী ভবানীর পাদপদ্মে এরূপ ভাবে পতিত,—অল্পক্ষণ মধ্যে এই মহা সুসংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। তখন, সেই পবিত্র আনন্দকানন, প্রকৃতই আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল। কেননা, সেই কুসীদজীবী কৃপণস্বভাব মহা ধনশালী বণিক, সহসা মুক্তহস্ত হইয়া, নানারূপ দানধ্যান-ক্রিয়ায়, আপামর সাধারণকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সুতরাং সকলেই আনন্দসূচক ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনিতে আকাশ-মেদিনী বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অপিচ, এই প্রত্যক্ষ ও একরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার মূলে, রাণী ভবানীর অলৌকিক প্রভাব জানিতে পারিয়া, সকলেই মুক্তকণ্ঠে "জয় মা ভবানী-অন্নপূর্ণা" বলিয়া, করযোড়ে তাঁহাকে স্তব ও পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ভবানী তখন বড়ই কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, কিছুদিন তাঁহাকে এ সোনার কাশী বা ত্যাগ করিতে হয়।—কিছুদিন এ স্থান ত্যাগ করিয়া, একটু প্রচ্ছন্নভাবে না থাকিলে, বুঝি তাঁহার আর রক্ষা নাই। কেননা, সেই বণিকের ন্যায়, ক্রমে অনেকেই তাঁহাকে

দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা ভাবিয়া, সত্য সত্যই তাঁহার পদে পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল।

বস্তুতঃ, ৺কাশীধামে পুণ্যবতী ভবানীর এত মান, এমনি প্রতিপত্তি। সত্য সত্যই এখানে তিনি সাক্ষাৎ ভবানী বলিয়া সম্পূজিতা হইতেন। আজিও অনেক প্রাচীন কাশীবাসী, প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীজ্ঞানে, ভবানীর উদ্দেশে প্রণাম করেন। সাধক আত্মারামের মানস-পূজিতা ভবানী,—সত্যই একদিন তাঁহার কন্যারূপে, 'ভবানী' নাম সার্থক করিয়াছিলেন। এই জন্যই কি কন্যার 'গৌরী' নাম তাঁহার ভাল লাগিত না? এই জন্য,—কি কন্যার বৈধব্য জন্য,—অথবা এই দুই কারণে,—তাহা তিনিই জানিতেন। সাধক, সাধনতত্ত্বের কথা, কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। তিনিও তাই করেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাশীধামের ন্যায় ৺গয়াধামেও ভবানীর অনেক পুণ্যকীর্ত্তি আছে। গয়াতেও তিনি অনেক দেবদেবীর মন্দির, অতিথিশালা, পান্থনিবাস প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দানধ্যানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গয়ালীগণ আজিও সসম্ভ্রমে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

যেবার তিনি প্রথম এই পুণ্যতীর্থে আগমন করেন, সেবার মহাসমারোহে, তিনি পিতৃলোক ও শ্বশ্রুকুলের শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়াদি সমাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত আত্মীয়স্বজনের প্রেতাত্মার চিরমুক্তিকামনায়, বড় আশ্বস্ত-হৃদয়ে, যখন তিনি বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করেন, তখন জনৈক অর্থলোলুপ গয়ালী-মহাপ্রভুর

দৌরাত্ম্যে, তাঁহাকে বড় মনস্তাপ পাইতে হইয়াছিল। এই পাণ্ডা মহাপ্রভুদিগের অনেকেরই দৌরাত্ম্য ও জুলুম,—প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল হইতেই অল্পবিস্তর আছে। ধর্ম্মাত্মা ও নিস্পৃহ তীর্থ-পুরোহিত যে আদৌ নাই,—এমন নহে;—তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।—জবরদস্ত ও অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাই অধিক। সে জবরদস্তীর বেগ, সকলকেই অল্লাধিক পরিমাণে সহিতে হয়। অন্যে পরে কা কথা,—দানের অদ্বিতীয়া ঈশ্বরী স্বয়ং রাণী ভবানীকেও তাহা সহিতে হইয়াছিল। অমন পুণ্যবতী, দান-ধর্ম্মের অবতাররূপিণী রাণী,—তাঁহার সহিতও তদানীন্তন প্রধান গয়ালী মহাপ্রভু "সফলা"র ফুরণ লইয়া অসদ্ভাব করেন। তিনি ভোগের আগে প্রসাদ চান। অর্থাৎ, রাণী বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান স্বরূপ, 'সফলা'-হিসাবে, কি গুরু-দক্ষিণা দিবেন,—অগ্রে বাক্‌দত্তা হউন, পরে পিণ্ডদান করিতে পারিবেন। এই বাবদে, সেই গয়ালী মহাপ্রভু, ভবানীর নিকট অল্প স্বল্প করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা চান! সে ত চাওয়া নয়,—একরূপ দাবী, জুলুম, বা উৎকট আব্‌দার! এমন কি, সেই প্রভুর নিয়োজিত সেই সভ্য ভব্য প্রধান প্রতিনিধি বা পাণ্ডা মহাশয়টি শেষ স্পষ্টতই বলিয়া ফেলিলেন,—"রাণী-মা পাঁচ লাখ্ টাকা দিবেন কি না স্বীকার করুন,—তবে আমরা তাঁহাকে পিণ্ডদান করিতে দিব।"

এই অতি-বড় ধৃষ্টতাসূচক বাক্যে, ভবানী কিছু বিরক্ত হইলেন। তখন তিনি সেই প্রধান গয়ালী মহাপ্রভুর নিজ মুখের কথা শুনিতে চাহিলেন। বলিলেন,—এই যে অসম্মানকর ও বিরক্তিকর ব্যবহার,—ইহা তাঁহার জ্ঞাতসারে হইয়াছে কি না জানিতে চাই।

অর্থলোলুপ গয়ালী ভাবিল,—"ধর্ম্মভীতা রাণীকে, 'পিণ্ডদান করিতে দিব না' এই ভয় দেখাইয়া, কৌশলে এই পাঁচ লাখ্ টাকাটা আদায় করিয়া লই। কি জানি, যদি কার্য্যোদ্ধারের পর এতটা টাকা এককালে না দেয়?"

কাণ্ডজ্ঞানহীন গয়ালী,—অথবা আর সব বিষয়ে জ্ঞান টন্‌টনে,—কেবল এই পরের টাকা ঘরে আনিবার সময়ে অজ্ঞান,—গয়ালী ভাবিল, "হাঁ, এই যুক্তিই ঠিক;—রাণী ভবানীকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া, কৌশলে টাকাটা আদায় করিয়া লই।"—তাই রাণীর লোককে বলিল, "হাঁ, কি জান, ও টাকা-কড়ি জিনিসটাই কু; বিশেষ এ তীর্থক্ষেত্র;—এ স্থানের দেনা-পাওনার কথাটা, আগে থাক্‌তে ফুরণ হওয়াই ভাল।"

লোক ফিরিয়া গিয়া ভবানীকে গয়ালী-প্রভুর কথা জানাইল। শুনিয়া, ভবানী ভাবিলেন,—"পিণ্ডদান আপাতত স্থগিদ থাকে থাকুক, ইহার একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে। আমার টাকা আছে আমি দিলাম;

কিন্তু যার অর্থভাগ্য নাই?—এমন অনেক লোকও ত প্রতিদিন এই মহাতীর্থে আসিতেছে-যাইতেছে? তবে, তাহাদের প্রতিও এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ পীড়ন হয়? হাঁ, নিশ্চয়ই হয়।—কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মকার্য্যেও এমন বণিক্-বৃত্তি? না, ইহা উপেক্ষা করা আমার উচিত হয় না; —এর একটা প্রতিবিধান করিয়া তবে আমি নিশ্চিন্তমনে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিব;—তবে আমি পবিত্রমনে 'সফলা' লইয়া এ স্থান ত্যাগ করিব।"

ভবানী যে, রত্ন অলঙ্কার সহ—সর্ব্বরকমে পাঁচ লাখ্ টাকা গুরুদক্ষিণা না দিতেন এমন নয়,—কিন্তু পূর্ব্ব হইতে এইরূপ জুলুম ও ফুরণের এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া, তিনি কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন;—সেই বিরক্তি ক্রমে উত্যক্ততায় পরিণত হয়;—তাহার ফলে, তিনি সেই গয়ালী মহাপ্রভুর এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহার,—মুর্শিদাবাদে—নবাবের গোচরে আনেন। তাহার ফল তখন বড় বিষম হয়,—তখন সেই অর্থগৃধ্নু গয়ালীর চমক ভাঙ্গে;—তখন তিনি বুঝিতে পারেন, কাহার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন!

অশেষ-গুণালঙ্কৃতা রাণী ভবানী, নিজগুণে কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন;—তাই তাঁহার এই অভিযোগ নবাব-দরবারে উপনীত হইবামাত্র, নবাব কোনওরূপ ইতস্ততঃ

না করিয়া, তৎক্ষণাৎ মুঙ্গেরের সুবাদারের প্রতি আজ্ঞা দিলেন,—"অবিলম্বে ঐ গয়ালীর জমিদারী ও ভূ-সম্পত্তি, প্রভৃতি সমস্তই কাড়িয়া লও।" যখন নবাবের এই কথা কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, তখন সেই অতি-লোভী গয়ালী-প্রভুর চৈতন্য হইল;—বুঝিলেন, কাহার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন,—এবং সেই ব্যবহারগুণে, কোন্ কার্য্যের কি ফল হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আর বিন্দু-মাত্র কালক্ষেপ না করিয়া, সেই গয়ালী-প্রভু গলবস্ত্র হইয়া, অতি ভয়ব্যাকুলচিত্তে, "মা মা" বলিয়া, ভবানীর শরণাপন্ন হইলেন,—এবং তিনি 'কিছু না দিয়াই পিণ্ডদান করিয়া যান',—মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা ভবানীর উদ্দেশ্য ত তা নয়,—তিনি পবিত্র-মনে পিণ্ডদান-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, 'সফলা'স্বরূপ, সেই পাঁচ লাখ টাকাই গয়ালী-প্রভুকে গুরুদক্ষিণা দিলেন, এবং তাহার আনুসঙ্গিক আরও অনেক অর্থব্যয় করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন। বলা বাহুল্য, ভবানীর অনুরোধে, সুবাদার ও নবাব, সে যাত্রা এই গয়ালীকে ক্ষমা করিলেন।

আর একবার এই গয়ালী-প্রভু, নবাব-সরকারে নিয়মিত রাজস্বদানে অক্ষম হওয়ায়, কারারুদ্ধ হইয়া-ছিলেন। পরোপকার-ব্রতধারিণী ভবানী, এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র, নিজে জামিন হইয়া, তীর্থগুরুকে

কারামুক্ত করেন, পরে যথাসময়ে সেই টাকা নিজ তহবিল হইতেই সরকারে জমা দেন,—গুরুর নিকট হইতে তাহা আর তিনি গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ সদ্ব্যবহারে, তিনি সেই তীর্থগুরুর 'সফলা'-দানের পুণ্য-ঋণ সুদ-সমেত পরিশোধ করেন,—অথবা চিরকালের জন্য সেই গয়ালী মহাশয়কে কিনিয়া রাখেন। গয়ালী-প্রভু বুঝিলেন, দেবী ভবানী 'দেবী' নাম সহজে পান নাই;—অনেক তপস্যায়, অনেক আত্মত্যাগে, তিনি এ মহামহিমময়ী আখ্যা লাভ করিয়াছেন!

তখন সেই তীর্থগুরুও কৃতজ্ঞতার পূত-সলিলে ডুবিয়া গিয়া, ভবানীর নিকট আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখাইতে বাধ্য হইলেন। এক খানি স্বর্ণ-থালে করিয়া, আপন মস্তকের উষ্ণীষ ভবানীর নিকট পাঠাইয়া, একখানি পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়া দিলেন,—"মা! আমি তোমায় চিনি নাই,—তাই আপন দুষ্কৃতিবশতঃ, তুচ্ছ অর্থলোভে, তোমার সহিত ওরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। সত্যই তুমি দয়াময়ী মহাদেবী;—তাই, আমি না বলিতেই, নিজগুণে আমায় ক্ষমা করিয়াছ;—আমায় ক্ষমা চাহিবার অবসরই দাও নাই।—আবার সেই ক্ষমার সহিত এমন একটিও কাজ করিলে, যাহা নরলোকে একান্তই বিরল। মা, সার্থক তোমার ভবানী নাম! যাই হউক, আমি না বুঝিয়া,

তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য এক্ষণে যার-পর-নাই অনুতপ্ত। এ অনুতাপ আন্তরিক—অকপট্ কিনা, তাহা তুমিই বিচার করিও। মা, তুমি আমার সেই অতি-বড় দুর্দ্দিনে, নবাব-সরকারে বিপুল রাজস্ব দিয়া, আমার মান ও প্রাণ বাঁচাইয়াছ;—আমি তাহার প্রতিদানস্বরূপ এই উষ্ণীষ তোমায় পাঠাইলাম।—মা, মনে রাখিও, তোমার তীর্থগুরুর মস্তক তুমি কিনিয়া রাখিলে!"

পত্রখানি পাঠ করিয়া মহাপ্রাণা ভবানী আর্দ্র হইলেন;—তিনি সেই স্বর্ণথাল সহ উষ্ণীষ ফেরৎ পাঠাইয়া, তৎসহ আরও কিছু ধনরত্ন গুরু-প্রণামী স্বরূপ দিয়া, উত্তরে লিখিলেন,—"আমি যে কাজ করিয়াছি, তাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াই করিয়াছি;—সুতরাং ইহাতে প্রশংসার কিছু নাই। বরং সেই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, আমি প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি।—তাহাই আমার পরম লাভ জানিবেন। আপনি আমার তীর্থগুরু,—পরম পূজাস্পদ;—এমত অবস্থায় আপনার ঐ পবিত্র শিরোভূষণ গ্রহণ করিলে আমার বিশেষ অকল্যাণ হইবে; সুতরাং ধর্ম্মভয়ে আমি উহা ফেরৎ পাঠাইলাম;—অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

পত্রপাঠে গয়ালী-প্রভু স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন,—"হাঁ, হিন্দুকুললক্ষ্মী—রাজরাজেশ্বরী বটে! এ মহাপ্রাণতা,

এমন উচ্চাশয়তা,—দেব-হৃদয়েই সম্ভবে। সত্যই ভবানী--দেবী!”

ভবানী ভাবিলেন, “ছি! কাহারও কোন একটু কাজ করিলে, তাহা আবার এই ভাবে তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে হয়? তদপেক্ষা, কিছু না করাও যে, এক হিসাবে ভাল।”

এমনি না হইলে, মা! তোমার পুণ্য-চরিত, এ দীন কবি-হৃদয়ে, এমনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে? এমনি না হইলে মা, এত দিন ধরিয়া, একটু একটু করিয়া, তোমার মহান্ আদর্শ, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা পাই? সার্থক তোমার জনম,—সার্থক তোমার জীবন! তোমার অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশ পবিত্র ও ধন্য হইয়া গিয়াছে;—আজ তোমার পুণ্য-চরিত চিত্রিত করিয়া তোমার ভক্ত কবিও ধন্য হইল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরলোকগত হইয়াছেন; তাঁহার শূন্য সিংহাসনে তাঁহার প্রাণোপম প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা উপবিষ্ট। নবাব সিরাজের কার্য্যাবলী ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। তিনি কি পরিমাণে দোষী বা নির্দ্দোষ ছিলেন, তাহার বিচার-বিতর্কের স্থান ইহা নহে। তবে তাঁহার অদম্য ইন্দ্রিয়লালসা ও ভীষণ দুষ্প্রবৃত্তি যে সর্ব্ববাদিসম্মত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই,—ভবানী-দুহিতা তারার প্রতি পাপ লোভই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখন এইরূপ এবং অন্য অনেকরূপ কারণ দর্শাইয়া, বাঙ্গালার তদানীন্তন জমিদারমণ্ডলী ও প্রধান ব্যক্তিগণ

একযোগে, সিরাজের উচ্ছেদকামনা করিলেন। ভিতরে ভিতরে ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

আলিবর্দ্দীর অবসানের পরেই, বাঙ্গালায় ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা হয়। চারিদিকেই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা,—চারিদিকেই বিদ্রোহের সূচনা। সিংহাসনের লোভ—বড় লোভ। এই লোভে কেহ কেহ প্রাণও দিল।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঘোর বিলাসী সিরাজের অন্য সহস্র দোষ থাকিলেও, এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের বিরুদ্ধে, কিছুদিন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে যুঝিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় মুসলমান-রাজত্বের উচ্ছেদ নাকি বিধাতার ইচ্ছা, তাই শেষরক্ষা আর হইল না।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সে সময় বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার। তিনি এবং তাঁহার সহিত আর কয়েকজন প্রবল ধনশালী ও শক্তিমান্ ব্যক্তি মিলিত হইয়া, সিরাজের সিংহাসনচ্যুতি সম্বন্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেন। রাজা রাজবল্লভ, ধনকুবের জগৎ-শেঠ, মীরজাফর, এবং তৎপুত্র মীরণ প্রভৃতি—এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

যখন বাঙ্গালার সকল জমিদার,—সকল বলশালী ব্যক্তিই, সিরাজের উচ্ছেদকামনায়, ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন একটি মাত্র মহাপ্রাণ—একটি মাত্র মানবী আকারে

দেবী,—সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিলেন। অথচ সিরাজের প্রতিকূলে যদি কাহারও সর্ব্বপ্রথম দাঁড়ান আবশ্যক হইয়া থাকে;—অন্তরের তীব্রযন্ত্রণায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ, যদি কাহারও পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হয়;—তবে ঐ কথিত দেবীরই তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবে।—সর্ব্বগুণসমলঙ্কৃতা, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীকেই আমরা এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। কেননা, সিরাজের অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে, সত্য সত্যই তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়া আছেন। কিন্তু ক্ষমাময়ী ধর্ম্মের অবতার স্বরূপিণী দেবী—রাজদ্রোহিতা মহাপাপ জানিয়া,—সে মনের কষ্ট মনেই রাখিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না,—তাঁহার যুক্তি-তর্ক সব ভাসিয়া গেল,—হতভাগ্য সিরাজ রাজ্যচ্যুত ও অতি নৃশংসরূপে নিহত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান-রবি অস্তমিত, হিন্দু-গৌরব অবনমিত,—সেই দুর্দ্দিনে, সেই ভীষণ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' দেখা দিল। সে ভীষণ মন্বন্তর বা দারুণ দুর্ভিক্ষ, বঙ্গ-ইতিবৃত্তের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা-ক্ষেত্রে, এমন দেশব্যাপী নিদারুণ অন্নকষ্ট হইতে পারে,—এমন গগনভেদী হাহাকার উঠিতে পারে, তাহা সহসা অনেকের কল্পনারও অতীত। কিন্তু তাহা হইয়াছিল;—বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সত্য সত্যই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। দীন-জননী দয়াময়ী ভবানী এ ঘটনায়, প্রকৃতই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই কথাই এখন বলিব।

রাষ্ট্র-বিপ্লবের মহাপাপেই হউক, অথবা দৈব-অভি-

সম্পাতেই হউক,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, প্রকৃতি অতি ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। একাদিক্রমে দুই বৎসর কাল ঘোর অনাবৃষ্টি;—আকাশে একবিন্দু জল নাই,—খাল বিল, নদী নালা, বাপী তড়াগ সব শুকাইয়া গিয়াছে,—নরকণ্ঠও বুঝি বিশুষ্ক হইয়াছে। অস্থিচর্ম্মসার—নরকঙ্কালমূর্ত্তি অসংখ্য নরনারী—কোথা হইতে দলে দলে আসিতেছে, যাইতেছে,—ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া হা-হা করিয়া বেড়াইতেছে। যেন কোথাও একটু ছায়া নাই, শীতলতা নাই, পিপাসার একটু জলও নাই;—প্রখর রবি-তাপ যেন সৃষ্টি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে, ধরা-বক্ষে পতিত হইয়াছে;—যেন দ্বাদশ-রবি-সমুত্থিত জ্বালাময় উত্তাপে, জীবকুল ঝলসিয়া, জলিয়া, পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। "বৃক্ষবল্লরী পুষ্পপত্রহীন, নির্জ্জীব, জীর্ণশীর্ণ ও মৃতপ্রায়। ধান্যক্ষেত্র শুষ্ক-সাহারায় পরিণত। গো-মহিষাদি জন্তুগণ নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মরিতেছে। এমন এক এক করিয়া কত জীবই অসহ্য যন্ত্রণার সহিত যুঝিতে যুঝিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে! নর বা নারী, পশু বা পক্ষী, যাহার মুখের দিকে চাহিবে,—সকলেরই এক দশা। প্রকৃতির ভিতর হইতে প্রাণটুকু যেন চলিয়া গিয়াছে;—তাই বৃক্ষবল্লরীতে আর শ্যামলতা নাই, চন্দ্রকিরণে সে শীতলতা নাই, ধরা-বক্ষে কোথাও

যেন একটু মাধুর্য্য নাই;—আছে কেবল সারাদেশ ব্যাপিয়া দারুণ উত্তাপ! সে উত্তাপে দেশ জ্বলিতেছে!

"অনাবৃষ্টি, আবার অন্নকষ্ট! কৃষক আশাপূর্ণনেত্রে আকাশপানে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুছিয়াছে; লাঙ্গল ও বলদ লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়াছে। লাঙ্গলে মাকড়্সায় জাল বুনিয়াছে। দারুণ উত্তাপে বলদ মরিয়া গিয়াছে। কৃষকের গৃহ অন্নহীন। শতগ্রন্থিময় ছিন্নমলিন বস্ত্রখণ্ড কোমরে জড়াইয়া কোনরূপে তাহারা লজ্জানিবারণ করিতেছে। গৃহস্থের দুয়ার হইতে অতিথি ফিরিতেছে। পথে পথে ভিখারীর ভিড়। মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া শিশু কাঁদিতেছে;—হায়! স্নেহময়ীর কোমল বুকে সে স্বর্গ-সুধা, কৈ, আর ত নাই? শুষ্ক-কণ্ঠে শিশু কাঁদিতেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া, মায়ের জীবনাধিক মায়ার পুত্তলি, মায়ের বুকের উপর পড়িয়া মরিতেছে!"

কেবল ত দুটা বা দশটা জেলা ব্যাপী এ দুর্ভিক্ষ নহে,—সমগ্র বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা ব্যাপিয়া এ ভীষণ দৃশ্য। পথে পথে লোক মরিল,—হাটে মাঠে ঘাটে গোঠে শবদেহ পড়িয়া রহিল,—শৃগাল-কুক্কুরে সে দেহ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। জনপদ নির্জ্জন,—জঠরজ্বালায় কে কোথায় ছুটিয়া ছট্‌কাইয়া পড়িয়াছে,—সর্ব্বত্রই যেন শ্মশান!

এ শ্মশানে দিক্ আলোকিত করিয়া, কে তুমি দাঁড়াইয়া

জননি? কোটী কোটী লোককে অন্ন-জল দিয়া, ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, কে তুমি করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রা হইয়া আছ মা? অন্নপূর্ণারূপিণী মহাদেবী তুমি;—তোমার ত মা অফুরন্ত ভাণ্ডার;—তবে ভয় কি মা,—প্রাণ ভরিয়া জনমের সাধ মিটাও;—আমরা তোমায় ঐ ভাবে দেখি!

ছিয়াত্তরের সেই ভীষণ মন্বন্তরের সময়, লোকরক্ষার জন্ত, একমাত্র রাণী ভবানীই, শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুঝিতে লাগিলেন। কোটী কোটী লোককে তিনি অন্নজলদানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। "অন্যান্য রাজা বা জমিদারগণ যখন আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত",—কেহ বা মানের দায়ে লুকাইয়া সরিয়া বা গা-ঢাকা দিয়া পড়িলেন,—তখন "দীন-জননী দয়াময়ী ভবানী", সেই পবিত্র ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তিতে,—এইভাবে রাজসাহীর সেই মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া, করযোড়ে শূন্যপানে চাহিয়া, যেন কাহাকে কি বলিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তিও যেন সঙ্কেতে, অন্যের অশ্রুত ভাষায়—তাঁহাকে জানাইল,—

"না, আর আশা করিও না,—জীবের ভোগের কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে,—তোমারও কার্য্যকাল অবসান,—শীঘ্রই তুমি এখানে চলিয়া এস। জীব-রক্ষায় তুমি যথা-সর্ব্বস্ব দিয়াছ, তোমার ভাণ্ডার শূন্য;—কিন্তু আর পাইবে না,—জীব ঐ ভাবেই মরিবে। আবার যদি কেহ জন্মজন্ম

তপস্যা করিয়া তোমার মত হয়, তবে সেই আসিয়া মর্ত্যে, এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে;—কিন্তু সেদিনের বহু বিলম্ব।—জীবের সে তপ-বল নাই—আমি কি করিব? বৎসে, পরদুঃখে আজন্ম অশ্রু ফেলিয়া আসিতেছ,—জীবনের শেষমুহূর্ত্তেও সেই অশ্রু সম্বল করিয়া, এ নিত্য-ধামে চলিয়া এস;—তোমায় আর ও মাটীর পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না।"

ঊর্দ্ধনেত্রা জননী তখন একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, হতাশ-ভাবে আপন কপালে হাত দিলেন। ঝর্ ঝর্ করিয়া সেই [illegible] লাগিল;—হায়! সে জল আর থামিল না। জননী-অন্নপূর্ণারূপিণী ভবানী দেখিলেন,—সত্যই তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য,—আর জীব রক্ষা হয় না! মাতা বুঝিলেন,—বিধাতা বিমুখ,—তাঁহারও কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসান,—হায়! কৃষ্ণের জীবকে আর কে রক্ষা করিবে?

কিন্তু, কাঁদ কেন মা-জননি? এ ভীষণ মন্বন্তরে, ত তুমিই কোটী কোটী লোককে অন্নজলদানে বাঁচাইয়াছ? তবে শেষরক্ষা হইল না? তা তুমি কি করিবে? একা তুমি কি করিতে পার? এরূপ বিরাট দান-ব্রতে, কুবেরের অক্ষয়ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া যায়,—তোমার সম্পত্তি কতটুকু মা? তুমি যে এতদিন যুঝিলে, তাহা এ সম্পত্তি-বলে

নয়,—তোমার হৃদয়-বলে! এখন, যাও মা ...ধন ব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াছ,—এইবার সেই নিত্যধামে চলিয়া যাও।—ঐ দেখ মা, জগজ্জননী তোমায় আহ্বান করিতেছেন! যাও মা লক্ষ্মীস্বরূপিণি! এ চর্ম্মচক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া, তোমারই যোগ্য লোকান্তরে চলিয়া যাও, আমরা চক্ষু মুদিয়া, অন্তরের অন্তরে তোমার পাদপদ্ম দেখিব।

'অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী' ভবানী, তখন শূন্যহস্তে, একরূপ নিঃসম্বলে, তাঁহার বড় সাধের বড়নগরে, শেষ গঙ্গাবাস উপলক্ষে, গমন করিলেন। যথাদিনে, সেইখানে সজ্ঞানে, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, তাঁহার গঙ্গালাভ হইল।

ইতি তৃতীয় খণ্ড।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

লেখক
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী